প্রথম পরিচ্ছেদ।

জেলায় মহা মড়ক উপস্থিত। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হইতেছে। যে গ্রামে একটী লোকের ওলাউঠা ধরিল সে গ্রামের সকলেই মরণ নিশ্চয় ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। বৃদ্ধ পিতা সন্তানগণকে বিষয়ের পরিচয় দিতেছে,—কোথায় কার নিকট কত টাকা পাওনা আছে সব লিখিয়া দিতেছে। কে কখন রোগের মুখে পড়ে, সকলে সেই ভয়ে সদা শঙ্কিত ভীত ও ত্রস্ত। মা ছেলের জন্য, ভগিনী ভাইয়ের জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য ভাবিতেছে। মা ছেলের আগে, ভগিনী ভ্রাতার পূর্ব্বে এবং স্ত্রী স্বামীর কোলে মরিবার জন্য গৃহ-দেবতার নিকটে মাথা খুঁড়িতেছে। পূর্ব্বে এ ওর বাড়ীতে রোগী দেখিতে যাইতেছিল; কিন্তু যে যায় সে রোগের হাত ছাড়াইতে পারে না দেখিয়া, আর কেহ কাহাকেও দেখিতে যাইতে সাহস করিল না। ক্রমশঃ রোগের এত উৎপাত আরম্ভ হইল যে, গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বার বন্ধ হইতে লাগিল। কেননা, দ্বার খোলা থাকিলে বাটীর আত্মীয়গণ পাছে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকাডাকি করিয়া বিপদে ফেলে। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বাতাস, গাছ, পুকুর, দিঘী, পথ, ঘাট, মাঠ সব যেন ক্রমে ক্রমে ভীষণতর ভাব ধরিতেছে। পাখীর

ডাকে, পবনের শব্দে, পত্রের কম্পনে সকলে আতঙ্ক গণিতেছে। কাকগুলা খা খা খা খা শব্দে আকাশ তোলপাড় করিয়া সর্ব্বনাশের বিজ্ঞাপন রটাইতেছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রজনী সকলে যেন হাঁ করিয়া সকলকে গিলিবার জন্য উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম প্রথম মৃতের সংকার হইতেছিল; মড়ার পর মড়া গিয়া নদীর তীরে দগ্ধ হইতেছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্মশানের জনসংখ্যা বাড়িতেছিল। গ্রাম ক্রমে নিস্তব্ধ হইতে লাগিল—প্রথম কয় মাস শোকের কান্নার, মহা তুফান উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে কে আর কাঁদিবে—কাঁদিবার লোক আর নাই। গ্রামের ভিতর নিরব; কেবল শ্মশানে হরিবোলের শব্দ—বাঁশ ফাটার শব্দ—মড়ার মাথা ফাটার শব্দ হইতেছে। ক্রমে শ্মশানে আর মড়া পোড়ে না। কে পোড়াইবে? সব মরিয়া শ্মশানের উদর পূর্ণ করিয়াছে। শ্মশানে আর লোক জন দেখা যায় না। শিয়াল কুকুরগুলা আগে মনের সাধে মড়া খাইতেছিল; আর মড়া জুটিতেছে না; এখন তাহারা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া ছুটাছুটী করিতেছে। গ্রামে যে ঘরে যে যেখানে মরিতেছে তার দেহ সেই খানেই পচিতেছে—তার অস্থি সেই খানেই বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

গ্রামে কিছু দিন পূর্ব্বে কি শোভা ছিল, এখন কি হইয়াছে। যেখানে দশ জন মানুষের সমাগম হইত, দশ জন যুবা যে বকুলতলে বসিয়া হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া কত প্রণয়ের কথা উন্নতির কথা, দেশ বিদেশের কথা, আপন আপন পরিবারে

কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইত, এখন সেখানে কেবল বায়ু তাহাদিগের বিরহে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে। বকুল গাছ একলা তাহাদিগের জন্য যেন ভাবিতেছে। একটু বেলা হইলে, যে পুষ্করিণীর কমল-কুমুদ-শোভিত নীল জল, রমণী কমলিনীর শোভায় ফুটিয়া পড়িত; সেই পুষ্করিণীর জলে কমলিনী ফুটিয়া আছে, কুমুদিনী ভাস্বর সূর্য্যকে দেখিয়া লজ্জায় মুখ মুদিয়া আছে, কিন্তু সে সব সুন্দরীদিগের কলনাদ নাই—হাস্যামোদ নাই। যুবতীদিগের রসপূরিত কোমল করসঞ্চালনে মৃণালিনী আর দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে না; তাঁহাদিগের অলঙ্কারের মৃদু মধুর মনোমোহন শব্দ শুনিয়া কোকিল কুহু কুহু ধ্বনিতে আর গান গাহিতেছে না; এখন সরোবর নির্জ্জন—নিস্তব্ধ—ভয়প্রদ। এখন জলে নামিতে ভয় হয়—তীরে বসিলে আতঙ্কে গা শিহরিয়া উঠে—গাছ পালার দিকে তাকাইলে তরল অন্ধকারে বিভীষিকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পলাইতে হয়।

গ্রামে বাড়ীর ভিতরে দলে দলে শকুনি, কাক উড়িতেছে। কুকুর শিয়াল পাগল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছে। রাস্তা ঘাটে কলসী গড়াগড়ি দিতেছে; শ্মশানে তো আর কথাই নাই। যেন শ্মশান চারিদিকে—আপনার দেহ প্রসারিত করিয়াছে—চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—চারিদিক আপনার বেশে সজ্জিত করিয়াছে—চারিদিকে আপনার ভীষণ মূর্ত্তির চিত্র আঁকিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

প্রাণের প্রিয়তম সামগ্রী মরিয়া যাইলে, পুরুষের শোক কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকে; তার পর, পুরুষের ধৈর্য্যবলে সে শোক চাপা পড়ে; পুরুষ তাহাকে আপনার হাড়ের ভিতরে পুরিয়া রাখে। যদি কখনও সে শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে পুরুষের হাড়ের ভিতরে একরূপ দাহ উপস্থিত হয়, পুরুষ চক্ষু মুদিয়া কোন প্রকারে তাহা সহ্য করে এবং একেবারে নিবাইতে না পারুক হাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলে। কিন্তু স্ত্রীলোক তাহা পারে না। স্ত্রীলোকের কোমল হাড় ভেদ করিয়া সে শোক অশ্রু-জলাকারে এবং স্ফুট ক্রন্দনে প্রকাশিত হয়—প্রকাশিত হইয়া প্রাণের যাতনার ভার কমাইয়া দেয়।

পুত্র, কন্যা, জামাতা বা স্বামী হারা হইলে স্ত্রীলোকের শোক একেবারে বিলীন হয় না। যত দিন না সে শ্মশানে যায়, তত-দিন শোকটা স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে মাঝে মাঝে ফুটিয়া থাকে। নূতন শোকে স্ত্রীলোক একটু অবসর পাইলেই মৃত আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে থাকে। দিবসের কার্য্যাবসানে বিশ্রামের জন্য যখন শয়ন করে তখন একবার কাঁদে, রাত্রে শুইবার সময় অন্ধকারে একবার কাঁদে এবং শেষ রাত্রে জগতে প্রাণের স্রোত ফিরিয়া আসিবার সময়ে একবার কাঁদে। এই

শেষ রাত্রের করুণ ক্রন্দন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই স্বরস্পর্শে
[illegible] না গলে, তাহা নিশ্চয়ই পাষাণে নির্ম্মিত।

একদিন ভোরে, মড়কাক্রান্ত সেনপুর গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে, কোটা ঘরের ভিতর হইতে কোন স্ত্রীলোক ঐরূপ কাতর স্বরে কাঁদিতেছিল। গ্রীষ্মের ভোর। বাতাস শীতল ও সুখদ। আকাশে নেশার ঘোরের মত, গাছের ঝোঁপের ভিতরে ঘনীভূত শোকের মত—তরল অন্ধকার রহিয়াছে; কিন্তু ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে; গাছের পাতা কাঁপাইয়া, ভূতলের তৃণ পত্র নাচাইয়া, পুকুরের জলে ঢেউ তুলিয়া, খোলা জানালার কবাট নাড়িয়া গ্রীষ্মের সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে। পাখী সকল আকাশের নীরবতা পূর্ণ করিয়া কোলাহল করিতেছে। স্ত্রীলোক আপনার কক্ষে শুইয়া আছে। কাছে একটী বালিকা। বালিকা ঘুমাইতেছে। স্ত্রীলোক (বালিকার জননী) শোকভরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। জননীর ক্রন্দন ক্রমশঃ বালিকার নিদ্রার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালিকাকে জাগ্রত করিল। বালিকা চক্ষু চাহিল; পাশ ফিরিয়া দেখিল জননী কাঁদিতেছে, চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়াছে, বালিকা তখন উঠিয়া বসিল। মার করুণস্বরে কাঁদ কাঁদ হইয়া আপনার অঞ্চল দিয়া মার চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাতর স্বরে বলিল 'মা! ওমা! কেঁদনা, আর কেঁদ না'।

বালিকার কথায় মার কান্না না থামিয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। মার কান্না বাড়িয়া উঠিলে, বালিকাও প্রবল বেগে কাঁদিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে থামাইবার জন্য প্রয়াস পাইল। জননী কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া আপনি থামিল;

ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিল,—বালিকার মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া। যখন দেখিল, বালিকার মুখ লাল হইয়াছে, নীল চক্ষু আরক্ত হইয়া জলে ভাসিতেছে—তখন আপনার হৃদয়-যাতনা বালিকার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, প্রবল স্নেহ-ভরে কন্যাকে আপনার কোলের দিকে আকর্ষণ করিল এবং জামাতাকে স্মরণ করিয়া কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল 'মা তুই আর কাঁদিস্ নি মা। যোগেন্দ্র আমার বেঁচে থাক্, তোর হাতের লোহা মাথার সিঁদুর বজায় থাক্, তোর ভয় কি ?' জননী আপনার অঞ্চল দিয়া কন্যার অশ্রুজল মুছাইতে লাগিল। কন্যা থামিল, জননী শোকটা সম্বরণ করিল।

তারপর জননী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিল। শোককে বুকের ভিতরে চাপিয়া বিছানা তুলিল। শোকোচ্ছ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে ঘর দ্বার ঝাঁট দিল। তার পর কখন সরবে কখন নিরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রাঙ্গনাদি মার্জ্জনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর স্নানাদি করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল।

বালিকা তখন বাটীর ছাদের উপরে উঠিয়াছিল। উঠিয়া আলিসার ধারে বসিয়া নিকটস্থ শ্মশানের দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষের জল ফেলিতেছিল। গ্রামে আর কেহ নাই। কেবল বালিকা অবলা এবং তার জননী এবং সন্নিকটস্থ কাহার বাটীতে একটী স্ত্রী ও পুরুষ। গ্রামে আর কেহ নাই। বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী, বালক বালিকা সব সেই শ্মশানে গিয়াছে। গোরু বাছুর পুকুরের মাছ পর্য্যন্ত মরিয়াছে। মরে নাই কেবল পাখী, শৃগাল কুকুর, কীট, পতঙ্গ।

বালিকা ছাদের উপরে বসিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আপনার বাপ, ভাই ও সখীদিগের কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিল। ছাদের উপরে বালিকার খেলা ঘর যেমন তেমনি রহিয়াছে। সেই খেলা ঘরে প্রায় দুই মাসাবধি খেলা করা হয় নাই। এই দুই মাসের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে। বালিকার খেলার সঙ্গিনীগণ চিরকালের মত বালিকাকে খেলা-ঘরের সহিত রাখিয়া গিয়াছে। বালিকা সেই সব ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতেছিল, সোণার দেহ কাঁপাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল এমন সময়ে নিম্ন হইতে জননী ডাকিল 'মা! নীচে নেমে আ'য়—আমার বড় অসুখ হয়েছে।'

অবলা জননীর কাতরস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। তথন জননীর ভয়ানক ভেদবমি আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকবার ভেদবমির পর জননীর শরীর কাঁপিতে লাগিল—যাতনায় প্রাণ অস্থির হইল। গা জ্বলিতে লাগিল—তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে লাগিল—ক্রমশঃ শরীর অবসন্ন হইল—চক্ষু কোঠরে প্রবিষ্ট নিস্তেজ ও মলিন হইল। জননী ক্রমশঃ ধোঁয়া দেখিতে লাগিল। জননী তথন বুঝিল—আর নয়—আমার দফা রফা হইল। হতভাগিনী, অবলার জন্য মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া, তথন সেই নিস্তেজ মলিন চক্ষু দিয়া অশ্রুমোচন করিল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়া অবলার অস্ফুটমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত জননী নিরাশ্রয়া অবলাকে দুঃখের অকুল পাথারে ভাসাইয়া জনমেরমত চলিয়া গেল। অবলার অন্তরাত্মা বিপদ বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে "মা গো কোথায় গেলি গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অবলার দুঃখময় জীবনের প্রথম অঙ্কআরম্ভ হইল।

প্রাণের সামগ্রী মরিয়া যাইলেও হঠাৎ মন তাহাতে বিশ্বাস করিতে রাজী হয় না। তাই অবলা চীৎকার করিবার পর মনে ভাবিল 'মা কি নাই? মা নাই—মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাই অবলা আবার ভাবিল, মা হয় ত দুর্ব্বলতা বশতঃ চুপ করিয়া আছে।

এই ভাবটীর ভিতর হইতে অবলার প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। অবলা কাতরভাবে মার গা ঠেলিয়া ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল। 'ওমা! মা! ওঠ না মা। ঘরে শুবি চ' না মা।'

মা সাড়া দিল না—পাষাণের মত চুপ করিয়া থাকিল। পরে অনেক ডাকাডাকির পর বালিকা বুঝিল, মা আর নাই। তখন বালিকা শোকে দুঃখে ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—মার দিকে এক দৃষ্টে পাগলিনীর মত তাকাইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির ভিতর হইতে শোক দুঃখের যেন একটা কোয়াসা বালিকার অস্তিত্বকে ডুবাইয়া ফেলিল।

বালিকা প্রস্তরের মত সেই শোকের কুজ্ঝটিকায় আত্মসমর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল নিরবে থাকিল। সে বড় ভীষণ নিরবতা। সেই নিরবতায়—নিরব যাতনায় বালিকা আত্মবলি দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাগলিনীর মত ভয়বিহ্বলা হইয়া মার নিকট হইতে সরিয়া গেল। আস্তে আস্তে রোয়াকের নীচে উঠানে নামিল। ধূলায় বসিল। তার পর কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিয়া মুখ খানা মাটীতে গুঁজিয়া শোকের ভীম যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু মার কাছ ছাড়িয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। ধূলা মাখা গায়ে, ধূলা মাখা কাপড়ে, ধূলা মাখা চুলে,

ধূলা মাখা সৌন্দর্য্যে মার মৃত দেহের নিকটে গমন করিল। মা যে মরিয়াছে অবলা তাহা ভাবিতে পারিতেছে না। মা মরিলেও মাতৃস্নেহ যেন মরে নাই। মাতৃস্নেহের স্মৃতি অবলার কাছে অবলার মাকে যেন নিদ্রিতা রাখিয়াছে।

মার কাছে গিয়া অবলা মার মুখখানি দু'হাতে ধরিয়া আপনার কোলের উপরে রাখিল। মার মুখে রোয়াকের ধূলা লাগিয়াছিল, অবলা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে মার মুখের উপরে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া মাকে কত ডাকিল। কই! মা সাড়া দিল না—কথা কহিল না। অবলার অশ্রুরাশি জননীর মুখ বাহিয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল।

অবলার দুঃখে প্রকৃতি স্থির হইয়া থাকিল; গাছ পালা নড়িল না—একটী পাখী ডাকিল না—গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। কেবল মাঝে মাঝে পথ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে দুই একটা কুকুর ডাকিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা যখন নিশ্চই বুঝিল মা আর নাই তখন বালিকার আপাদ মস্তক কম্পিত হইল। বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিকে ধোঁয়া দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মার মৃতদেহের কাছেই পড়িয়া গেল।

অবলা বাপ মার কত আদরের মেয়ে। অবলার বড় ভূতের ভয়। রাত্রে ভূতের গল্প শুনিতে চাহিত না। একলা কোথাও যাইতে পারিত না। বাটীর দাসীর সঙ্গে কখন কখন বাটীর বাহিরে যাইত; কিন্তু দাসী রাস্তায় একটু পেছনে ফেলিয়া যাইলে, দৌড়িয়া দাসীকে ধরিয়া কোলে উঠিত।

এখন সংসারের এই ভীষণ দুর্য্যোগে বালিকাকে কে রক্ষা করে? গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থায় সেই নির্জ্জন বাটীর ভিতর দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা আর কাহার মুখের দিকে চাহিবে?

বাপ ভাই মরিয়াছিল তাহাতে কি? মা ছিল। মাকে দেখিয়া শিশু সন্তান সব ভুলিতে পারে। কিন্তু আজ অবলার মা, বাপ ভাই যে পথে, সেই পথে গিয়াছে। কে বালিকার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবে? কে আদর করিবে? কে প্রতিপালন করিবে? কাঁদিলে গলা ধরিয়া কে মুখ চুম্বন করিবে? ক্ষুধায় যখন ছট্‌ফট্‌ করিবে তখন কে আদর করিয়া খাওয়াইবে? অবলা যে শিয়াল কুকুর ডাকিলে ভয় পাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, শৃগাল কুকুর যখন ভীষণ শব্দে গ্রামকে কম্পিত করিবে তখন সোণার বালিকা আর কার গলা জড়াইবে? বালিকা যে এক মুহূর্ত্তও বাটীতে একলা থাকিতে পারে না; এবার যে একলা থাকিতে হইবে—কি প্রকারে থাকিবে? বেলা প্রায় দশটা বাজিতেছে, অবলা যে এতক্ষণ খাবার খাইয়া ভাত খায়। আজ বালিকা একটুও জলস্পর্শ করে নাই। মা রাঁধিবার জন্য উনুনে আগুণ দিয়া ভাত চড়াইয়াছিল মাত্র। ভাত যে চুঁইয়া যাইতেছে—কে ভাত নামাইয়া দিবে? কে আর সাত তরকারী রাঁধিয়া অবলাকে খাওয়াইবে?

বালিকার আজ কি দুর্দ্দিন। এমন বিপদে কেবা পড়ে? মা, বাপ, ভাই, ভগিনী কার না মরে? মরে বটে; কিন্তু সময় অসময় আছে? এই সকল সংগ্রামে মানুষের জীবনের পরীক্ষা—এই সকল যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশে আত্মার উপকারই হয় বটে; কিন্তু ননীর পুতলি বার বৎসরের বালিকা আজ

্ব সংসারের নিষ্ঠুরতায় মারা যাইতেছে। যদি মারা যায় তো ভালই—মরিলে এ বিপদ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু মরিতেছে কৈ? ঐ দেখ বালিকার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। চেতনা পাইয়া বালিকা আবার কাঁদিয়া বলিল 'মা গো! ওমা! তুই কোথা গেলি—আমার যে আর কেউ নাই—আমি কার কাছে থাকবো।'

বালিকার সকাতর প্রার্থনায় কেহই উত্তর করিল না! শব্দগুলি আকাশের বায়ুতে মিশিয়া গেল।

লাবণ্যের ছবিখানি সেই বিপদে হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। মার এমন দশা হইবে একবারও ভাবে নাই। আর কিই বা ভাবিবে? বালিকার সরল হৃদয় কি এসব ভাবিতে পারে? এসব কণ্টকময়ী চিন্তা কি বালিকার কুসুম সম কমনীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে? কোমলা বালিকা পৃথিবীর চারিদিকেই কোমলতা দেখে, সকল সামগ্রীতেই সুখের অমৃত আস্বাদন করে—সকল ঘটনাতেই প্রাণের হাসি, হৃদয়ের আনন্দ, এবং যত কিছু সাধ, সব ঢালিয়া দিয়া আপনার চারিদিকে যেন নন্দন কাননের ফুটন্ত কুসুমরাশির সুমধুর প্রাণারাম সুগন্ধ অনুভব করে। হায়রে! এ পৃথিবীতে বালক বালিকাকে কেনা দয়া করে? ইতিহাসে রাজায় রাজায় কত সংগ্রাম হইয়াছে—পৃথিবীতে কতবার শোণিতস্রোত বহিয়াছে; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে বালক বালিকার রক্ত বিন্দু এই মহীপৃষ্ঠে খুব কমই ঝরিয়াছে। কত রাজা আপন আপন সহোদরকে কত যন্ত্রণা দিয়াছে, কিন্তু সেই সহোদরের শিশু সন্তানকে দেখিয়া দয়ার হাতে পড়িয়া তাহার প্রতিপালন করিয়াছে।

আজ সেনপুরের প্রসিদ্ধ কুলীন হরিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক

মাস পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁর মৃত্যুর দশ দিন পরেই একটী পুত্র অকালে মরিয়াছে। হরিনাথের বিধবা স্ত্রী এই মাত্র মরিয়াছে। কন্যা 'অবলা' প্রাচীর বেষ্টিত কোটা বাড়ীর ভিতর মৃতা জননীর সম্মুখে একলা বসিয়া কাঁদিতেছে।

বালিকা শোকে বড় অস্থির হইয়া উঠিল। মার মুখের কাছে আরও সরিয়া বসিল। দেখিল অনেকগুলা মাছি মার মুখে চোখে কানে বক্ষে বসিয়াছে, চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। অবলা আপনার বস্ত্র সঞ্চালনে মাছি গুলাকে তাড়াইতে লাগিল এবং শোকের ভীষণ মলিন মূর্ত্তিতে আপনাকে আহুতি দিয়া অশ্রুজলের বন্যায় আপন প্রকৃতিকে ভাসাইতে থাকিল। অবলার ক্রেন্দন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল। সেই ঘনীভূত শোক প্রকাশে চারিদিক আর্দ্র হইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। আম গাছে খুব আম জন্মিয়াছে, কাঁঠাল গাছ কাঁঠালে পরিপূর্ণ। বাড়ীর ভিতরে দুটি আম গাছ ও একটী বৃহৎ কাঁঠাল গাছ ছিল। বালিকা উচ্চৈঃস্বরে পাষাণ গলাইয়া কাঁদিতেছে এমন সময়ে একটী কাঁটাল, গাছের উপর ডাল হইতে ধুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। যেন কাঁটাল গাম অবলার শোকের আঘাতে অধীর হইয়া অবলাকে শোকের প্রত্যুত্তর দিল।

বালিকার বড় ভূতের ভয়। কাঠালটী পড়িয়া ইলে সেই ভূতের ভয় বড়ই বাড়িয়া গেল। অবলার সরব ক্রন্দন নিরব হইল। ভয়ে বুক গুরগুর করিতেছে—প্রকৃতি কাঁপিতেছে। ভয়াতুরা বালিকা গাছ পালার দিকে অস্থির দৃষ্টিতে চাহিল— দেখিল গাছ পালা যেন সব ভূতের আকারে দাঁড়াইয়া আছে। গাছ পালা ও আকাশের নিরবতার ভিতরে যেন ভূতের ভীষণমূর্ত্তি

সকল লুকান রহিয়াছে। চারিদিকের আকাশ, প্রকৃতির অবয়ব ভয়-স্পর্শে অবলার চৈতন্য হরণ করিতে লাগিল। অবলার চাহনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে মুদিয়া অন্ধকারে ডুবিল। শারীরিক ক্রিয়া ক্রমশঃ অসাড়তায় মিশিল—অবলা আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবলার চৈতন্য-সঞ্চার হইল। শোকের অসাড়তা অতিক্রম করিয়া অবলার দৃষ্টি জাগ্রত হইল। অবলা আবার চক্ষের পল্লব তুলিয়া পূর্ব্ব-স্মৃতিতে পূর্ব্বশোকে উথিত হইল। তখন ভয়ে, শোকে, নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া "মা গো বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যেন জগতের কাতরতা সেই বালিকার কোমল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল। গাছ পালা চুপ করিয়া তাহা শুনিল—আকাশ নীরবে তাহা শুনিল—কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না—কালের অনন্ত স্রোতে তাহা ভাসিয়া গেল।

বালিকা যখন কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল—একটা ভীষণ যমের স্কন্ধে আপনার প্রাণকে অনুভব করিতেছিল, তখন বাটীর বৃক্ষ হইতে অঁা অঁা অঁা এই বিকট শব্দের সহিত এক বিকটাকার মূর্ত্তি ঝুপ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। বালিকা সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল। এবার আর মূর্চ্ছা হইল না। ভয়ে বালিকার গা হইতে গল্ গল্ করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। চক্ষু দুটী মুদিয়া, সমুদয় শরীর স্থির করিয়া শুইয়া থাকিল। এই সময়ে একটী পিপীলিকা বালিকার পৃষ্ঠে দংশন করিতেছিল বালিকা ভয়ে পিপীলিকাকে কিছু বলিতে পারিল না, পিপীলিকা হুল ফুটাইয়া পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া থাকিল। বালিকা আস্তে আস্তে চক্ষু চাহিল; দেখিল 'দাঁত কাটার মত' কে একজন তার কাছে

আসিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। দেখিবামাত্র বালিকা আবার সংজ্ঞা রহিত হইয়া, মড়ার মত স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া থাকিল। গায়ের ঘামে বালিকার ভূমিশয্যা ভিজিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকার নিকটে যে ভীষণ মূর্ত্তিটী দাঁড়াইয়া বিকট চক্ষুর বিকট দৃষ্টিতে চারিদিকে ভীষণতার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে করিতে নিরাশ্রয়া বালিকার সমুদয় প্রকৃতিতে বিকম্পিত করিতেছিল সেই মুর্ত্তির কিছু পরিচয় প্রদান করি।

সেই বিকটাকার মনুষ্যের বর্ণ অমাবস্থার নিবিড়ান্ধকারের স্থায় আতঙ্কদায়ক। যেন নিবিড় অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে। সচরাচর মানুষের মুখ গহ্বর যে ভাবে যে স্থানে থাকে তাহার সেরূপ নহে। কর্ণমূল হইতে আরম্ভ হইয়া নাসিকার গহ্বরদ্বয়ের সম্মুখ পর্য্যন্ত দন্তশ্রেণী ভীষণভাবে অবস্থিতি করিতেছে। দুইপাটী দন্ত সর্ব্বদা প্রকাশিত কিছুতেই লুক্কায়িত হইবার নহে। নাসিকা কোথায় গিয়াছে, কেবল দুটী নাসারন্ধ্র মাত্র আছে। সেই রন্ধ্রে কয়েক গাছা কেশ বাস করিতেছে। চক্ষু দুইটীর মধ্যে একটীর পোঁটা বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথায় চুলের লম্বা লম্বা জটা ঝুলিতেছে। উদরটী লোমে পরিপূর্ণ এবং কলসীর তলার স্থায় গোল। দুপায়ে দুটী বৃহদাকার গোদ। লম্বা লম্বা দুটী হাতে আঙ্গুল একটু একটু আছে—সম্পূর্ণভাবে একটী আঙ্গুল ও নাই।

এই মোহন মূর্ত্তির ভিতরে উন্মাদ রোগ উপযুক্ত বাসস্থান পাইয়া মনের সুখে রাজ্য করিতেছে, সেই ভীষণতার উপরে ভীষণতা স্থাপিত করিতেছে। সেই মূর্ত্তি কখন বিষ্ঠায় রঞ্জিত হইত; কখন কাদায় চর্চ্চিত হইত; কখন হাড়ের মালা গলায় দিয়া নাচিত, চীৎকার করিত—অট্টহাস্যের রোলে চারিদিক কাঁপাইত। এই মূর্ত্তিটী এক গ্রামে থাকিত না; এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়াইত। কখন সন্ধ্যাকালে ঘোষেদের খিড়কীতে আমগাছে বসিয়া থাকিত—স্ত্রীলোক সকল ঘাটে যাইলে ভয় দেখাইত; আবার দুষ্ট ছেলেদের তাড়া পাইলে গাছ হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে মাঠের দিকে পলায়ন করিত।

মাঠে রাখাল ছেলেরা গোরু চরাইতে চরাইতে অন্যমনে খেলা করিতেছে; এমন সময়ে সেই মূর্ত্তিটী দুলিতে দুলিতে, আসিয়া সেই স্থানে মহা গোলযোগ করিত। কখন হাঁ করিয়া, দুটী হাত প্রসারিত করতঃ অঁা অঁা অঁা শব্দ করিতে করিতে কোন ছেলের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইত। কখন বা গ্রামের ভিতরে বাঁশ বনে প্রবেশ করিয়া বাঁশ পাতা বিছাইয়া শয়ন করিত। কখন বা গৃহস্থের বাটীতে স্ত্রীলোকেরা আহার করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—শব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে নৃত্য করিত; এবং ভাত খাবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইত। এই মূর্ত্তির নাম দাঁতকাটা।

অন্ধকার রাত্রে কখন কখন কোম্পানীর রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত। পথিকগণ দূর হইতে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই "রাম" নাম করিতে করিতে পলায়ন করিত। দাঁতকাটার নামে

গ্রামের ছেলেরা আতঙ্কে কাঁপিত। দাঁতকাটা তিনখানি নিকটবর্ত্তী গ্রামেই বাস করিত ; সুতরাং এই গ্রামগুলি উহাকে মানুষ বলিয়াই জানিত। কিন্তু দাঁতকাটা ২। ১ মাস অন্তর দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইত।

হয়ত ১০।১২ ক্রোশ দূরের কোন গ্রামে সন্ধ্যার পর প্রবেশ করিয়া গ্রামের রাস্তার ধারের কোন বৃহৎ তেঁতুল গাছে আশ্রয় লইল। সেই গাছতলা দিয়া যে যায়, তারই গায়ে দাঁতকাটা প্রস্রাব করে। নিশ্চয়ই ঐ লোক ভূত ভাবিয়া, চারিদিকে সেই গাছের ভূতের কথা প্রকাশ করিতে থাকে। গ্রামস্থ অনেকই সেদিন হইতে সেই গাছকে ভয়ের চক্ষে দেখিতে থাকে। দাঁতকাটা এইরূপে দূরস্থ কত গ্রামে ভূতের ভয় প্রবল করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

অনেক পাঠিকা হয়ত ভাবিতে পারেন, এর কি বিবাহ হইয়াছিল! হায়! হায়! কে এমন হতভাগিণী আছে যে ইহাকে স্বামীত্বে বরণ করিবে! কিন্তু পাঠিকা! এমন ভাব মনে আনিও না। দাঁতকাটার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রীও আছে। স্ত্রী দেখিতে পরমাসুন্দরী। উহারা গোপ-জাতীয়। দাঁত-কাটাকে সেই রান্ধিয়া দেয় ; কত যত্ন করে ; কত ভালবাসে দাঁতকাটার উন্মাদ রোগ আরাম করিবার জন্য অনেক বাড়ীতে দাসীপনা করিয়া টাকা উপায় করিতেছে। যাহা পায় স্বামীর রোগের জন্য খরচ করে। যদি স্বামী উন্মাদ না হইত তাহা হইলে স্ত্রীর সুখের সীমা থাকিত না। স্ত্রী সর্ব্বদা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করে যে, ভগবান! আমার স্বামীকে আরাম কর, আমি ভিক্ষা করিয়া স্বামীকে সুখে রাখিব। স্ত্রীর নাম

দিগম্বরী। দিগম্বরী কাহারও মুখে স্বামী নিন্দা শুনিতে ভালবাসিত না। যদি কেহ বলিত, "ভোগা তুই অমন ভাতার ল'য়ে কেমন ক'রে ঘর করিস্" তাহা হইলে দিগম্বরী বলিত "জন্ম জন্ম যেন ঐ স্বামী ল'য়ে ঘর করি। কেন গা! আমার মনে কষ্ট দাও। আমার স্বামী আমার কাছে সোণা। তোমার স্বামী তোমার কাছে যেমন, আমার স্বামী আমার কাছে তেমন। স্বামী ত বটে। স্বামীকে লয়ে ঘর করবো, সুখে থাকবো—স্বামীর চেহারা লয়ে কি ধুয়ে খাব নাকি। তোমরা বুঝি স্বামীর চেহারা ধুয়ে ধুয়ে খাও—।" দিগম্বরী একদিন রাজাদের বাটীতে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিল। রাজপুত্র বর সাজিয়া বাহির হইয়াছে। এমন সময়ে দিগম্বরীর একজন বন্ধু বলিল 'আচ্ছা ভাই কেমন বর বল্ দেখি'?

দিগম্বরী বলিল ভাল বটে, কিন্তু ভাই তাকে (দাঁতকাটাকে) আমার যেমন সুন্দর দেখায় এমন আর কাকেও নয়—তোরা যে কেন তাকে অমন দেখিস্ তা বল্‌তে পারি না! পৃথিবীর লোক গুলো যেন কেমন কেমন! সহচরী বলিল—আমার ইচ্ছা হয় ঐ যদি আমার স্বামী হ'ত।

দিগম্বরী কাণে হাত দিয়া বলিল—ছ্যা—ছ্যা! রাম রাম! গলায় দড়ি দিয়ে মরগে, জন্ম জন্ম যেন তাকে পাই। ভগবান যদি পাগল না কর্‌তেন তো দেখতিস আজ আমার কত সুখ। বলিতে বলিতে দিগম্বরী কাঁদিয়া ফেলিল। হা অমূল্য রত্ন সতীত্ব! তুমি স্ত্রীজাতির প্রকৃত অলঙ্কার। তোমার তুল্য সুন্দর রত্ন স্বর্গেও নাই। তাই বলি, সতী স্ত্রীর হৃদয়ে স্বর্গের সমুদয় সৌন্দর্য্যের সমষ্টি। এমন স্ত্রী যে পাইয়াছে, সে সহস্র পাপে

পাপী হইলেও পরম ভাগ্যবান। তার সুখের একবিন্দু যদি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর প্রাপ্ত হয় তো আপনার সাম্রাজ্যকে অতি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবলা বালিকা আপনার প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সেই ভয়ানক মূর্ত্তির দিকে একবার চাহিয়াই ভয়ে দৃষ্টি অবনত করিয়া থাকিল। বালিকার চঞ্চল চক্ষু একেবারে স্থির—যেন প্রস্তর নির্ম্মিত। ভয়ে সমুদয় শরীর থর থর কাঁপিতেছে। ক্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে থাকিল। সংসারের ঘোরতর প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে বা অবলা বালিকা দগ্ধ হইয়া যায়! অবলার চন্দ্রমা নিন্দিত বদনে কালিমা সঞ্চারিত হইয়া মুখখানিকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

দাঁতকাটাকে কখনও বালিকা দেখে নাই, লোকের মুখে তাহার কথা শুনিয়াছিল মাত্র। অবলা তাহাকে পিশাচ বলিয়া স্থির করিয়াছে।

দাঁতকাটা আস্তে আস্তে রোয়াকের উপর উঠি... উঠিয়া মৃত দেহটীকে স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে পলায়ন করিল।

বালিকা আরও ভীত হইল। জননীর দেহ কোথায় চলিয়া যায় দেখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। দুটী চক্ষুর জলে বালিকার বক্ষে স্রোত বহিতে থাকিল। বালিকার হঠাৎ মস্তক ঘুরিতে লাগিল—নিজের অস্তিত্ব যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছে—যেন

পৃথিবী ঘুরিতেছে—কে যেন আছাড় মারিতেছে—এরূপ বোধ হইল।

বালিকা একেবারে বিকট চীৎকারে প্রাণের নির্জ্জনতাকে পরিপূর্ণ করিল। আকাশ ভেদ করিয়া সেই পাষাণ-দ্রবিণী কাতরতা, সন্নিকটস্থ কায়স্থদিগের বাটীতে উপস্থিত হইল। সেই বাটীর স্ত্রীলোকটী সেই কাতরতাপূর্ণ চীৎকারে চমকিত হইয়া স্বামীকে বলিল 'ওগো, বামুনদের বাড়ীতে এবারে যে ভয়ানক শব্দ হ'ল। ওদের অবলার বুঝি বা কিছু হ'ল! চল একবার দেখে আসি'।

স্বামী বলিল—'গিয়ে নিজের প্রাণ হারাব; বাঁচ্‌তে হবে না—তবু যদিন বাঁচি তদিনই ভাল'।

স্ত্রী বলিল—আহা! আমি একবার যাই। আমার প্রাণটা কেমন ক'র্‌ছে। এই কথা বলিয়া স্ত্রী ব্যাকুলতার সহিত বেগে ব্রাহ্মণ বাটীর দিকে ধাবিত হইল।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বালিকা অবলা অচেতন প্রায় পড়িয়া আছে; চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু বর্ষণ হইতেছে; সমুদয় শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

বালিকার চক্ষু দিয়া জলের স্রোতরেখা বহিতেছিল। হঠাৎ সেই স্ত্রীলোককে দেখিবামাত্র স্রোত প্রবলতর হইয়া উঠিল, অবলা যেন কুজ্ঝটিকার ভিতরে প্রবেশ করিল।

কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দুঃখ গলা চাপিয়া রাখিয়াছে, বাক্য নিঃসরণের পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছে, কথা কোথা দিয়া বাহির হইবে? স্বপ্নে যেমন অনেক সময়ে বাক্য-স্ফুরণ হয় না, অবলার পৃথিবীর এই প্রকৃত স্বপ্নে তেমনি কথা

স্ফুরিতেছে না। বোবার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু প্লাবিত নয়নে প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায় একদৃষ্টে সেই রমণীর দিকে চাহিয়া থাকিল; সেই রক্তিম চাহনি ভেদ করিয়া নীরব অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল। সেই চাহনির পিছনে কত ভাব, কত জ্বালা ঘন হইয়া পাষাণবদ্ধ স্রোতের ন্যায় ঠেলিতে লাগিল। সে চাহনিতে যে ভাব দেখা দিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা গভীর রসপূর্ণ কবিতা আর জগতে নাই;—তাহা বিশ্ব-কবিতার একটী ভীষণ অধ্যায়।

বালিকা চাহিয়া থাকিল—সেই চাহনির অবসরে জগতে কত ঘটনা ঘটিল—লোকে সবই বুঝিল, কিন্তু অবলার সে চাহনির গভীর ভাব কেহ বুঝিল না। সে জ্বালা—সে ভাব—সে চাহনিতেই আবদ্ধ থাকিল। অবলা রমণীকে কত কি বলিয়া প্রাণের ক্ষোভ নিবারণ করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু ভাষা ভাবরসে, দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুজলেই প্রকাশিত হইতে লাগিল।

রমণী অবলার সে চাহনি দেখিয়া ভয় পাইল; কাঁদ কাঁদ হইল; কাতর ভাবে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "অবলা! তোর মা?"

সে প্রশ্নে অবলার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি দুঃখভারে জড়ীভূত হইল—অশ্রুধারা প্রবলতর হইল—চক্ষু মুদিয়া আসিল—জ[illegible] কাঁপিতে লাগিল। রমণী অবলার কাছে আসিল। অবলার মাথায় হাত দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল 'ও অবলা! কি হয়েছে? তোর মা কোথা? ভেদ বমী কার? অবলার তখনও একটু সংজ্ঞা ছিল; ও কথা আবার শুনিয়া একেবারে মূর্চ্ছিতা হইল। অবলার দুই চক্ষু কপালে উঠিল—অবলার দাঁতে দাঁত বসিয়া গেল।

কায়স্থ রমণী অবলার মূর্চ্ছা দেখিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"ও অবলা! কি করলি! ওমা কি হবে গা! কেউ যে নাই গা!

রমণী ঐ কথা গুলি বলিতে বলিতে আপনার স্বামীকে ভাবিতেছিল; ভাবিতেছিল—তাহার স্বামী যদি সেখানে আসে তো সে বিপদে অনেক সাহায্য হয়। রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে তখন নিকটস্থ কলসী হইতে জল আনিতে গেল। কলসীতে হাত দিয়া জল পাইল না—কলসী শূন্য। তখন ঘরে প্রবেশ করিল। ঘড়া ঘটী বাটী দেখিল, জল পাইল না। রান্নাঘরে যাইল। রান্নাঘরে উনুনে আগুন নিবিয়া গিয়াছে; একটু একটু ক্ষীণ ধূম উঠিতেছে। রান্না ঘরের ঘড়া হইতে একটা বাটী করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জল ঢালিল। কতক জল বাটীর বাহিরে পড়িল—কতকটা বাটীতে পড়িল। রমণী দ্রুত বেগে অবলার কাছে আসিল। ভগবান! রক্ষা কর! বলিয়া অবলার মুখে চোখে জলের ঝাপট দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকার চক্ষের পল্লব দুটী দুঃখের নিবিড় আঁধার ধীরে ধীরে সরাইয়া চক্ষু দুটী প্রকাশিত করিল। অবলা সেই দুঃখ-প্লাবনের তীরে সেই রমণীকে দেখিয়া একটু আশ্বাসিতা হইল। রমণী অবলাকে হাত দুটী ধরিয়া ভূমি হইতে তুলিল। তুলিয়া স্নেহ মাখা বচনে বলিল "এখন আমাদের বাটীতে চল্। কি হয়েছে বুঝতে পারছিনা। তোর মা কি কোথাও গেছে?"

অবলা তখন "মা গো কোথা গেলি গো" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। সে করুণস্বর তীক্ষ্ণবাণের ন্যায় রমণীকে বিদ্ধ করিল। রমণী কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল

ওমা! সে কি লো! বলিস্ কি? তোর মা নাই! কই! কোন ঘরে পড়ে আছে?

অবলা ঘাড় নাড়িল—কথা কহিতে পারিল না।

রমণী অবলাকে সেইখানে ফেলিয়া চমকিত ভাবে এঘর ওঘর ভাল করিয়া দেখিল। ঘরে বাসন, বিছানা, খাট, আনলা সবই আছে—একটা বিড়াল একটা জানালার কাছে বসিয়া ঝিমাইতেছে। অবলার মার মৃত দেহ দেখিতে পাইল না। আরও চমকিত ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া অবলার কাছে শরীরটীকে অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া অবলার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল "বলি কি সব খুলে বল দেখি! তোর মা জলে টলে ডোবেনি ত!

অবলা কিছু উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া পাগলের মত রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রমণীর বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। রমণী দুহাতে অবলাকে আপনার বুকে চাপিয়া অনেক স্নেহ প্রকাশ করিল। অবলা রমণীর বুকে ভয়ে মুখ গুজিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল "এখানে আর থাক্‌বোনা বড় ভয় করছে"। "ভয় কি? আমার সঙ্গে চ"—বলিয়া রমণী অবলাকে হাত ধরিয়া আপনাদের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিল। দুজনে ধীরে ধীরে চলিল। বালিকা যেন মাতৃস্নেহে আকর্ষিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—দীর্ঘনিশ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে—জন্মভূমির দুঃখের মাটীতে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিল।

কায়স্থ বাটীর চারিদিকে মাটীর প্রাচীর। প্রাচীরে খোড়ো চাল। বাটীর ভিতরে দুখানা মেটে ঘর। একখানা বড়, এক

খানা ছোট। বড় ঘর খানার দাওয়া খুব উঁচু ও চওড়া। বাহি-রের দেওয়ালে সুন্দর উলুটি। সেই উলুটী করা কাঁথে মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকের হাতে আঁকা বড় বড় পদ্ম ফুল। ঠিক মাঝ খানে একস্থানে লক্ষ্মী পূজার জন্য আলপোনায় লক্ষ্মীর পেচক, ফুলের ঝাড় আঁকা রহিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর দিয়া এক পোঁচ ঘর নিকানর গোলা চলিয়া যাওয়ায় লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ও ফুলের ঝাড় এবং পেচক একটু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে সেই চিত্রের উপরে দুটা বড় বড় কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গির একটাতে দুটা খুরিউল্টান—একটা মালায় তামাক—একটা সরায় খান কতক টিকা। আর একটাতে চকমকীর পাত্র—তার কাছে একটা পোড়া শোলা। বাটীর উঠানের উপরে লাউ, শশা, কুমড়ার জন্য বাঁশের মাচা। উঠানের কোনে একটা খড়ের গাদা। তার একটু দূরে একটা পেয়ারা গাছ। পেয়ারা গাছের কাছে দেয়াল ঘেঁসিয়া কয়টা নিস্তেজ মানকচুর গাছ। কচুগাছের কাছে আধখানা জালা ভাঙ্গা। তারই কাছে একটা বড় খোঁটা ও গরুর ডাবা। গরু নাই। গরু বাঁধা দড়ির খানিকটা খোঁটার কাছে পড়িয়া আছে মাত্র।

অবলা সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে গিয়া সেই বড় ঘরের বড় দাওয়ার উপরে একটী খুঁটির কাছে বসিল। বসিয়া অধোমুখে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগ্নকণ্ঠে গদগদ ভাবে জননীর মৃত্যু কথা ও সেই পিশাচ কর্ত্তৃক মাতৃদেহাপহরণের কথা বলিতে বলিতে দুঃখের অগাধ অশ্রু সাগরে যেন পাড়ি দিতে থাকিল। রমণীর স্বামীও শুনিতে শুনিতে কাঁদিতে লাগিল এবং বিধাতাকে মনে মনে গালি দিতে লাগিল।

কথা শুনিতে শুনিতে রমণী স্বামীকে লক্ষ করিয়া বলিল, 'না

আর এখানে থাকা নয়। বিষয় টিষয় ফেলে এখান থেকে পালাই চল’।

পুরুষটী তখন চকমকী ঠুকিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শোলায় ফেলিয়া ফুঁ দিতেছিল। শোলায় আগুণ লাগায় শোলাটা লাল হইয়া পুরুষের ফুঁ দেওয়া ঠোঁট দুটাকে অগ্নির দীপ্তিতে আভাময় করিয়াছিল। সে শোলার আগুণে টিকা ধরাইল। তার পর কলিকায় টিকা রাখিয়া ফুঁ দিতে দিতে কি ভাবিতে ভাবিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হুঁকার মাথায় কলিকা দিয়া আপনার দুঃখ পীড়িত মনে একটু সান্ত্বনা, একটু আরাম ঢালিবার জন্য বিপদের জড়ময় বন্ধু হুঁকারমুখে মুখ রাখিয়া হুঁকার অধর হইতে ধূমামৃত পান করিতে লাগিল। হুঁকা টানিতে টানিতে পুরুষটী ভাবিতেছিল, আর বাস্তভিটার মায়ায়পড়ে থাকা কেন? বাগান, পুকুর, জমী জরাতের মায়া ছেড়ে প্রাণলয়ে কোথাও পালানই ভাল। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে অবলার দিকে চাহিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণটা দুঃখে ভারি হইল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল ‘মা! তুই কিছু ভয় পাসনি’। আমি তোর সম্পর্কে কাকা। তুই আমাদের কাছে থাকবি। আমরা যদি কোথাও যাই তোকে সঙ্গে লয়ে যাব।”

রমণী ‘হা হরি’ বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তার পর দুঃখিত স্বরে বলিল ‘না আর দেরি করা নয়’। তুমি আজই একটা আমাদের বিলি কর। আর এখানে থাকবো না। ও গাঁ হতে গরুর গাড়ি ভাড়া করে আন, কি পাল্কি আন। বিষয় টিষয় পড়ে থাক। এখন প্রাণ বাঁচিয়ে ভালয় ভালয় কলিকাতায় পালাই চল। পুরুষটী তখন ক্ষুব্ধস্বরে বলিল ‘ও গাঁয়ে গরুর

গাড়ি আছে গাড়োয়ান নাই, গরু নাই। বেহারা পাড়ার সব মরিয়াছে, বাড়ি ঘর পড়িয়া আছে।

র। তবে পায়ে হেঁটে যা'ব চল।

পু। মরণ বাঁচন ভগবানের হাত, মৃত্যু কোথায় নাই।

র। যা হয় কর, আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগেনা। কলিকাতায় পালয়ে গেলেই ভাল।

অবলা কথা শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল, হয়তো তাহাকে একলা থাকিতে হইবে—অবলা কি প্রকারে থাকিবে?

স্ত্রী পুরুষে কথা কহিতে কহিতে এই স্থির হইল যে, পর দিবস অবলাকে সঙ্গে লইয়া সে গ্রাম পরিত্যাগ করা হইবেক।

পুরুষটী তামাক অন্তঃসার করিয়া, ধূমে সে স্থানের আকাশ পূর্ণ করিয়া বাটীর বাহিরে গমন করিল।

স্ত্রীলোক অবলাকে দাওয়ায় রাখিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। তখন রান্না ঘরে উনুনে ভাত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। ভাতের ফেন মুক্তার মুকুটু তৈয়ার করিতে করিতে;—মানুষের আকাঙ্ক্ষার অনুকরণ করিতে করিতে হাঁড়ির মুখের উপর উঠিতেছিল। কতকটা ফেন হাঁড়ির গা বহিয়া উনুনের আগুণে পড়িয়া শোঁ শোঁ করিতেছিল। রমণী ব্যস্ত ভাবে হাঁড়িতে একটু জল ঢালিয়া দিল। তারপর একটা কাটি দিয়া দুটা ভাত তুলিয়া টিপিয়া বুঝিল ভাত হইয়াছে। রমণী ভাত নামাইয়া আবার অবলার কাছে গেল। অবলার তত বেলায় খুব ক্ষুধা পাইয়াছে ভাবিয়া রমণী বলিল বাহবার হ'য়েছে;—স্ত্রীলোকের স্বামী বেঁচে থাকলেই সব বজায় থাকলো। আর কেঁদে কি করিবি মা। মুখ চোখ যে কেঁদে কেঁদে ফুলেছে, চোখ লাল

হ'য়েছে। মা! আর কেঁদনা কিছু খাও। অবলা চুপ করিয়া থাকিল। রমণী আবার জিজ্ঞাসিল "তা হুটী ভাত আমাদের খানা? ছেলে মানুষ দোষ কি? আর কেবা জানবে? অবলা চুপ করিয়া থাকিল। একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছল ছল্ দৃষ্টিতে একবার রমণীর মুখের দিকে তাকাইল। অবলার সে মুখ দেখিয়া রমণীর চোখে জল আসিল।

আঁচলে আপনার চোখের জল মুছিয়া রমণী আবার অবলাকে ভাত খাইতে বলিল। অবলা বলিল "তাকি পারি, জাত যাবে যে"। বলিতে বলিতে মার চেহারা বাবার চেহারা স্মৃতিতে দেখিতে দেখিতে অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা নিকটের পুকুরে রমণীর সঙ্গে গিয়া স্নানাদি করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর কায়স্থরমণী অহল্যা মলিন মুখী অবলাকে ঘরের ভিতরে লইয়া একখানা মাতুরে বসিয়া, কথোপকথন করিতেছিল। অবলার কাছে সংসারের ভীষণতম মূর্ত্তি—আর অহল্যার কাছে সে মূর্ত্তির অন্ধকারময়ী ছায়া। অবলা বালিকা হইলেও সে বিপদে যেন একটু বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। মলিন-ভাবে, অবনতমুখে মাটীর দিকে দৃষ্টি স্থিরকরিয়া, নিরাশার দেশে প্রাণ হারাইয়া, দুঃখের পূর্ণতায় আপনার অস্তিত্ব অনুভব করি-তেছে। অহল্যার প্রাণের লাবণ্যে সে অবস্থার একটা কালছায়া পড়িয়াছে। তাহারা দুজনে উক্ত অবস্থায় একটা মোটা মাতুরে আছে। অবলা হেটমুখে মাতুরের ধারে একটা ভাঙ্গা কাটি লইয়া খুঁটিতেছে। অহল্যা অবলার ম্লান মূর্ত্তির দিকে মাঝে মাঝে তাকাইতেছে। কবাটে একটা টিক্‌টিকি চুপ করিয়া আছে—মাঝে মাঝে লেজটী ঈষৎ নাড়িতেছে। অহল্যা তখন অবলার বিষয় ভাবিতেছিল। অহল্যা ভাবিতেছিল "স্বামী যখন আছে তখন আর অবলার ভয় কি" ?

অমনি কবাটের ত্রিকালজ্ঞ টিক্‌টিকি সায় দিয়া বলিল "টিক্ টিক্ টিক্"।

টিক্‌টিকির সায় পাইয়া অহল্যা হৃদয়ে বল পাইল। উৎ-সাহিত হৃদয়ে আবার অবলার বিষয় ভাবিতে লাগিল। অব-লার দুঃখে অহল্যা দুঃখ অনুভব করিতে করিতে ভাবিল:—

এত বিপদেও কি স্বামী ওর খবর লবে না! একবার জান্‌তে পারলে নিশ্চয়ই লবে!!

ভাবিয়াই টিক্‌টিকির দিকে মন স্থির করিল; অহল্যার হৃদয়টা একটু চমকিয়া উঠিল। টিক্‌টিকি কিছু উত্তর দিল না, ইহাতে অহল্যার প্রাণটা বড় বিমর্ষ হইল। অহল্যা তখন বিমর্ষপ্রাণে ভাবিল; "তবে বুঝি হতভাগীর খবর লবে না"। অমনি টিক্‌-টিকি যেন যমালয় হইতে সায় দিল "টিক্ টিক্ টিক্"।

অমনি অহল্যার বুক ভাঙ্গিয়া একটা বিষপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়িল অহল্যার দুচক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। সে দীর্ঘশ্বাসে অবলা না বুঝিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অহল্যা আবার ভাবিল, "স্বামীর কাছে অবলাকে পাঠায়ে দিলে কি স্বামী যত্ন করিবে না!! অমন সুশীলা অমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি স্বামী যত্ন করিবেন না? এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে অহল্যা দুঃখে মৃতপ্রায় হইতে লাগিল। আবার টিক্‌টিকির দিকে মনস্থির করিয়া ভাবিল "হতভাগীর নিতান্তই পোড়াকপাল"।

অমনি টিক্‌টিকি জোরে সায়দিল "টিক্ টিক্ টিক্"। অবলার অদৃষ্টের উপর টিক্‌টিকির ভীষণ ব্যবস্থা দেখিয়া অহল্যার প্রাণ মুচড়িয়া গেল। তখন অহল্যা প্রাণের দুঃখ প্রা[illegible] চাপিয়া অবলার সহিত কথা আরম্ভ করিল।

অহল্যা অবলার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ অবলা! মার জন্য কি মন কেমন করছে"? প্রশ্ন শুনিবা-মাত্র অবলার দুচক্ষু দিয়া কয় ফোঁটা জল টস টস করিয়া পড়িয়া গেল। দেখিয়া অহল্যা মনে মনে বড় অপ্রতিভ ও ব্যথিত হইয়া অন্য কথা পড়িল।

"তোর শ্বশুরবাড়ীর খবর কিছু জানিস" ? অবলা মুখ হেঁট করিয়া থাকিল কিছু উত্তর করিল না। কথাটা শুনিবামাত্র অবলার অস্তিত্বের ভিতরটা যেন কি আশায় কি ভয়দায় কি ভাবনায় ফুলিতে লাগিল। অবলা মনে মনে স্থির করিল "আমি শ্বশুর বাড়িতেই যাব সেখানে শাশুড়ি আছে"। অমনি সেই আশা পূর্ণ ভাবের সহিত অবলার মলিন সৌন্দর্য্য কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল—তাহাতে যেন যন্ত্রণার কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল।

অহল্যা আপনার কথার উত্তর পায় নাই তাই আবার জিজ্ঞাসিল "তার আর লজ্জা কি মা ! আমার কথার উত্তর দাও"।

অবলা আস্তে আস্তে ভারিস্বরে বলিল "কি" ?

অহ। তোর শ্বশুর বাড়ির খবর কিছু জানিস ?

অবলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না" ?

অহ। শ্বশুর আছে না ?

অব। না।

অহ। শাশুড়ি ?

অব। আছে।

অহ। কোথা ?

অব। কলকাতায়।

অহ। জামাই কোথায় ?

অবলার প্রকৃতিটা অমনি কাঁপিয়া উঠিল—অবলা চুপ করিয়া থাকিল—তখন অবলার দুঃখের সাগর যেন উথলিয়া উঠিল।

অবলার সেই গম্ভীর ভাব দেখিয়া অহল্যার প্রাণের উপর দিয়া একটা দুঃখের স্রোত যেন চলিয়া গেল। অহল্যা কিয়ৎক্ষণ

পরে ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"অত লজ্জা করছ কেন মা"! দেখ্ ছোতো কি বিপদ উপস্থিত! এই তিনজন মাত্র প্রাণে বেঁচে আছি! তাও কে কবে মরবো তার ঠিক্ নাই।

অহল্যা আবার ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "জামাই কোথা আছে জানিস্" ?

অবলা তখন চক্ষের পল্লব দুটি একটু অহল্যার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল "কলকাতায় পড়ে"। বলিয়াই চক্ষু অবনত করিল।

অহল্যা আবার জিজ্ঞাসা করিল "জামাই আর বে করে নাই তো" ?

অবলা সেই প্রশ্নের ভিতরে যেন আর একটা দুঃখের ভীষণ ছায়া অনুভব করিল; তাই অবলার বুকটী অমনি গুর গুর করিয়া উঠিল, নিশ্বাস জোরে পড়িল, সুন্দর মুখে নীলিমা পড়িল।

অহল্যা অবলার আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া কতকটা বুঝিল; সে কথা উল্টাইয়া অন্য কথা পাড়িল।

অহ। হাঁ অবলা! তোমার বয়স এখন কত ?

অব। ১২ বৎসর।

অহ। বে হয়েছে কঁয় বৎসর ?

অব। তিন বৎসরে বে হয়েছে।

অহ। জামাই একবার এসেছিল না ?

অবলা ভারি সুরে বলিল "না"।

অহ। সেকি লো! একবারও আসে নাই!! আমি যে বৎসর যখন বাপের বাড়ি যাই, তোর বাপ আন্‌তে গেছ্‌ল না ?

বাপের কথা হওয়ায় অবলার প্রাণটী আবার ব্যাকুল হইল সুতরাং ব্যাকুল সুরে অবলা উত্তর দিল "না"।

টিক্‌টিকিটা এতক্ষণ একটা মাছি শীকারে ব্যস্ত ছিল, এখন মাছিটীকে জয় করিয়া সেটাকে ধরিয়া কয়েকবার জোরে নাড়া দিয়া সেটাকে উদরস্থ করিল। তারপর আস্তে আস্তে কপাটের একপাশে গিয়া উহাদের দুঃখের কথা শুনিতে থাকিল।

অহল্যা অবলার বিষাদপূর্ণ "না" শুনিয়া যখন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল "কি দুরদৃষ্ট একবারও আসে নাই। মেয়েটার কপাল বড়ই মন্দ দেখ্‌ছি; তখন টিক্‌টিকিটা খুব জোরে সায়-দিল "টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌"।

এবার টিক্‌টিকির শব্দ অহল্যার ভাল লাগিল না। অহল্যা সেটার উপর বড়ই বিরক্ত হইল। তাই কবাটে সেটাকে দেখিতে পাইয়া হাত বাড়াইয়া কবাট ধরিল। "আ পোড়ার মুখ তোমার" বলিয়া জোরে কবাট ধরিয়া নাড়া দিল। টিক্‌টিকিটা সড়াৎ করিয়া দেওয়ালের উপরে পরলের কাছে থাকিল। থাকিয়া কথা শুনিবার জন্য কাণ পাতিল। টিক্‌টিকিরা কত লোকের গুপ্তকথা শুনে—তাহাতে সায় দেয়। টিক্‌টিকিরা ত্রিকালজ্ঞ—উহাদের কথা জীবনে অনেক ফলিয়া থাকে।

অহল্যা অবলাকে লক্ষ করিয়া বলিল "তাইতো। একবারও আসে নাই? কেন আসে নাই জানিস"?

অব। কি জানি?

অহল্যা মনে মনে ভাবিল "ক'নে মনে ধরেনি কি? অমন সুন্দরীমেয়ে মনে ধরেনি! কি আবার বিয়ে করবে বুঝি! তা হবে!

টিক্‌টিকিটি আবার দেওয়ালের উপর হইতে বলিল—"টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌"।

আরে ঝাঁটা মার তোরে!! বলিয়া অহল্যা ভ্রুভঙ্গি করিয়া দেওয়ালের উপরে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিল। টিক্‌টিকির ভয় নাই সে সেইখানেই চুপ করিয়া থাকিল।

অহল্যা ভাবিতে ভাবিতে কতকটা নিরাশার সহিত বলিল—“অবলা তোমার মামা আছে না”?

অব। আছেন বোধ হয়—এ মড়কে কেমন আছেন জানিনা।

অবলার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, চোক মুখ দুঃখে ভরিল অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

অহ। খবর কতদিন পাও নাই?

অব। মামার বাড়ীর খবর অনেক দিন পাওয়া যায় নাই।

বলিতে বলিতে অবলার স্মৃতিতে মামার চেহারা খানা ফুটিয়া উঠিল—মামার সে আকৃতিটী যেন সামনে ভাসিতে লাগিল। মামার বাড়ীর কত কথা মনে আসিল। অবলার দিদিমার আকৃতি মনে আসিল অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুদিয়া দুঃখপূর্ণ শূন্যের দিকে এবং রমণীরদিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “আমার দশা কি হবে?—আমি হয়তো আর বাঁচিবো না। এত দুঃখে পড়িয়াও মানুষের মরিতে ভয়। মানুষ মহাবিপদে পড়িয়া বাঁচিতে চায়। তখন অহল্যা সজলনেত্রে বাৎসল্যভাবে ধীরে ধীরে বলিল—“সে কিমা! অমন কথা বলতে আছে। তুমি আমাদের কাছে থাক্‌বে! তোমার কিছু ভয় নাই মা” বলিতে বলিতে অহল্যা আঁচল দিয়া অবলার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিল।

দুরবস্থা ভাবিতে ভাবিতে অবলার অশ্রুবেগ বাড়িয়া উঠিল। অবলা প্রবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল “না হয় ভিক্ষা

করে খাব"। বালিকার মুখে ভিক্ষার কথা শুনিবামাত্র অহল্যা কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভিক্ষা কোথা পাবে মা? গ্রাম যে শ্মশান!!

অবলা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ীর বিষয় ভাবিল; কিন্তু কোন চেহারা মনে আসিল না। সকলের যেমন শ্বশুরবাড়ী স্বামী, তারও তেমনি;—ইহা ব্যতীত আর কোন ভাব মনে আসিল না। তারপর মামার চেহারা ভাবিল—মামার বাড়ীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে সে বিপদে যেন একটু সুখের ছায়া অনুভব করিল।

অহল্যা অবলার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে কোন প্রকারে স্বামীর কাছে পাঠানই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। অবলার স্বামীর প্রতি কোন ভাব আছে কিনা জানিবার জন্য অবলাকে লক্ষ্য করিয়া অহল্যা বলিল "স্বামী স্ত্রীলোকের কেমন সামগ্রী। এই দেখ সব ম'রে গেছে আমি স্বামীর মুখদেখে বেঁচে আছি। তা তুমি ভিক্ষা করে খাবে কেন মা? তোমার স্বামী তোমায় ল'য়ে যাবেন তোমার ভয় কি"?

সে কথাগুলি শুনিতে শুনিতে অবলার প্রাণে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল।

অবলার যদিও তিন বৎসরের সময় বিবাহ হইয়াছিল; অবলা বিবাহের পর আর স্বামীকে এপর্য্যন্ত দেখে নাই; সুতরাং স্বামীর আকৃতির কোন কথা অবলার মনে ছিল না। তথাপি অবলা স্বামীর কথা সময়ে সময়ে ভাবিত। মা চুল বাঁধিবার সময় জামায়ের কথা নিকটের কোন আত্মীয়ের কাছে বলিত; কি প্রকারে শ্বশুর ঘর করিতে হয় অবলাকে সে বিষয়ে উপদেশ

দিত। মার মুখে স্বামীর কথা শুনিতে অবলা বড় ভাল বাসিত। মার মুখে স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অবলা স্বামীর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করিল। বালিকা আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় স্বামীর কথায় পূর্ণ করিয়াছিল। "স্বামী স্ত্রীলোকের গুরু, স্বামীর তুল্য গুরু নাই" ; মার মুখে একথা শুনিয়া অবধি স্বামীকে তদ্রূপই ভাবিত। বালিকার ক্ষুদ্রজীবন প্রণয়-সৌরভে পূর্ণ হইয়াছিল।

রমণী ঐ সব কথা কহিলে অবলা বলিল, "হ'য়তো বেঁচে নাই।"

কথাটী বলিয়াই অবলা প্রবলবেগে অশ্রুমোচন করিল, চারিদিক শূন্য দেখিল, যাতনায় বুক ফাটিবার মত বোধ হইল।

অহ। বালাই! ওকথা বলতে আছে মা! জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক।

অহল্যা আবার বলিল "তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাবে"?

অবলা তখন দুঃখ ও আশার মাঝে পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কে রেখে আসবে"? কথা বলিতে বলিতে অবলার হৃদয়ে একটা আশার উচ্ছ্বাস উঠিল,— সেই ভাবোচ্ছ্বাসে অবলার মলিন মুখে একটা দীপ্তি ফুটিল। অহল্যা তখন একটু উৎসাহের সহিত বলিল "তা উনি না হয় রেখে আসবেন।"

অবলার প্রাণে আশার বল বাড়িল। অবলা আশায় বিহ্বলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'উনি কি জানেন কোথা ?

অহ। তা সন্ধান করে রেখে আসবেন। অবলা কিছু বলিল না, রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটি আশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুইজনে এইরূপে কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ অহল্যা শুনিতে পাইল। বুঝিল স্বামী আসিয়াছে। অহল্যার স্বামী বিশ্বনাথ দাওয়ায় উঠিয়াই 'আড়কাটা হইতে একটা মাদুর পাড়িল—ধুপ করিয়া একটা বালিস টানিয়া দাওয়ার উপর ফেলিল। অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে মাদুরটা ছড়াইল,—ভাল ছড়ান হইলনা; মাঝে মাঝে কুচকান থাকিল, বালিসের খানিকটা মাদুরে খানিকটা মাটিতে থাকিল। সেই অবস্থায় বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া কাতরে অহল্যাকে ডাকিল "বাহিরে এস বড় গা কেমন ক'রছে"।

ইতিপূর্ব্বে মাদুর ও বালিসের ধুপ ধাপ শব্দ এবং বিছানা পাতার গোলমেলে আওয়াজ শুনিতে শুনিতে অহল্যা "উঠি উঠি" করিতেছিল।—এখন স্বামীর কাতর আহ্বান শুনিবামাত্র বড়ই চমকিত ভাবে ধড়মড় করিয়া উঠিল। "কি সর্ব্বনাশ হয় বা"—ভাবিতে ভাবিতে এলো থেলো ভাবে লুণ্ঠিত আঁচলে খোলাগায়ে দাওয়ায় আসিয়া যখন দেখিল, স্বামী বিছানায় একপেশে হইয়া শয়ন করিয়াছে তখনই মাথার মগজ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল; শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অহল্যা দ্রুত স্বামীর কাছে আসিয়া বসিল। স্বামীর পৃষ্ঠের উপরে শরীর হেলাইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া অতি মলিনমুখে অতি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিল কি অসুখ করছে;—ভয়ে আমার

সর্ব্বশরীর যে কাঁপছে”। বাস্তবিক তখন অহল্যা ভয়ে কাঁপিতে-ছিল। স্বামী শুইয়াছিল উঠিয়া মাদুর হইতে সরিয়া দাওয়ার ধারে গিয়া বসিল। বিশ্বনাথের গার ভিতরে তখন একটা ভীষণ যাতনা হইতেছিল—সর্ব্বশরীর ঘুরিতেছিল। বিশ্বনাথ দাওয়ার ধারে বসিয়া ব্যমি করিল—তারপর ভয়ানক ভেদ হইল। অহল্যার দুচক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অবলা তখন কাছের খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল “এ আশ্রয় ও বুঝি যায়”। অবলা তখন জীবনের সম্মুখে এক ভীষণ কাল রাত্রি দেখিতেছিল। তখন মার ভেদ ব্যমির কথা মনে স্পষ্ট উঠিতেছিল। অহল্যা স্বামীকে ধরিয়া শুয়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবলাকে বলিল “দাঁড়য়ে আর দেখছিস কি মা! শীঘ্র এক ঘটি জল আন। অবলা তাড়াতাড়ি শীঘ্রই একটা বড় ঘটি করিয়া জল আনিল।

বিশ্বনাথের আবার একবার যখন ভেদ হইল তখন দুর্ব্বলতা বশতঃ বিশ্বনাথের শরীর কাঁপিতে লাগিল। অহল্যা দ্বিতীয় বারের ভেদ দেখিয়া বড়ই ভয় পাইল। অবলার দিকে পাগলিনীর মত অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া বলিল “মা অবলা! কি হবে মা। একবার ও গাঁয়ে যেতে হবে—শীঘ্র যা মা! হরি ডাক্তারকে ডেকে আন মা”। অবলা বিশ্বনাথের দশা দেখিয়া কেমন হইয়াছিল; এখন অহল্যার কাতর কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে কম্পিত স্বরে অবলা বলিল, “তবে আমি যাই—ডাক্তারকে ডেকে আনি”। বলিয়াই অবলা দাওয়া হইতে নামিল। তখন অহল্যা ব্যাকুল ভাবে অবলাকে বলিল “দেখিস্ মা! আজ তোর হাতে আমার প্রাণ

সমর্পণ করিলাম শীঘ্র ডেকে আনতে চাস্। কথা শুনিয়া অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুত ধাবিত হইল। অবলা বরাবর দ্রুত চলিল। কখন কখন ব্যাকুলভাবে ছুটিতে লাগিল। দুঃখের উচ্ছ্বাসে অবলার প্রকৃতি কাঁপিতেছে—দুচক্ষু লাল—অশ্রুপূর্ণ—মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। সেই ভাবে অবলা ডাক্তার আনিতে চলিল। অবলা ডাক্তরকে ২।৩ বার দেখিয়াছিল কিন্তু তাহার বাড়ী চিনিত না। তথাপি অবলা চলিল—আর যে কেহ নাই। অবলা ভয়ে বিকম্পিত পাদবিক্ষেপে দ্রুত চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করিয়া অবলা দুঃখে ভয়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিল। অবলা আপনাকে ভুলিয়া, বিশ্বনাথের বিপদের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বিকৃতমনে সোজা রাস্তা ভুলিয়া বাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। তখন বৈকাল বেলা সূর্য্য ভীষণ মুর্ত্তি দেখাইয়া পশ্চিমের আকাশে অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে। তথাপি রৌদ্রের খুব উত্তাপ। শ্মশানতুল্য গ্রামের জনশূন্য বাটী সকলের ছায়ার উপর দিয়া ও কখন রৌদ্রপূর্ণ পথের মধ্য দিয়া, ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে, কখন গাছ পালার দিকে তাকাইতে তাকাইতে অবলা চলিতে লাগিল। অবলা পুকুরের পাড়ের কাছ দিয়া, কখন পাড়ের উপর দিয়া, কখন বাঁস বনের ভিতর দিয়া, গ্রামের নির্জ্জনতা নীরবতা অতিক্রম করিয়া, মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই মাঠ পার হইয়া হরি ডাক্তারের বাড়ী—শ্যামপুরে যাইতে হয়।

অবলা এদিক ওদিক চাহিয়া শ্যামপুরের দিকে চলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামপুরের নিকটে পঁহুছিল। সেখানে মাঠের ধারে একটা ইটের পুরাণ পাঁজা। তার উপরে কয়েকটী অশ্বত্থের চারা জন্মিয়াছে। পাঁজার আশপাশ বিছুতীর ঝাড়ে পূর্ণ হইয়াছে। বিছুতির লম্বা লম্বা সাপের মত শাখা বায়ুভরে দুলিতেছে। পাঁজার কাছে একটা শুষ্ক ডোবা—তার ধারে ছোট ছোট তালগাছ—চারি দিকে ভ্যারেণ্ডার বন। অবলা সেই খানে গিয়া দাঁড়াইল;—বিরস প্রাণে অধোমুখে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কোন্ দিকে কোন্ পথে যাবে তাহা ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কিছু ঠিক পাইলনা। অবলার সম্মুখে একটা বড় আম বাগান। অবলা সেই বাগানে রাস্তার চিহ্ন দেখিল। লোকের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সে রাস্তা লুপ্তপ্রায়—ঘাসে, আগাছায়, আমের পাতায় পুরিয়া রহিয়াছে। অবলা আমবাগানে প্রবেশ করিল। অনেক দূর লক্ষ্য করিয়া দেখিল বাগানের পরে একটা কোটা বাড়ী। প্রাণে একটু আশা জন্মিল। সে বাটিতে মানুষ থাকিতে পারে, এই আশায় বুক কাঁপাইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল—অবলার চক্ষে জল আসিল। বিশ্বনাথের নিদারুণ দশার কথা সর্প দংশনের ন্যায় অবলার প্রকৃতিতে একটা যন্ত্রণার আগুন ফেলিয়া দিল। অবলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তখন বাগানের গাছ সকল আমে ভরিয়াছে। খাবার লোক নাই, পাড়িবার লোক নাই। আম গাছের তলায় রাশি রাশি টাট্‌কা, রাশি রাশি শুক্ন আম পড়িয়া আছে। বাগানে কাক ডাকিতেছে—পাখী ডাকিতেছে—উড়িতেছে—আমে ঠোকর মারিতেছে—ঠোকরের আঘাতে পাকা পাকা আম ধুপ ধাপ করিয়া ভূমে পড়িতেছে। অবলা সে সব দেখিল না—দ্রুতবেগে পাগলিনীর

যত চলিতে লাগিল। অবলা বাগানে চলিতে চলিতে অসংখ্য পোকার তড়বড় তড়বড় শব্দ শুনিল। সেই শব্দ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেই সব পোকা অবলার মুখে গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বসিতে লাগিল—অবলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবলা অনেক ক্লেশে নাক, মুখ টিপিয়া—আঁচলের তাড়া করিয়া তাহাদের সহিত লড়াই করিতে করিতে বাগান পার হইল। সেই কোটাবাড়ির সাম্‌নে গিয়া বালিকা হাঁপ ছাড়িল। সেনপুর প্রকাণ্ড গ্রাম, গ্রামে জন-মানবের সাড়া নাই। কেবল কাক ডাকিতেছে—কুকুর চীৎকার করিতেছে—গাছের শুষ্ক পাতা মাঝে মাঝে ঝরিতেছে। এইরূপ অবস্থার মাঝে সেই প্রকাণ্ড জনশূন্য কোটা। কোটার বাহিরে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের নীচে ঘাস বাড়িয়াছে—চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির উপরে ইটের ফাটলে ফাটলে ছোট আগাছা গজাইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে একটা বিশ্রি গন্ধ বাহির হইতেছে। ভিতরে চামচিকা উড়িতেছে—চড়াই ডাকিতেছে—বেঙ্‌ লাফাইতেছে—জানালায় মাকড়সারজাল ঝুলিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে কতদিন ঝাঁট পড়ে নাই। চণ্ডীমণ্ডপ চালের কুটী, উইএর মাটী, ধুলা, পাখীর পালক, পাখীর ডিমের খোলা, সাপের খোলস, প্রাণীর বিষ্ঠা প্রভৃতিতে ভরিয়া রহিয়াছে। গন্ধে সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্য! অবলা সেখানে বাপের সহিত আসিয়া কয়েকবার যাত্রা শুনিয়াছিল—এখন তা মনে পড়ায় আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একবার দাঁড়াইল। ভিতরে একটা রাঙা কুকুর তার কয়েকটা সাদা দাঁত বাহির করিয়া এক পেশে হইয়া ঘুমাইতেছিল। অবলা আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপে

উঠিল। অবলার পার সাড়া পাইয়া কুকুরটা একটু শিহরিয়া উঠিল। কুকুর ঘুমাইতে লাগিল। অবলা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল। কুকুরটা তখন জাগ্রত হইয়া বিকট মুখব্যাদানে হাই তুলিল। দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া গার আলস্ত ভাঙ্গিল—ঝট্ পট্ করিয়া কাণ দুটা নাড়িল—তারপর লাল পাতলা জিহ্বাটা কাঁপাইয়া লাল ফেলিতে ফেলিতে উর্দ্ধ-লাঙ্গুলে ছুটিয়া অবলাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

অবলা কোটার পার্শ্বস্থ একটা বড় রাস্তা দিয়া গ্রামের ভিতরে চলিল। মানুষ আদতে দেখিল না। রাস্তার ধারে মড়ার মাদুর—বাঁশবনে মড়ার বালিস, লেপ, কাঁথা। কোথাও মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও মৃতদেহ শৃগাল কুকুরে টানাটানি করিতেছে। কোথাও একটা পুকুরের পাড়ের ধারে একটা কুকুর মড়ার হাত লইয়া চর্ব্বন করিতেছে। কোথাও কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিতেছে। অবলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন যমালয়ের ভিতরে অগ্রসর হইতেছে। ঐ কুকুরটা আসিতেছে—এই বার অবলা কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কিছু বলিল না অবলার পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল।

অবলা কিয়ৎদুর গিয়া মানুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল—অবলার বুক টিপ্ টিপ্ করিল—চোকে জল আসিল। অবলা সেই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া চলিল। ক্রমশঃ সেই ক্রন্দনের কাছে পঁহুছিল। অবলা একটী ক্ষুদ্র বাঁশঝাড়ের পাশে একখানা চালাঘর দেখিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে কান্না আসিতেছে। ঘর খানার চালের খড় পচিয়াছে—মাঝে মাঝে কাল বাঁখারি বাহির হইয়াছে। একটা দাঁড়কাক তার মটকায় বসিয়া গলা ফুলা-

ইয়া গম্ভীর ভাবে, বাঁশঝাড়ের উপরের আর একটা কাকের সহিত সমস্বরে ক্ক ক্ক শব্দে ডাকিতেছে। বাড়ীর ধারে বাহিরে রাশিকৃত গুগুলি ও শামুকের খোলা—ঘরের চালে এক খানা ছেঁড়া জাল টাঙান দেখিয়া অবলা বুঝিল—কোন ছোট লোকের বাড়ী। অবলা আস্তে আস্তে সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতরে যে কাঁদিতেছিল, সে আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল। তার বয়স প্রায় সত্তর। রং কাল। গার মাংস কুঁচকান। কপাল, গাল, গলা, পেট, আশ-পাশ সর্ব্বস্থানের মাংস কুঁচকান। বাম গণ্ডের উপরে ছোট তেঁতুল বীজের মত একটা বড় তিল। তিলের উপরে এক গাছা চুল। বুকের হাড় বহির হইয়াছে। সেই শুষ্ক কেটোস্থান হইতে ছুটা কদাকার স্তন শুষ্ক বেগুনের মত ঝুলিতেছে;—কালের আকর্ষনে তাহা চুপ্সিয়া গিয়াছে। বুড়ি বয়সে, শোকে, রোগে, অনেকটা বাঁকিয়া পড়িয়াছে। এক খানা ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ নেকড়া পরিয়া আছে। বুক খোলা। পেট খোলা। কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে মাত্র। বুড়ি বাটীর ভিতরে সেই রূপের রাশি দেখিয়া চমকিত হইল। অনেক দিন মানুষের মুখ দেখে নাই তাই আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। নাকের শ্লেষ্মা বাম হাতে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভারি ভারি স্বুরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাদের মেয়ে বাছা"!

অবলা একটু উৎসাহিত প্রাণে কাছে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে মিষ্টস্বরে বলিল "আমি সেনপুর থেকে এসেছি"।

"কেন মা! কেন এসেছিলি?—এ যম পুরীতে আস্‌তে ভয় করেনি?" বুড়ি অতিব্যস্তে এই কথা বলিল।

দেবে ?”—বালিকা কাতর স্বরে এই কথা বলিল।

“কেন বাছা! কি দরকার” ? একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বুড়ি এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

অবলা “আমাদের বাড়ীতে বড় ব্যারাম গো—তাই।”

বু। তুমি কাদের মেয়ে!

অব। বামুনদের।

বু। হা ভগবান! হরিডাক্তার কি আর আছে! এই রাক্ষসি সব খেয়েছে মা সব খেয়েছে! আমি তার বাড়ীতে দশ বছর থাকি। কত গু মূত কেটে তার ছেলে মেয়েকে মানুষ করি। বলিতে বলিতে বুড়ি কাঁদিতে লাগিল। অবলাও সঙ্গে সঙ্গে চখের জল ফেলিল।

তার পর বুড়ি অবলাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল “ছেলে মানুষ এখানে থেকনা মা! বড় ভুতের ভয়। সন্ধ্যা হয়ে এল। শীঘ্র ঘরে যাও মা শীঘ্র ঘরে যাও;—বড় শিয়াল কুকুর ক্ষেপেছে”।

অবলা ভয়ে কাঁপিল—নৈরাশ্যে ডুবিল—কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—)০(—

অবলা শ্যামপুরে হরি ডাক্তরকে ডাকিতে যাইবার পরেই, বিশ্বনাথের যখন তৃতীয় বার ভেদ হইল তখন বিশ্বনাথ শয্যাগত। অহল্যার তখন মনে হইল কর্পূর খাওয়াইয়া দি। অহল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে কোমরের ঘুন্‌সি হইতে চাবি বাহির করিল। তারপর ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স খুলিল। বাক্স খুলিয়া কর্পূর খুঁজিতে লাগিল। এগেবে ওগেবে, এশিশি ও শিশি, উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে সময়যায়—অহল্যা ব্যাকুলতায় অস্থির হয়—কর্পূর খুঁজিয়া পায় না। কর্পূর একটা কুলিঙ্গিতে ছোট একটা শিশিতে ছিল—অহল্যার তাহা মনে ছিল না। বাক্স খুঁজিতে দেরি হইতে লাগিল—অহল্যা পাগলিনীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বাক্সটা উল্‌টাইয়া মেজের উপরে ঢালিল। টাকা, সিকি, পয়সা, কাঁচের বাটী ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া পড়িয়া গেল। ছুটী কাঁচের মারবেল্‌ মেজের উপরে গড়াইতে গড়াইতে চলিল। অহল্যার ডান চক্ষু নাচিয়া উঠিল। অহল্যা সে বাক্সে কর্পূর পাইল না। আর একটা খুঁজিল—পাইল না। তার পর আর একটা ছোট বাক্সে যখন মিলিল না, তখন রাগে বাক্সটা অহল্যা উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাক্স ফেলিয়া শীকার হাঁড়ি খুঁজিল, পাইল না। এক একটা হাঁড়ি উল্‌টাইয়া মেজেতে ফেলিতে লাগিল। হাঁড়ি হইতে মসলা প্রভৃতি ভূমে পড়িয়া গেল। গোলমরিচগুলা গড়াইতে গড়াইতে চারি দিকে

ধাবিত হইল। কর্পূর মিলিল না। তারপর একুলিঙ্গি ওকুলিঙ্গি খুঁজিল। অনেকক্ষণ পরে সেই কর্পূরের শিশিটা হস্তগত করিল। খানিকটা কর্পূর জলে গুলিয়া প্রাণের যাতনায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানকে ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে ডাকিতে কর্পূর স্বামীর মুখের কাছে লইয়া গেল। তখন বিশ্বনাথের শ্বাস হইয়াছে—চক্ষু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়াছে।

অহল্যা স্বামীর মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে-চাহিয়া যখন বুঝিল গতিক ভাল নয় ;—তখন পাষাণভেদী সুরে চীৎকারকরিল :—

"ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হলরে।"

আর নাই—চীৎকারের পরই বিশ্বনাথের দুচক্ষু স্থির, শরীর হিম অসাড়।

অহল্যা ভূতলে লুণ্ঠিতা হইল। যাতনায় মুখ মাটিতে চাপিয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিল। শোকটা যতক্ষণ প্রকৃতির ভিতর ঘনীভূত হইতেছিল—ততক্ষণ অহল্যা বাক্যহীন ছিল। তারপর সেই ঘনশোক অহল্যার প্রাণ ফাটাইয়া সরব ক্রন্দনে প্রকাশিত হইল। অহল্যা "আমার কি হ'লগো"—বলিয়া চীৎকার করিল। অহল্যা স্বামীর পাশে শোকের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে থাকিল। হাত ছুড়িতে ছুড়িতে হাতের চুড়ি এক এক গাছি করিয়া ভাঙ্গিয়া সেখানে খসিতে লাগিল। প্রবল শোকে অহল্যা মাথা খুঁড়িতে লাগিল—অপনার বুকের যাতনার উপর করাঘাত করিতে থাকিল—মাথার যাতনা কমাইবার জন্য মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল। বালা ও ভাঙা চুড়ির আঁচড়ে বুক চিরিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, গভীর শোকে, ভীষণ মর্ম্মভেদী নীরবতা, চীৎকার, কাতরোক্তি অহল্যার প্রাণে চাপ দিয়া সংগ্রাম করিতে থাকিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

অবলা শ্যামপুর হইতে ফিরিল। মাঠ পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন সূর্য্য ডুবিয়াছে। বাতাস ধীরে ধীরে গাছের পাতা কাঁপাইয়া বহিতেছে। পাখী আকাশে উড়িতেছে। সেই ভীষণ জনশূন্য গ্রামে রাত্রির কালছায়া পড়িতেছে। সেই ছায়া আকাশের নীলিমায়, আকাশের মেঘে, গাছের ঝোপে, বনের গাম্ভীর্য্যে, পুকুরের জলে সূক্ষ্মাকারে প্রবেশ করিতেছে।

অবলা যখন গ্রামের ভিতরে গিয়া বিশ্বনাথের বাটীর নিকটে গেল, তখন খানিকটা অশ্রু প্রবলবেগে অবলার বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিল। অবলা অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতে থাকিল। অবলার আর পা উঠে না। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অবলা দ্বারের কাছে আসিল। সেই খানে দাঁড়াইয়া,মানুষের শব্দ শুনিবার জন্য একমনে কাণ পাতিয়া থাকিল। কিন্তু কাহারও শব্দ শুনিতে পাইল না। বাটী নীরব নিস্তব্ধ। বাটীতে কি কেহ নাই? অবলার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল—গা ঘামিল। অবলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাটীর ভিতরে সাহসে ভর দিয়া প্রবেশ করিল। উদাসপ্রাণে পাগলিনীর মত বড় ঘরের দিকে ধাবিত হইল। ঘরের কাছে গিয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া চমকিত হইল—অবলার কাঁপুনি বাড়িল। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাওয়ায় উঠিল। দাওয়ায় কেহ নাই। বিশ্বনাথ কোথা? অহল্যা কোথা? ঘরের ভিতরে বুঝি!

অবলা ঘরের ভিতরে গেল। ঘর অন্ধকার। জনমানব নাই!! ঘরের মেজের উপরে তরল অন্ধকারে বাক্স কয়টা উল্টান রহিয়াছে; সাদা সাদা টাকা, সিকি, কাঁচের বাসন পড়িয়া আছে। শাঁকার হাঁড়ি উল্টান রহিয়াছে—মশলা ছড়ান রহিয়াছে! কই! মানুষ কই!! অবলা তখন ভয়ে নৈরাশ্যে আত্মঘাতিনীর মত উদাস ভাবে ডাকিল:—

"কাকী-মা"!

কেহ উত্তর দিল না। অবলা আবার ব্যাকুল প্রাণে চীৎকার করিয়া ডাকিল:—

"কাকী"।

কেহ উত্তর দিল না। সেই আঁধারপূর্ণ ঘরের ভিতরে বাসনের গা হইতে, বড় বড় কলসী, জালা, ঘটী, বাটীর ভিতর হইতে মৃদু ঝন্ ঝন্ শব্দে সেই কাথার প্রতিধ্বনি হইল।

অবলা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। উঠানে নামিল। সেখানে দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিতে চাহিতে জোরে ডাকিল:—

"কাকী-মা"!

কোন উত্তর পাইল না। অবলা তখন ভয়ে বিহ্বলা হইয়া আকাশের দিকে চাহিল। চাহিয়া এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে দীর্ঘশ্বাসে বালিকার যেন বুক ভাঙ্গিয়া গেল—দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে বালিকার গলদঘর্ম্ম হইল—অবলা কাতর প্রাণে চীৎকার করিল:—

"বাবাগো! মাগো! বড় ভয় করছে গো"!! চীৎকারের

পরই বালিকার মূর্চ্ছা হইল। অবলা উঠানের ধূলায় অন্ধকারে একলা পড়িয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। অবলা আস্তে আস্তে চক্ষু চাহিল। অবলার চারিদিকে অন্ধকার।, অন্ধকারের মাথায় আকাশে নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিতেছে—অন্ধকারের উদরে বনে ফুল ফুটিতেছে। অবলা চক্ষু চাহিয়াই তরল অন্ধকারে কাহাকে দেখিল ;—ছায়ার ন্যায় আকৃতি—অবলার মার মত কে ? অবলার শরীরের রক্ত হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল—অবলা উঠিয়া দাঁড়াইল। পাগলিনীর মত সেই আকৃতির দিকে "মা! মা"। করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। কিন্তু সে আকৃতি শূন্যে মিশিয়া গেল !!

নবম পরিচ্ছেদ।

অবলা সে বাড়ীতে একলা আর থাকিতে পারে না। একবার আকাশের দিকে চাহিতেছে, আর অনন্তপ্রসারিত নীলাকাশ যেন করাল-বদন ব্যাদন করিয়া কত বিভীষিকার মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া, বালিকাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। অবলা গাছপালার দিকে ভয়বিহ্বলা হইয়া নয়নক্ষেপ করিতেছে, আর গাছপালা হইতে যেন সংহারের মূর্ত্তি অবলাকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে। নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে, আর শরীর যেন মাটীতে মিশিবার জন্য অবলাকে ভয় দেখাইতেছে। অবলা সেখানে বসিতে পারে না; সেখান হইতে পলাইতেও পারে না, বালিকা ভয়ে চক্ষু মুদে, আবার ভয়ে চক্ষু খোলে। চক্ষু চাহিলে বাহিরে অন্ধকারে সেই শ্মশান সম গ্রাম এবং ভয়বিজড়িত প্রকাণ্ড আকাশ; আর চক্ষু মুদিলে আপনার ভিতরে, বাহিরের অন্ধকার অপেক্ষা ভীষণতম অন্ধকার, রাক্ষসের ন্যায় যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ মনে হয়।

সেই অন্ধকারে বিভীষিকার মধ্যে থাকিয়া অবলার ক্ষুদ্র মন কত কি ভাবিতে লাগিল! বালিকা আর অধিক ভাবিতে পারে না,—সে শক্তিও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। বালিকা ভাবিতে ভাবিতে ভয়-প্রকাণ্ডতায় অভিভূত হইতেছে—সেই ভয় জগতে আপনাকে একটী পোকার ন্যায় অনুভব করিয়া

মুদ্রিতনেত্রে যেন মৃত্যুস্পর্শে চেতনাশূন্য প্রায় হইতেছে। অবলা সেখানে আর থাকিতে পারে না। কিন্তু যায় কোথায়? গ্রামে যে আর একটী মানুষও নাই। অন্য গ্রামে আর কেহ আছে কি না, অবলা জানে না। ভাবিতেছে দুই তিন খানা গ্রাম পার হইয়া যে গ্রাম দেখিব, সে গ্রামে হয়তো অনেক মানুষ আছে—অনেক ঘর বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে, আমি সেই গ্রামে যাইয়া সেখানে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া থাকিব। বলিব আমার ঘর বাড়ী লও গহনা লও; কেবল দুটি দুটি খেতে দিও, আমি আর কিছু চাহি না। আবার ভাবিতেছে, তারপর একটু বড় হইলে কলিকাতায় গিয়া তাঁর (স্বামীর) অনুসন্ধান করিব। অবলা ভাবিতেছে আর ভয়ে কাঁপিতেছে।

এইরূপ চিন্তার সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বালিকা অন্যমনে আছে, নিজের দুঃখের ভারে নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগে আপনার সোণার দেহ কাঁপাইতেছে; এমন সময়ে নিশার আঁধার ঘন হইয়া, আকাশ, পথ, ঘাট, এদিক্ ওদিক সব আবৃত করিল। সেই জনশূন্যগ্রামে অমনি একবারে শত শত শৃগাল উচ্চ কর্কশ রবে চারিদিক কাঁপাইতে লাগিল। খদ্যোতের দল গাছের উপরে গায়ে, নীচে উড়িতে বসিতে থাকিল। বালিকা সেই অন্ধকারের উদরে একলা থাকিয়া প্রকৃতির সেই বিকটমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মৃতপ্রায় হইতে থাকিল।

সে বাটী ছাড়িয়া, স্থানান্তরে যাইবার জন্য অবলা ব্যস্ত হইল। যদি পাখা থাকিত তো কোন জনপূর্ণ গ্রামে, কোন গৃহস্থের বাটীতে উড়িয়া যাইত। অবলা ভাবিতেছে যদি কেহ এবাটীতে আসে তো বাঁচি। তার পায় ধরিয়া বলি তুমি আমার

লইয়া চল, আমি তোমার চাকরাণি হইয়া থাকিব। কিন্তু কেহ আসিল না, কেবল অন্ধকার নিবিড় হইয়া ভীষণতার ভাব ধরিতে লাগিল।

অবলা আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিল। কিন্তু যে দিকে চাহে সেই দিকে কে যেন গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। নিজের দিকে চক্ষু রাখিয়া, ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া, বাটীর বাহিরে যাইতে লাগিল। বাটীর বাহিরে গিয়া ভয়ে দৌড়িতে লাগিল। যত দৌড়ায় ততই কে যেন পিছনে পিছনে ছুটিয়া অবলাকে গিলিতে আসে। ছুটিতে ছুটিতে সম্মুখে আপনাদের বাটী দেখিল, ভয় একটু কমিল। কিন্তু বাটীতে আজ আর কেহ নাই— বাটী শ্মশান। আগে বাটীতে প্রবেশ করিলে মাকে দেখিত, দাদাকে দেখিত, মার আদর পাইত, দাদার, বাবার আদর পাইত, আজ সে সব জনমের মত ফুরাইয়াছে। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালিকা দেখিল, সব যেন দুঃখের শোকের মরণের বেশে দাঁড়াইয়া আছে। কোটাটা যেন নিস্তব্ধ পাহাড়ের মত—তাহাতে কত সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কত বিপদ বাস করিতেছে। আগে ঘরে ঘরে আলো জ্বলিত; রোয়াকে দাদা বসিয়া মার কাছে কত গল্প শুনিত—অবলা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। আজ আর সে সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—এজনমে দাদার দেখা অবলা আর পাবে না—তার দাদা বলা এজনমের মত ঘুচিয়া গিয়াছে।

বালিকা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা রাঁধিতে রাঁধিতে মরিয়াছে—আর মা

অবলার সহিত কথা কহে নাই; অবলা কত ডাকিয়াছিল তবু সাড়া পায় নাই। অবলা একটু ভয় পাইলে মার গলা জড়াইয়া ধরিত,আর মা বুকে রাখিয়া কত মুখচুম্বন করিত—কত আদর মাখান কথা কহিয়া ঘুম পাড়াইত;—আজ সে মা নাই। ঐখানে শুইয়াছিল;—আর ভাবিতে পারিল না;—সেই বিকট দাঁত কাটার মুর্ত্তি মনে পড়িয়া গেল। যেন দাঁত কাটা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—অবলা ভয়ে সেইখানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পড়িল।

অবলা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া, দুঃখের তাড়নায়, বিভীষিকার আঘাতে, আপনার প্রকৃতির ভিতর নিমগ্ন হইয়াছিল। অবলার মনের ভিতরে যে আকাশ অপেক্ষা গভীর বিস্তৃত মুক্ত সৌন্দর্য্যময় জগৎ—সেই জগতের একটা বৈদ্যুতিক তেজে অবলা হঠাৎ অনুপ্রাণিতা হইল; বালিকার মলিন মুখে দীপ্তি ফুটিল, শিরায় রক্তপ্রবাহ সতেজ হইল; সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল;—অবলা সাহসস্পর্শে ভাবিল ভয় কি? আমার তো স্বামী আছে;—আমার কিসের ভয়? তখন অবলার প্রকৃতিতে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই অন্তরবিপ্লবে অবলা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। বুক সাহসে স্ফীত হইল—মেরুদণ্ড সতেজ হইল—রক্তপ্রবাহে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল—দুচক্ষে যেন বিদ্যুৎ জ্বলিতে লাগিল—সেই আলোকে অবলার দুঃখের আমাবশ্যা সুখের পুর্ণিমায় পরিণত হইল। অবলা তখন সেই বিভীষিকাময়ী ভীমা প্রকৃতির বুকে পা দিয়া দাঁড়াইল—উর্দ্ধে নক্ষত্র সকলের দিকে চাহিয়া, হৃদয়ের শক্তিতে যেন তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ভাবিল "আমার তো স্বামী আছে আমার কিসের ভয়"।

তখন সেই কালরাত্রির ভীষণতা চলিয়া গেল—রাত্রি যেন অবলার সখীর ন্যায় কাছে দাঁড়াইয়া থাকিল।

যেমন কাল কোমল মেঘে বিদ্যুৎ ছুটিয়া থাকে, কোমল গভীর সাগরে বাড়বাগ্নি জ্বলিয়া থাকে, সেইরূপ বালিকার কোমল গভীর হৃদয়ে স্বামী-ভাব জাগ্রত হইয়া, বালিকাকে প্রকৃতি-বিজয়িনী শক্তিতে পরিপূর্ণ করিল।

সেই মঙ্গলময় স্বামীভাব-ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া অবলা আপন-হারা হইল। সেই বিভীষিকাময় অন্ধকার, সেই ভয়বিজড়িত আকাশ, সেই যমদূতসম সতত দণ্ডায়মান বৃক্ষ সকল, এখন অবলায় সেই স্বামী-ভাবালোকে যেন আলোকময় হইয়া উঠিল। বালিকা স্বামী-ভাবে আত্মহারা হইয়া একটা মহাতেজে মহাসুখে ডুবিয়া যেন আপনার হৃদয়ের নূতন বলের পরীক্ষা করিতে লাগিল।

মাথার উপরে আকাশে তারা সকল ঝিক্ মিক্ করিতেছে—আঁধারের গায়ে খদ্যোৎ চক্ মক্ করিতেছে—আর বালিকার দুঃখপূর্ণ অন্তরে সুখের এক নূতন জগৎ প্রকাশিত হইতেছে—আর সেই জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে অবলা স্বামী [illegible]ম পাঠ করিতে করিতে প্রেমোন্মাদিনী হইয়া উঠিতেছে।

সেই স্বামী ভাবের ভিতর দিয়া কত তেজ, কত আশা, কত স্নেহ প্রবাবিত হইতে লাগিল;—তাহাতে বালিকার অস্তিত্ব প্লাবিত হইল। তখন বালিকা স্বামীর মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল—আকৃতি মনে আসিল না—তখন বিস্মৃতির বুক ভাঙ্গিয়া সে আকৃতি দেখিবার জন্য অবলা পাগলিনী হইল। তখন হঠাৎ একখানি ছবির কথা মনে পড়িল। হৃদয় দর্পণে সেই ছবির

ছায়া পড়িবামাত্র অবলা প্রেমবিগলিত হইয়া অশ্রুমোচন করিল। এ কান্নার দুঃখ নাই কেবল সুখ, কেবল আশা। সে অশ্রু, সতীত্ব—আকাশের শিশির-বিন্দু।

বার বৎসরের বালিকা কার ছবি হৃদয়ে দেখিয়াছে? কোন ছবির বিষয় ভাবিতেছে? বালিকা বয়সে এত ছবির ভাবনা কেন? প্রেমের নিঃশ্বাস কেন? প্রণয়ের স্ফূর্ত্তি কেন? ছবি অচেতন পদার্থ! তার বল নাই যে অবলাকে বিপদে রক্ষা করিবে। তার কথা নাই যে অবলাকে শোকে প্রবোধ দিবে। তার হৃদয় নাই যে অবলার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হবে। ভ্রমর যেমন চিত্রের পদ্মে ভুলিয়া থাকে অবলাও চিত্রের মুর্ত্তিতে সেইরূপ ভুলিয়া রহিল।

সেই মূর্ত্তির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মূর্ত্তিটি দেখিতে ইচ্ছা হইল। ছবি ঘরের ভিতরে আছে—আর ভয় থাকিল না। যে ঘরে যাইতে এত ভয় হইতেছিল, সে ঘরে ছবি আছে—সে ঘরে আনন্দের মূর্ত্তি আছে—সুখের পদ্ম ফুটিয়া আছে। ঘরে অবলা সাহস করিয়া প্রবেশ করিল। গিয়া খুঁজিয়া দেসলাই বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিল। বালিকার সে বিবর্ণ মুখে একটু যেন সুখের রেখা দেখা দিয়াছে—ঠোঁটে প্রেমের রক্তিমবর্ণ প্রকাশিত—দুটি গাল একটু রক্তাক্ত হইয়াছে। সমস্ত দিন আহার করে নাই—কত কাঁদিয়াছে—কত মাথা খুঁড়িয়াছে—শরীর অবসন্ন হইয়াছে, হঠাৎ প্রেমমদে বলবান্—প্রেমালোকে আলোকিত—আশার কুহকে বিহ্বল।

মার বাক্স মধ্যে ছবিটি আছে। চাবি লইয়া বাক্সটি খুলিতে গিয়া [illegible] কত কাঁপিল। মা বলিয়াছিল এ বাক্সটি

তুই যখন শ্বশুর বাড়ি যাবি তখন দেব—এটী তোরই। সেই কথা অবলার মনে পড়িল। প্রেম চখের জল শুকাইয়া দিল—মন-প্রাণকে আবার উন্মত্ত করিল। অবলা চাবি খুলিয়া ছবি বাহির করিল। ঘরে কেহ নাই—বাহিরে কেহ নাই—গ্রামে কেহ নাই—সব নির্জ্জন—সব নিস্তব্ধ। বালিকা ছবিতে মূর্ত্তিটি দেখিবামাত্র শোকপীড়িত বক্ষ কাঁপাইয়া সুখের একটি গভীর ভারি ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অবলার চক্ষু দিয়া সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল। বালিকা, মূর্ত্তি দেখিয়া পাগলিনী হইল। বালিকা সেই ছবিকেই জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিল।

সেই ছবিতে যেন কত সুখ, কত আশা, কত ভরসা। তার ভিতরে যেন কত গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য-সমষ্টি—কত সহস্র পদ্মের সুশীতল গন্ধ বিরাজিত। যেন কত হীরকের খানি তার ভিতরে। কত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সব তার ভিতরে। সে ছবি যেন মানুষের লিখিত নহে, যেন স্বর্গ হইতে, যেন কোথা হইতে অবলাকে সুখে ভাসাইবার জন্য, শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, দুঃখের অশ্রুবিন্দু মুছাইবার জন্য, প্রেমোচ্ছ্বাসে হৃদয় প্রাণকে উন্মত্ত করিবার জন্য আসিয়াছে। সে ছবি দেখিয়া বালিকা সব ভুলিয়া গেল—যেন কিছু বিপদে পড়ে নাই, যেন বিপদ বিপদই নহে।

অবলা বিছনা করিয়া শয়ন করিল। বুকের উপরে ছবিখানিকে রাখিল। শয়ন করিয়া আবার উঠিল। ঘুম আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ আর অবলা ঘুমকে আদর করিতেছে না। বালিকা প্রদীপের আলোকে ছবি রাখিয়া হৃদয়ের সমস্ত

শক্তির সহিত দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই ছবিতে আপনাকে হারাইয়া জগৎ ভুলিতে থাকিল। ভুলিতে ভুলিতে সেই ছবির উপরেই কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতে পারিল না।

রজনী প্রভাত হইল। বালিকা উঠিল। উঠিয়া ছবিখানিকে অতি যত্নে আবার বাক্সের ভিতর রাখিতে যাইল। অনিচ্ছায় বাক্সের ভিতরে রাখিল। রাখিয়া অনিমেশ নয়নে আপনাকে সেই ছবিতে আহুতি দিয়া, চোখ মুখ লাল করিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স বন্ধ করিল। তারপর জীবন রক্ষার জন্য আহারের আয়োজন করিতে থাকিল।

আহারের যোগাড় করিতে করিতে অবলা ভাবিতেছে ;—"একলাই এবাড়ীতে থাকিব। ভয়? কিসের ভয়? যার স্বামী আছে তার আবার ভয় কি? আমি যাঁর ছবি পেয়েছি, তাঁর নাম করিয়া, তাঁর কথা ভাবিয়া, এই বাটীতে সুখে থাকিতে পারিব। তিনি কি আর এখানে আসিবেন না? আসিবেন এক দিন! আসিয়া সব দুরবস্থা দেখিবেন"। অমনি অবলার চক্ষে জল পড়িল—হৃদয়ে সাহসের তেজ জ্বলিল—অবলা স্বামীভাবে বিভোর হইল! আবার ভাবিল "আমি তাঁকে রাঁধিয়া দেব। তাঁর সঙ্গে তাঁর কাছে যাব"! বালিকা এইরূপ যখন ভাবে তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। ভাল লাগে কেবল সেই ছবি দেখিতে, সেই ছবি দেখিয়া পৃথিবীময় ছবি আঁকিতে—আকাশের গায়ে সেইরূপ অসংখ্য ছবি ঝুলাইতে।

অবলা অনেক কষ্টে অন্যমনা হইয়া রন্ধন শেষ করিয়া আহার করিল।

তার পর আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া বাক্স হইতে ছবি বাহির করিল। সম্মুখে ছবি রাখিয়া বসিল। একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে প্রেমোন্মাদে উন্মাদিনী হইতে লাগিল। অবলার ঘরে আলতা ছিল। অবলা আলতা গুলিয়া সেই ছবি দেখিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল। ছবি আঁকে আর আকাশে চায়—আকাশে দেখে সেই ছবি। ছবি আঁকে আর গাছ পালার দিকে তাকায়—দেখে গাছ পালায় কে সেই ছবি ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। অবলা চক্ষু মুদে—দেখে আপনার ভিতর সেই ছবি আনন্দে হাসিয়া অবলাকে সোহাগ করিতেছে।

কিন্তু বালিকার দুঃখ শোকের জ্বালা একবারে যাইতেছে না। ছবিটি লইয়া যতক্ষণ অন্যমনে থাকে ততক্ষণই প্রকৃত স্বর্গ সুখে থাকে। তার পর আবার সেই সব মনে পড়ে আর ভয়ে কাঁপিতে থাকে। সহিতে সহিতে সকলি সহিয়া যায়। দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে হৃদয়ে বল বাড়ে। অবলার ক্রমে হৃদয় শক্ত হইতে লাগিল; একলা সেই বাড়িতে থাকিবে স্থির করিল। ঘরের চাল, নুন, তেল যতদিন থাকিবে ততদিন আর কোথাও যাইবে না স্থির করিল। তবে যখন সব ফুরাইবে তখন অন্য কোন গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রাঁধিয়া খাইবে। সে বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইল না এইজন্য যে, যদি স্বামী আসে। যদি অন্যত্র চলিয়া যাই তো স্বামী আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্থির করিবে সবই মরিয়াছে। যদি স্বামী আবার বিবাহ করে—যদি আর না দেখা হয়। স্বামীকে দেখিবার আশায় হৃদয়ে সাহসের বজ্র বাঁধিয়া সেই

নির্জ্জন পুরীতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা সাহসী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে লাগিল।

মার মৃত্যুর পর ৪র্থ রাত্রে বালিকা ছবিখানিকে বক্ষে রাখিয়া নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে :—

"যেন বক্ষে স্বামী আসিয়া শুইয়া আছে! কত আদরের সহিত মুখ-চুম্বন করিতে করিতে গল্প বলিতেছে। অবলা উঠিয়া গিয়া স্বামীর জন্য জলখাবার সাজাইতেছে, পানের খিলি করিতেছে। স্বামী যেন খাইতে খাইতে অবলাকে খাওয়া-ইতেছে। অবলার মা যেন আড়াল হইতে দেখিতে পাইয়া মুচকিয়া হাসিতেছে। পাড়ার বউ ঝিরা যেন আসিল; আসিয়া অবলাকে কোলে লইয়া স্বামীর কোলে বসাইয়া দিল। রাত্রি হইল, অবলা যেন স্বামীর কাছে গিয়া শয়ন করিল। স্বামী যেন গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছে। অবলাকে কোলে লইয়া বই পড়াইতেছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আড়ি পাতিয়া সব দেখিতে দেখিতে হাসিয়া ঢলাঢলি করিতেছে।

এইরূপে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সুখের তরঙ্গে ভাসিতেছে, এমন সময়ে বাহির দরজায় ভয়ানক শব্দ হইল। শব্দ হইল— দম্ দম্ দম্।

সেই শব্দে অবলার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া অন্য ভাব ধারণ করিল। অবলা আবার যেন স্বপ্নে শুনিতেছে বাটীর বাহিরে কে যেন বন্দুক ছুড়িল দুম্ দুম্ দুম্। আবার বাহিরে শব্দ হইল, 'তারা রা রা রা'। বালিকা স্বপ্নে শুনিল 'তারা তারা তারা ও তারা— বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া গেল 'মড় মড় মড়াৎ'। বালিকা স্বপ্নে

শুনিল 'মড়া মড়া মড়া'। যেন স্বামী আর নিকটে নাই যেন অবলা এক শ্মশানে ডাকাতের দলে পড়িয়াছে। ডাকাতেরা অবলাকে কাটিবার জন্য তরবার তুলিয়াছে—অবলা চক্ষু চাহিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না, কে যেন চক্ষু বাঁধিয়াছে।

ক্রমে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া গেল 'মড় মড় মড়াৎ'। বালিকার তবুও তন্দ্রা ভাঙ্গিল না। বালিকা স্বপ্নে দেখিতেছে যেন শ্মশান হইতে আসিয়া ঘরে শুইয়াছে—সেই সব ডাকাত ঘরে প্রবেশ করিয়া টাকা চুরি করিতেছে।

ঘরের ভিতরে কে একজন বলিল, আরে বিছানায় শুয়ে যে বড় সুন্দরী; বলিবামাত্র আর একজন বালিকার হাত ধরিয়া তুলিল, অমনি বালিকা চক্ষু খুলিয়া দেখিল ঘরে মশাল জ্বলিতেছে—সম্মুখে যমদূতের মত কাহারা দাঁড়াইয়া আছে—একজন সিন্দুক ভাঙ্গিতেছে। বালিকা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিতা হইল ; ডাকাতের দল বাড়ি লুট করিল, গহনা টাকা যা ছিল সব চুরি করিল। পরে বালিকার মুখ বাঁধিল—হাত পা বাঁধিল। একজন বলিল বেশ রূপসী রে! লয়ে যাই [illegible]। এই বলিয়া সে বালিকাকে বগলে করিয়া লইয়া গেল। বালিকা এতক্ষণ মূর্চ্ছিতা ছিল।

ডাকাতের দল গাঁ পার হইয়া দ্রুতবেগে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল, বালিকাকে মাঠের উপর দড়াম করিয়া ফেলিয়া দিল—বালিকাকে গুরুতর আঘাত লাগিল—সেই আঘাতে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

বালিকা চক্ষু চাহিয়া দেখিল—চারি দিকে অন্ধকার; আকাশ

মেঘে ঢাকা, বৃষ্টি পড়িতেছে। মশালের আলো আর নাই। রাত্রি শাঁ শাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চক্ মক্ করিয়া নিমিষের মধ্যে সমস্ত জগৎ আলোকিত করিয়া আবার অন্ধকার নিবিড়তর করিতেছে। অবলা—বিদ্যুতালোকে যমদূতের ন্যায় দস্যুদিগকে দেখিবামাত্র আবার ভয়ে আড়ষ্ট হইল—দুচক্ষু মুদিয়া আপনার প্রকৃতির ভিতর যেন লুকাইবার চেষ্টা করিল। বালিকা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ভাবিল—"আর বাঁচিব না, জীবন ফুরাইল, মা! বাবা! দাদা! তোমরা এইবার এস! আমি তোমাদের কাছে যাই!" ভাবিতে ভাবিতে একবার ছবিখানার জন্য উন্মাদিনী হইল—সে ভাবে অভিভূতা হইয়া নিস্পদ হইয়া পড়িয়া থাকিল।

দস্যুগণ সেই সময়ে লুণ্ঠনদ্রব্য ভাগ করিতে ছিল। সব ভাগ হইবার পর একজন বলিল "এখন এ মালটা কে নেবে?"

অন্য একজন বলিল—"কেটে ভাগ করতে হবে"।

কথাটা শুনিবা মাত্র অবলা একবারে মূর্চ্ছিতা হইল।

একজন দস্যু বলিল "নিয়ে আয় বাবা! অনেক দিন মানুষ কাটিনি, আজ কচি মানুষটা এক কোপে কাটি"।

ডাকাতদের নেতা বৃদ্ধ। তার মেয়েটীর রূপ দেখিয়া একটু দয়া হইয়াছিল। সে বলিল "না না মেরে কাজ নাই। যেমন আছে পড়ে থাক, আমরা চলে যাই চ"।

নিবিড় আঁধারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু পাকা ডাকাতদের অনুভূতি অতিশয় প্রবল। অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। একজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত বৃদ্ধের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—"না তা হবে না ওকে কাটি"।

বলিয়া শাণিত তরবার ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিদ্যুতালোকে অবলার গলা লক্ষ্য করিয়া মারিল। তরবার লাগিবামাত্র শোণিত-ধারা সতেজে বহির্গত হইল। এবং তৎক্ষণাৎ "বাপরে!" বলিয়া এক মৃত্যু যন্ত্রণা পরিপূরিত বিকট শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। সেই শব্দের সহিত প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দস্যুগণ প্রস্থান করিল। বিদ্যুৎ আকাশে ঝক্‌মক্ করিতে থাকিল। আকাশ বজ্রনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃষ্টির তেজ বাড়িতে লাগিল—মাঠে বৃষ্টি জলের স্রোত বহিতেছে,—প্রকৃতি গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়াথাকিল। প্রকৃতি সেই ভীষণ হত্যার শোণিত ধৌত করিবার জন্যই যেন অজস্র বারি বর্ষণ করিল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। এমন সময়ে একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ একটী ভৃত্য সমভিব্যাহারে সেই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঠে নামিয়া দেখিল, এক মৃতদেহ। মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িয়া আছে। মৃত দেহের নিকটে একটী অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না বালিকা—নড়ন চড়ন নাই। মরিয়া গিয়াছে। গায় রক্ত লাগিয়াছে।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বালিকার কাছে আসিয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। দেখিল বালিকার বক্ষঃদেশ নিঃশ্বাসে কাঁপিতেছে। নাসিকার নিকটে হাত রাখিয়া দেখিল নিঃশ্বাস বহিতেছে—প্রাণবায়ু এখনও বাহির হয় নাই, কিন্তু মৃত্যু নিকটস্থ।

প্রথমতঃ তেমন রূপরাশি ভদ্রলোক কখন দেখে নাই। শরীর শীর্ণ কিন্তু রূপের অপূর্ব্ব মাধুরী। দন্তপংক্তি ঈষৎ প্রকাশিত—ধুলা লাগিয়াছে, তথাপি তার কাছে মুক্তা হার মানিতেছে। একখানি কাদামাখান সাড়ি পরিধান, কিন্তু সে রূপরাশি—সে স্নিগ্ধ সুশীতল রূপের কিরণ—সে বিধাতার অপরূপ গঠন—সে মধুর

ভাব—কিছুতেই ঢাকিতে পারিতেছে না। ভদ্রলোক দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—জড়িত স্বরে ভৃত্যকে বলিল, হেথা আয়। একটু জল ল'য়ে আয়। চাকরটী সেই খুন করা মড়া দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, বলিল, না মশাই আমরা পালাই চলুন;—দেখ্‌চেন না, কে খুন ক'রে গেছে। শেষে কি আমরা আবার খুনের দায়ে পড়ব!

মনিব বলিল 'নারে না ভয় নাই,—যা বলি শোন্'।

চাকর বলিল "কি বলুন।" ভদ্রলোক বলিল 'এ মেয়েটীকে কোলে ক'রে ল'য়ে বোস দেখি'। চাকর বলিল 'না মশাই ওটা মড়া—আমি তা পারবো না।'

মনিব একটু বিরক্তভাবে বলিল 'মড়া নয়—ধর, কোলে ক'রে ধর'।

চাকর অগত্যা মেয়েটীকে কোলে করিয়া বসিল।

ভদ্রলোক বালিকার চ'খে জলের ঝাপট এবং মুখের ভিতর ফুঁ দিতে লাগিল। দিতে দিতে 'মা মা মা' এই অস্ফুট কাতর ক্ষীণস্বরে বালিকা নড়িয়া উঠিল।

ভদ্রলোক কাপড় দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। বালিকা চক্ষু চাহিল। দেখিল কার ক্রোড়ে শুইয়া আছে। মা যে মরিয়াছে, মনের বিকৃত অবস্থায় স্মরণ ছিল না, তাই বলিল, 'মা ওমা! আমার বড় জিব্ শুকিয়ে গেছে'। ভদ্রলোক পুকুর হইতে জল আনাইয়া মুখে দিল। বালিকা জল খাইয়া একটু বল পাইল। বল পাইয়া পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিল 'মা নহে অন্য একজন মানুষ, আর একজন জামাজোড়া পরা কে। বালিকার দুটী চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ভদ্রলোকও কাঁদিয়া ফেলিল। পরে ভদ্রলোক বলিল কেন বাছা তুমি অত কাঁদছ?

বালিকা অল্প হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভদ্রলোক কাপড় দিয়া বালিকাকে খুব বাতাস করিতে লাগিল। বাতাস করিতে করিতে বালিকার ঘুম আসিল দেখিয়া ভদ্রলোক ভৃত্যকে বলিল, তুমি ওকে বুকে ক'রে আস্তে আস্তে ল'য়ে চল;— এ দেশে মড়কে সব ম'রেছে—চল আমাদের বাটীতে ল'য়েচল'।

ভৃত্য বালিকাকে বক্ষে তুলিয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। এক মাইল যাইবার পর, বালিকা চক্ষু চাহিয়া দেখিল, কার বুকে রহিয়াছে। ভাবিল ডাকাতে আমাকে লইয়া যাইতেছে—তখন বালিকা ভয়ে আড়ষ্টভাবে চক্ষু মুদিল দুচক্ষু বাহিয়া মৃত্যুচিন্তাজনিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া সেই ভৃত্যের অঙ্গ স্পর্শ করিল। ভৃত্য বুঝিতে পারিয়া বলিল, বাবু মেয়েটী বুঝি কাঁদছে।

ভদ্রলোকটীর মেয়েটীর প্রতি কেমন একটু দয়া জন্মিয়াছে; তাই সকরুণ বচনে বলিল 'কেন বাছা কাঁদ, এস আমার কোলে এস।

বালিকা চাহিয়া দেখিল। ভাবিল, এরা কারা? আমায় কোথায় লইয়া যাচ্ছে—আমার সে ছবি কোথা? ভাবিয়া পেট-কাপড়ে হাতে দিয়া দেখিল ছবি নাই! বালিকার প্রাণে প্রাণ থাকিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকা আস্তে আস্তে সকাতর স্বরে বলিল 'হাঁগা! তোমরা আমায় কি মেরে ফেলবে! বলিয়াই বালিকা অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। শুনিয়া ভদ্রলোক বলিল 'না বাছা' তোমার কিছু ভয় নাই। তুমি কিছু খাবে? বালিকা কিছু বলিল না; ছবির জন্য আকুল হইল।

ভদ্রব্যক্তি মেয়েটীকে কোলে করিয়া আপনার বাটীতে উপ-

স্থিত হইলে, মেয়েটির কম্প দিয়া জ্বর আসিল। বাটীতে ভদ্রলোকের এক বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী—আর কেহ নাই। মেটে ঘর দুখানি ও একখানি রান্না ঘর। বাটীতে গিয়া দেখিল কেহ নাই। তখন অপরাহ্ন। বেলা প্রায় ৫টা। ঘরে উঠিয়া দেখিল দ্বার ভেজান আছে। দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানায় পীড়িতা বালিকাকে শয়ন করাইয়া ঘরের দ্বারে শিকল দিয়া ডাক্তার আনিতে গেল।

বালিকাটী জ্বরে কাঁপিতেছে আর শব্দ হইতেছে উহু—হুহু উহু—আ—আ গেনু। ভদ্রলোকের স্ত্রী কাপড় কাচিয়া আসিয়া বড় ঘরের দ্বারে উঠিয়া দেখিল, ঘরে শীকল দেওয়া; দেখিয়া ভয় হইল। কে আসিয়া শিকল দিল। বউটীর বড় ভূতের ভয়। একবার ভূতেও পাইয়াছিল। ঘরের দরজার শিকল খুলিতে যাইবামাত্র শুনিতে পাইল ঘরের ভিতরে শব্দ হইতেছে—'উহু—হুহুহু'। বউটী অমনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়িয়া উঠানে নামিয়া আসিল। দেখিল শাশুড়ি আসিতেছে; দেখিয়া কাছে গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চুপে চুপে বলিল, মা সর্ব্বনাশ বড় ঘরে ভূত। বৃদ্ধা চমকিত হইয়া বলিল, 'অ্যা! বলিসকিরে! ওমা সে কি গো!!

বউটীর কাঁপুনি আরও বাড়িল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল 'মা চল আস্তে আস্তে ওদের বাড়ী যাই। কাছে ঘোষেদের বাড়ী ছিল; সেখানে শাশুড়ী বউ এ গিয়া সকলকে বলিল 'অমাদের বড় ঘরে ভূত'। ঘোষের বাড়ীতে একটী যুবা ছিল। সে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পড়ে। সে অমনি হাসিয়া বলিল 'দূর দূর ভূত নাই, তোমাদের সব মিথ্যা কথা'।

বৃদ্ধা বলিল 'আচ্ছা চল দেখি কেমন নাই'। যুবক অমনি

বলিল 'আচ্ছা চল আমি যাই' বলিয়া একগাছি ছড়ি লইয়া যাইতে উদ্যত। এমন সময়ে তার মা আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল "আর অততে কাজ নাই—শেষকালে কি প্রাণটা হারাবি"।

যুবা কিছুতেই মানিল না, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদের বাটীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। যুবা দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে "যদি বাবা কিছু হয়—অনেক সাহেবও ভূত মানে"। ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে কম্পিত হইতেছে এমন সময়ে বৃদ্ধা বউ ও যুবার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবা উহাদিগকে দেখিয়া ভাবিল 'এদের কাছে অপ্রস্তুত হ'লে চলিবে না"। এই ভাবিয়া জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কো কোন ঘরে"। বৃদ্ধা কথা কহিতে সাহস করিল না; আঙ্গুলি দ্বারা ঘর দেখাইয়া দিল। যুবা থর থর কাঁপিতেছে—গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে—মুখের আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঘরের দ্বারে উঠিয়াই শুনিল শব্দ হইতেছে "উহু হু হু হু, উহু হু হু, হুহু হু হু"। শুনিবামাত্র "ওরে বাবারে" বলিয়া চীৎকার করিয়া লম্ফ দিতে দিতে বাটীর বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল। বধূটী সেই শব্দে 'অজ্ঞানবৎ পড়িয়া গেল; আর দুই জনে "বাবাগো" বলিয়া প্রস্থান দিল। শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বধূকে না দেখিতে পাইয়া আবার বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বধূর চেতনা করাইয়া সঙ্গে লইয়া ঘোষেদের বাটীতে গেল। বধূটী ঘোষেদের বাটীতে বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—শাশুড়িরও বুক দুড় দুড় করিতেছে। যুবার প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। যুবাকে মা জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখিলি"। যুবা বলিল "ঘরে কে গোঁ গোঁ করছে আর বোটকা গন্ধ বেরিয়েছে—আর ঘরের ভিতরে কে খোঁনা খোঁনা কথা ক'চ্ছে। আমার বোধ হয়, যেন ভূত। বধূটী, যুবা ও যুবার

মার কাছে গিয়া বসিল। ভয়ে বধূর আর যুবার কাছে বসিতে লজ্জা নাই। বৃদ্ধা বলিতেছে "আর ও বাড়ীতে যাবে না, আমার ছেলেকে বাবা একখানা বুঝিয়ে চিঠি লেখ আমরা অন্ত কোথাও গিয়ে থাক্‌বো"।

যুবা বলিতেছে "আমি ভূতে বিশ্বাস ক'র্‌তাম না; কিন্তু আজ হতে ক'র্‌তে হলো। বাবা! ভূত আবার নাই—আমাদের কলেজের সাহেবদের একবার এনে দেখাব"।

যুবার মা জিজ্ঞাসা করিল "হ্যারে সাহেবেরা কি ভূত মানে না"। বৃদ্ধা বলিল "ওগো সাহেবেরা ভূত মানে, তবে ভয় করে না। শুনেছি নাকি ভূতে সাহেব দেখিলে পালিয়ে যায়"।

অনেক সাহেবের গায়ের গন্ধে ভূত পলায় যথার্থ বটে।

বউটী বলিতেছে সাহেবরা ইংরাজীতে কথা কয়, ভূত তা বুঝতে পারে না—তাই পালায়"।

পেটের দায়ে ইংরাজী শিখিতে হয় বটে, কিন্তু ভাষাটা ভূতের ভাষাই বটে।

যুবা বলিল, তা নয় সাহেবরা ভূত মানে। তোমরা ব'স আমি একখানা ইংরাজী বই হ'তে ভূতের বিষয় পড়ি। বলিয়া যুবা হ্যামলেট আনিয়া পড়িতে লাগিল ও বাঙ্গালায় অর্থ বলিতে থাকিল।

স্ত্রীলোক গুলি কথাটী শুনিতে শুনিতে ঠেসাঠেসি করিয়া এর কনুই কনুইতে রাখিয়া হাঁটুতে হাঁটু রাখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভদ্রলোক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে উপস্থিত হইলেন। দখিলেন ডাক্তার মহাশয় চেয়ারে বসিয়া চক্ষু দুটী মুদিয়া কি চাবিতেছেন—যেন ডাক্তারের আত্মা ভাবিতে ভাবিতে পৃথিবী াড়িয়া কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। ডাক্তারের কাছে আর াকটী বাবু বসিয়াছিল। ভদ্রলোককে দেখিয়া প্রণাম করিয়া লিল, আসুন বাঁড়ুজ্যে মশাই আসুন। বাঁড়ুজ্যে মহাশয় বসিলন। বসিয়া ডাক্তারকে ডাকিতেছেন "ডাক্তার মশাই"! ডাক্তার শাই শুনিয়াও শাড়া দিলেন না। "ডাক্তার মশাই ও ডাক্তার াশাই"! ডাক্তার আরও ভাবনা-সাগরের তলায় তলাইতে লাগিলন। পরিশেষে চক্ষু চাহিয়া বলিতেছেন "অ্যা—অ্যা—কোথা 'তে বায়ুর তরঙ্গ আমার কাণের শিরায় আঘাত করিল—মনে ক কতকগুলি ভাব এসে দাঁড়াল"। বাঁড়ুজ্যে মশাই বলিতেছেন "ডাক্তার মশাই"! ডাক্তার বলিলেন, অ্যা—অ্যা—আপনি ক চাহিতেছেন?

বা। একবার আপনাকে চাই।

ডা। আমায় তুমি চাও—Necessity (নেশেসিটী) ও তাই মামায় চাও, আমি না হলে তোমার চলিবে না?

বা। একবার আমাদের বাটীতে যেতে হবে।

ডা। তোমার নাম কি? অর্থাৎ কি বিশেষ কথায় সকলে তামায় ডাকিয়া থাকে?

বা। সেকি মশাই! আপনি কি আমায় চিনিতে পার্‌ছেন না।

ডা। হাঁ—তোমাতে এমন কতকগুলি চিহ্ন অর্থাৎ Marks (মার্কস) আছে তাহা দ্বারা তোমায় মনুষ্য বলিয়া ডাকিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যের সংখ্যা অনেক। ও, সে, আমি, তুমি এই সব ভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্যই বলিতেছি আপনার বিশেষ নাম কি আর্থাৎ ইংরাজী গ্রামারে যাহাকে বলে Proper name (প্রপার নেম্‌) ;—অমনি হাঁসিয়া বলিতেছেন, এখন আমার কথা বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়।

বাড়ুর্য্যে মহাশয় বলিলেন "হাঁ আমি বুঝিয়াছি আপনি যে বিদ্যার তেজে একবারে যেন পুড়ে গিয়াছেন"।

ডা। আপনার নাম কি?

বা। আপনি কি আমায় ভুলে গেলেন। আমাদের কলি-কাতার বাসায় সেবার যে ১৫ দিন ছিলেন; আমি যে আপনার কত ঔষধ নিজের টাকা দিয়ে কিনে দিলাম। ১০০ টাকা আপনি আমার কাছ হতে ধার নিলেন, আবার এখন কি রকম কথা বলেন।

ডা। হাঁ—হাঁ আমি ১০০ টাকা ধার নিয়েছি এক ভদ্র-লোকের কাছ হ'তে;—সে তোমারই মত। তার চেহারা ঠিক তোমারই মত। কিন্তু চেহারা দুইজনের এক রকমও থাকতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনার নাম কি?

বা। আমার নাম, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডা। বাটী?

বা। এই গ্রামে।

ডা। কোন্‌ হরিদাস?

বা। যার কাছ হ'তে কলিকাতায় টাকা ধার লইয়াছেন।

ডা। তাইতো মহা মুস্কিলে ফেল্লে—তুমিই যে সেই—হরিদাস তার তো প্রামাণ কিছুই পাচ্ছি না। মহা বিপদেই প'ড়লাম—কার টাকা বা কাকে দিয়ে ফেলি।

বলিয়া ডাক্তার মহাশয় একখানি বৃহৎ ফিলজফি লইয়া উল্টা-ইতে বসিলেন। হরিদাস বিরক্ত হইয়া বলিল "মশাই"—কি দেখছেন—আগে দেখবেন চলুন। তারপর বই খুলে ঔষধের বন্দোবস্ত ক'রবেন।

ডাক্তার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, হো—হো—আমি ঔষধ টৌষধ কিছু দেখছি না—তবে কিনা তুমি যে সেই হরিদাস এ সম্বন্ধের প্রমাণ ফিলজফিতে কি প্রকার আছে, তাহাই দেখি-তেছি! তুমি যে টাকার কথা কয়ে মহা বিভ্রাটে ফেল্লে হে!

হরিদাস ভাবিতেছে—"ব্যাটা বা ফাঁকি দেয়, মহা বিপদে ফেল্লে।"

ডাক্তারের নিকট যে আর একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিল, সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। বলিল, জ্বলালেন যে! এই রকমেই তো পসারটা মাটি কর্‌লেন। কি পাগলের মত ভাবেন, তার ঠিক নাই—এক বদ্ধ পাগল এসে জুটেছেরে বাবা। ডাক্তার মহা-শয় পুস্তক রাখিয়া বলিলেন, আচ্ছা চল তোমাদের বাটীতে যাই।"

পোষাক পরিয়া ছড়ি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন "হঁা চল, সূর্য্যটা ডুবু ডুবু হয়েছে, আর বড় ভয় নাই"।

হরিদাস। কিসের ভয়?

ডা। ভয় সর্ব্বদাই আছে হে! দুপুরবেলা যখন সূর্য্যটা ঠিক মাথার উপরে আসে, তখনি যেয়াদা ভয়ের কারণ। কি জানি যদিই বা মাথায় দম করিয়া পড়িয়া যায়।

হরিদাস আর হাসি রাখিতে পারিল না, "এ মহা পাগল একে দিয়ে রোগী দেখান তো দায়" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিল। ডাক্তার মহাশয় হাসিটা শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল, হাসিলে কেন?

হ। আপনি কি মাথা মুণ্ডু বকেন তাই।

ডা তুমি বিজ্ঞানশাস্ত্র বোধ হয় তত পড় নাই। অনেক গ্রহ মধ্যে মধ্যে কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে। সূর্য্যটা যে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে পারে, তার আর সন্দেহ কি?

হ। যদি পড়ে তো আপনি ঘরের ভিতর থাকিলেও ঘরে পড়িবে। আপনি বাহিরে থাকিলেও যে বিপদ ঘরে থাকিলেও সেই বিপদ।

ডা। তা তো জানি, কি জান যদি সূর্য্যের খানিকটা ভেঙ্গেই বা মাথায় পড়ে। তবে কি জান যত সাবধান হওয়া যায়, ততই ভাল।

ডাক্তার মহাশয় আবার কি ভাবিতে ভাবিতে হরিদাসের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে মনে ঠিক নাই। রাস্তার ধারে একটী সান বাঁধান পুকুর। সেই পুকুরের দিকেই যাইতেছেন—ঘাটে গিয়া সিঁড়ি দিয়া জলের দিকেই নামিতেছেন—নামিতে নামিতে পা পিছলিয়া দড়াম করিয়া জলে পড়িবামাত্র "আরে কোথা এসেছি হে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হরিদাস পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, ডাক্তার নাই।

পেছুতে আসিয়া দেখেন, ডাক্তার পুকুরের জল হইতে আস্তে আস্তে উঠিতেছেন। হরিদাস রাগিয়া উঠিল। কিছু বলিতে পারিল না। ডাক্তার বলিতেছে, "তুমি রাগ কর্‌ছ বুঝি।" ও রকম আমার রোজই হয়—ভাব্‌ছিলাম সূর্য্যটা যদি পড়িয়া যায়—আবার কত নক্ষত্র মাথার উপরে রহিয়াছে ; সব পড়িলে তো মহা বিপদ—এ পৃথিবীতে বাস করাই দায়" এইটে ভাবিতে ভাবিতে জলে পড়ে গেছি হে !

হরিদাস এবারে ডাক্তারের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। ডাক্তার আবার কি ভাবিতেছে—ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছে, এমন অবস্থায় পায়ে মহা হোচট লাগিল। হরিদাস চাহিয়া দেখিল ফিলজফার হোচট খাইয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

তারপর হরিদাসের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া হরিদাস বাবু বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিল, সন্ধ্যা অতীত, তথাপি বাড়ীতে কেহ নাই। দেখিয়া মহা বিরক্ত হইল। বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, "মহাশয় একটু দাঁড়ান আমি আসছি।" ঘোষেদের বাটীতে হরিদাস যাইবামাত্র বৃদ্ধা বলিতেছে, 'এই যে আমার হরি এসেছে ! আয় বাবা আয় ! বাড়ীতে কি আছে জানিস ? হরিদাস রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা এখন সব বাড়ী চল—সন্ধ্যা হয়েছে কখন, ভিটেতে এখনও সন্ধ্যা জ্বাল নি, যত বেল্লিক জুটে সর্ব্বনাশ কর্‌লে' '।

যুবা বলিতেছে "না হরিদাস বাবু ! আমি স্বচক্ষে দেখেছি আপনাদের বড় ঘরে ভূত হুঁ হুঁ হুঁ করছে"। হরিদাস হাসিয়া বলিল, "সে যে মানুষ—জ্বর হয়েছে তার—তাকে ঘরে শুইয়ে রেখে ডাক্তার ডাক্‌তে গেছলাম। ডাক্তার মশাই বাহিরে দাঁড়ায়ে

কষ্ট পাচ্ছেন। শুনিয়া সকলে অবাক হইল। বৃদ্ধা বধূ হরিদাসের সঙ্গে বাটীতে যাইয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া দেখিল বিছানায় যেন পদ্মফুল ফুটিয়াছে—একটী বালিকা জ্বরে কাঁপিতেছে।

ডাক্তার রোগীর হাত দেখিয়া ঔষধের প্রেসক্রিপসন লিখিতেছেন। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলেন?

ডাক্তার বলিল, "তোমার কথার অর্থ কি ভাল করিয়া বল।"

হ। ভাল না মন্দ দেখ্‌লেন?

ডা। বড় শক্ত প্রশ্ন করেছ? রোস ভাবি, তাপর ব'লবো'। চক্ষু মুদিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন 'ভাল মন্দ ওটা তুলনার কথা—আমি যেটাকে ভাল বলি তুমি হয়তো মন্দ বল—আবার যেটাকে এখন ভাল বলিলাম সেটা আর একটার সহিত তুলনায় মন্দ। আমি যে তোমার কথায় কি উত্তর দেব ঠিক কর্‌তে পারছি না'।

হরিদাস হাসিয়া বলিল, 'বলি ঔষধ খেলে উপকার তো হবে'?

ডা। উপকার হবে কি না? তুমি যে মহামুস্কিলে পাড়লে হে বাপু! উপকার নানা অবস্থায় নানা ভাবে পাওয়া যায়। মরণে অনেকের উপকার ও জীবনে অনেকের উপকার। আবার মরণে যেমন উপকার তেমনি অপকারও আছে।

হ। মরণে উপকার কি রকম মশাই—আপনি কি পাগলের মত বক্‌ছেন।

ডা। হাঁ হাঁ পাগল তো বলবেই। তবে একটী দৃষ্টান্ত দি শুনঃ—একজন সমুদ্রের জলে পড়েছে তাকে উদ্ধার করবার কে— নাই,—তাকে যদি বরাবর সেই জলের ভিতর থাকিয়া কষ্ট ভু—

হয় তো কি ভয়ানক ব্যাপার বল দেখি; এ অবস্থায় মরণে উপকার কি নাই?

হ। হাঁ—আছে। এখন জিজ্ঞাসা করি এ বালিকাটি বাঁচবে তো?

ডা। তুমি যে আবার বিপদে ফেল্লে দেখছি। মরণ বাঁচন এযে মহা প্রশ্ন! প্লেটো এ সম্বন্ধে কি বলেছেন শুন Who knows whether that which is called living be not indeed rather dying, and that which is called dying, living? এর অর্থ এই যে, যাহাকে জীবন বলিতেছ হয়তো তাহাই মৃত্যু আবার যাহাকে মরণ বলিতেছ তাহা হয়তো জীবন। তাই বলিতেছি তুমি যে সব প্রশ্ন করছ বড় বড় পণ্ডিতেরা তার মীমাংসা করতে পারেন নাই। এখন তোমার বাঁচবে এই কথার মানে কি?

হরিদাস ভাবিল না একে বিদায় করিয়া দি; আর একজন কাল ভাল ডাক্তার আন্‌বো। এই ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা আপনি এখন চলুন।

ডাক্তার বলিল 'আমি যাব না আমার দেহ যাবে হে'।

হরিদাস বলিল 'আচ্ছা তাই দেহ চলুক'।

ডা। তুমি তা হলে আমার সঙ্গে যাচ্ছনা?

হ। না—আপনি যান না। বরাবর পূর্ব্বদিকের বড় রাস্তা দিয়ে গেলেই আপনার ডিস্পেন্সারী পঁহুছিবেন।

একটু রাত্রি হইয়াছে—পশ্চিমে চন্দ্র দেখা দিয়াছে। ফিল-জফার মহাশয় বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পশ্চিমাকাশে চন্দ্র। ভাবিতেছেন পূর্ব্বদিক কেমনে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে

ঘুরিতেছে। চাঁদটা যেদিকে উঠিয়াছে ঐদিকটা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব এই স্থির করিয়া সেইদিকে যাইতে যাইতে দেখিলেন একবারে মাঠ—ডিস্পেন্সারী কোথা তো নাই! ভাবিতেছেন এ কমনে আসিলাম। আবার হরিদাসের বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিতেছেন, ও হরিদাস বাবু—হরিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি মহাশয় এখনও যান নাই!

ডা। আরে যাব কি। একেবারে মাঠে পড়েছিলাম।

হ। বেশ! আপনি কোন দিকে গেছলেন বলুন দেখি?

ডা। কেন ঐ দিকে।

হরি। বেশ বেশ ওযে পশ্চিম দিক। আপনার বয়স ৫০ বৎসর আজও পূর্ব্ব পশ্চিম জ্ঞান হয় নাই। আপনি আর ডাক্তারি করিবেন না।

ডাক্তার ফিলজফর একবারে রাগিয়া বলিলেন, তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি নাই, বিজ্ঞান পড়নিতো, তাই এমন কথা বল্‌ছ। পশ্চিমে কি চাঁদ উঠে? পৃথিবী কোন দিক হ'তে কোন দিকে ঘুর্‌ছে বল দেখি?

হ। কেন পশ্চিম হতে পূর্ব্ব দিকে?

ডা। তা হলে চাঁদটী কোনদিকে উঠিবে।

হ। পূর্ব্বদিকে।

ডা। ঐ দেখ চাঁদ কোন দিকে উঠেছে। প্রত্যক্ষকে যে উড়াতে যাও। তুমি কেমন মূর্খ।

হ। যা'হক আমি মূর্খ; আপনি এই দিক দিয়া যান।

ডা। আচ্ছা তুমি তোমার ছাতাটী এনে দাও; আমার মাথার ব্যারাম আছে; বিজ্ঞানে লেখা আছে মাথার ব্যার

সূর্য্যের আলো মাথায় লাগাইবে না। তোমার ছাতাটা মাথায় দিয়ে যাই; দেখছ না জ্যোৎস্নার আলো বড় হয়েছে।

হ। এখন রাত্রে সূর্য্যের আলো কোথা! বড় পাগল যে আপনি!—চাঁদের আলোকে আপনি সূর্য্যের আলো বল্লেন। আপনিও পণ্ডিত হয়ে প্রত্যক্ষকে উড়াইতেছেন। এখন কে—

ডা। আর কি বলিব বলুন। সূর্য্যের আলো চাঁদে পড়ে—সেই আলো পৃথিবীতে পড়ে। একেই বলে জ্যোৎস্না। তাহলে চাঁদের আলোটী সূর্য্যের আলো হয় না।

হ। আচ্ছা মশাই আপনি দাঁড়ান; আমি ছাতা এনে দিচ্ছি।

হরিদাস ছাতা দিয়া ডাক্তারকে বিদায় করিল। ভাবিল 'এত পড়ে এত মূর্খ তো দেখিনি'।

———o———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

হরিদাসের যত্নে ডাক্তারের ঔষধে অবলা আরোগ্য লাভ করিল। আরাম হইয়া আপনার অবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাতর হইতে লাগিল। কাতরতায় সেই সোণার বর্ণ হীনপ্রভ হইতেছে—মুখের মধুর সরলহাসি একটু একটু শুষ্ক ভাব ধরিতেছে—শতদল তুল্য প্রফুল্ল নয়নদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে মলিন ভাব প্রকাশ করিতেছে।

হরিদাসের মার নাম শ্যামা; স্ত্রীর নাম গোলাপ; দুজনেই অবলাকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে লাগিল। একদিন অবলা বৈকালে উঠানে বসিয়া আকাশের দিকে ভ্রূকুঞ্চনে মলিন নয়নে চাহিয়া আছে; মৃণাল ভুজ দুটীর একটী বাম গণ্ডে রাখিয়া আকাশের গায়ে যেন কি লেখা একমনে পাঠ করিতেছে। একটী একটী করিয়া পাখী আপনার স্বাধীনতার গানে আকাশ প্লাবিত করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া অবলা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া ভাবিল 'হায় যদি পাখী হতাম'। আবার ভাবিল 'তা হলে কি আর ভাবনা থাকতো,' ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত এই কথাটি উচ্চারিত হইল, অমনি দুইটী চক্ষের দুটী তারা দুই বিন্দু জলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বালিকার প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—হৃদয়ে কি এক সাহসের তড়িত-তরঙ্গ উঠিবামাত্র মুখে রক্তিমা প্রকটিত হইল

—শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ ছুটিল। আকাশের নীল পটে এক দিব্য পুরুষের এক অসামান্ত প্রেমময়মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া দেখিল। আবার আপনার হৃদয়ে—আপনার লাবণ্যময় উজ্জল দেহে—পশ্চিম শোভিত রবিবক্ষে—চতুর্দ্দিক শোভিনী বিটপী শ্রেণীতে সে অপূর্ব্ব ছবির অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আপনার সুখসাগরে আপনি ডুবিতে লাগিল।

অবলা ছবি হারাইয়া অবধি দিন রাত্রি সেই ছবির কথা ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া আকুল হইত। রাত্রে স্বপ্নে কেবল ছবির স্বপ্ন দেখিত। প্রকৃতি পটে সেই ছবির জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম-হারা হইতেছিল। আত্মহারা হইতে হইতে অবলা ভাবঘোরে বসিয়া পড়িল—বসিয়া নতমুখে কেন—কিসের জন্য—অশ্রু ফেলিতে লাগিল। গোলাপ একটু আড়াল হইতে সব দেখিতেছিল। অবলাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল "কেন অবলা! তুমি কাঁদ কেন"?

অবলা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল—দেখিল গোলাপ। অবলা গোলাপের কথায় কোন উত্তর দিল না আবার মুখ অবনত করিয়া থাকিল। গোলাপ আবার জিজ্ঞাসিল:—'কেন ভাই! কাঁদ কেন? আমায় বলতে দোষ কি?''

অবলা ভারি ভারি সুরে বলিল "আমার কিছু ভাল লাগেনা" বলিয়া মুখ নত করিল। গো। কেন—তোমার কি কিছু কষ্ট হয়, অযত্ন হয়। অ! না। তানয়। এখানে আমার কষ্ট কিছু নাই। গো। তবে কাঁদ কেন? শুধু আজ নয়? রোজ তোমায় যে কাঁদিতে দেখি ভাই! কার জন্য এত কাঁদ? মার জন্য? তা কেঁদে কি করবে ভাই! আমার এইযে

মা—আমায় এক রতি রেখে মরেছেন। কেউতো চিরকালের জন্য আসে নাই; তার জন্য কেঁদে কেবল কষ্ট পাওয়া বইতো নয়।

অবলা একটু নীরবে থাকিয়া একটু মর্ম্মভেদী স্বরে কহিল, "আমায় চিরকালই কাঁদতে হবে—একান্না যাবার নয়"। কথা শুনিয়া গোলাপের মনটা বড় নরম হইল। নরম স্বরে বলিল "কান্না কিভাই ভাল। যখন পাবার আর যো নাই তখন মিছামিছি কষ্ট পাওয়া"। ছবির জন্য প্রাণের যা ভাব তাহা কষ্ট হইলেও সে কষ্ট অবলার সুখ,—তাই বালিকা সেই কষ্টের পোষকতা করিয়া বলিল "না এতে কষ্ট আর কি"?

গো। কি ভাই! বুঝতে পারি না। কষ্ট যদি নয় তো কাঁদ কেন—সত্যি কথা বলিস্ ভাই। প্রেমের কষ্ট যাতনা ফুলের গায়ে কাঁটার মত, তাই, প্রেমিকা প্রেমের গন্ধ ও শোভা প্রেমের কাঁটার সহিত মিশাইয়া একাকার করিতে চায়। সেইজন্য অবলা বলিল, "আমি ভাই! মিথ্যা বলি নাই। আমি কাঁদলে যদি তোমাদের কষ্ট হয় তো আর কাঁদবোনা" বলিয়াই আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল—সে দুঃখের বন্যা বাড়িয়া উঠিল।

গো। ভাই! তোমার আগড়ম বাগড়ম কিছু বুঝি না। ও সব ভাই! তোমার কেমন কথা? এইবল কাঁদবোনা আবার কেঁদে আকুল হও।

অ। অনেকক্ষণ পরে জড়িতস্বরে অবলা বলিল, তুমি কি এরকম কখন (ও) কাঁদ নাই। আমি ছেলে মানুষ—কেন কাঁদি বুঝাতে পারবোনা—কান্না পায় তাই কাঁদি। তা কাঁদি—তাতে আর কষ্ট কি?

অবলার দুঃখস্রোত প্রেম-পরিখায় বাহিয়া থাকে তাই দুঃখের ভিতরে কু অনুভব করে না

গো। আমাদের আর কি ভাই! তুমি কান্না কাটনা করলে আমাদের কষ্ট হয় তাই বলি। তা তোমার কষ্ট কিসে যায় আমাকে সব খুলে বলনা।

অবলার মুখে চোখে একটী চিন্তা ফুটিয়া উঠিল। অবলা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি একবার বাড়ি যাব"। বলিয়াই এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

গো। সেখানে তো কেহ নাই—গিয়া কি হবে।

অ। আমি আবার আসিব। একটী লোক যদি সঙ্গে দাও তো যাই আবার তার সঙ্গেই আসি।

গো। সেখানে কি এত দরকার?

অ। একটী জিনিস আছে আনিব।

বালিকার সকল কথা বলা হইলনা অনেকটা ভিতরে থাকিল। যাহা ভিতরে থাকিল তাহার কিয়দংশ মাত্র অবলার ছল্ ছল্ চাহনিতে ও মুখের গাম্ভীর্য্যে দেখা দিল। প্রেমের অর্দ্ধস্ফুট কথার আড়ালে জগতের যেটুকু লুকান থাকে (সেটুকু একবারেই অব্যক্ত) তাহার মত সুন্দরতম রহস্য আর কিছু আছে কি?

গো। জিনিস আবার কি? ডাকাতে সব লুট করেছে নয়?

অ। ডাকাতে লবার জিনিস নয়। বলিয়াই অবলা নীরব মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া অশ্রুমোচন করিল। কিন্তু তাহাতে মর্ম্মগত ভাবের কিছুই প্রকাশিত হইল না। সেই

অশ্রুবিন্দুর অন্তরালে যে প্রেমের অনন্ত সমুদ্র ; পাঠক পাঠিকা তাহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হউন।

গো। তবে সে তুচ্ছ জিনিসের জন্য তত দূর যাবে কেন ? তা তুমি বলনা আমি তা দেব।

গোলাপ! অবলার তাহা তুচ্ছ সামগ্রী নহে। তাহা অবলার একটী সৌরজগৎ।

অ। সেটী আমার প্রাণের তুল্য। তাহা না পাইলে আমি হয় পাগল হব—না হয় মরিব।

অবলা মরার অধিক যাহা তাহাও করিতে পারে! সেইসময়ে অবলার মুখেরদীপ্তি চক্ষেরতেজ দেখিয়া গোলাপ বিস্মিতা হইল। বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসিল কি এমন জিনিস পাগল হবি নাকি ?

অ। এক খানি ছবি না বলিয়া ঈশ্বরের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলিলেই ঠিক হইত। জড়িত-স্বরে কথাটী বলিতে বলিতে অবলার দুচক্ষু জলে ভরিয়া গেল অবলার কণ্ঠরোধ হইল।

গোলাপ কিছুই বুঝিলনা। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "একখানা ছবির জন্য এত! ওমা! পাগল হবার যো হয়েছিস যে! আমার ঘরে আর কখানা ছবি চাস্ এখনি দেব। তা এত দিন বলিস নাই কেন ভাই!" বলিয়া অবলার হাত ধরিয়া গোলাপ টানিতে লাগিল।

অবলা গোলাপের সেভাবে বড় দুঃখিত বড় লজ্জিত হইল—দুঃখে লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে ভাবিল আমি পাপিষ্ঠা! তাই মনেরকথা বলিলাম। বলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালবেলা। গ্রীষ্মকাল। কলিকাতার গড়ের মাঠে গঙ্গার ধারে, এক যুবা বেড়াইতেছে। গঙ্গার বক্ষে উর্ম্মির পর উর্ম্মি—বড় বড় উর্ম্মির পাশে বড় বড় উর্ম্মি—সব সারি বাঁধিয়া নদীর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে—কুল কুল স্বরে গান গাহিতেছে। নৌকা সকল হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে যাইতেছে—আসিতেছে—ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গার ধারে রাস্তা দিয়া কত গাড়ি ঘোড়া, সাহেব বিবি পৃষ্ঠে লইয়া দৌড়িতেছে। কোন গাড়িতে খালি সাহেব; কোনটায় বা বিবি কোনটায় সাহেব বিবি দুই আছে। কোন গাড়ির একপার্শ্বে সাহেব পরপার্শ্বে বিবি উন্নত বক্ষের শোভা দেখাইয়া—তাম্রবর্ণের বেণী পৃষ্ঠে দুলাইয়া শ্বেত হস্ত শ্বেত হস্তে রাখিয়া বায়ু সেবনে হৃদয় প্রাণ মত্ত করিতেছে।

হরিদাস একটী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে:—কি চমৎকার রং—দুধে আলতায় গুলিলে যে রং হয় তার অপেক্ষাও ভাল। অমন সুন্দর রং দেখি নাই। অনেকের রং আছে গঠন নাই। গঠন আছে রং নাই। এ তা নয়, যেমনি গঠন তেমনি রং—যেমনি রং—তেমনি গঠন। তাই কি যেমন তেমন; অন্ধকার ঘরে চলিয়া বেড়াইলে বোধ হয় যেন বিদ্যুতের রাশি রমণীবেশে বেড়াইতেছে। কবির বর্ণনা পড়িয়াছি—অনেক রাজকন্যাও দেখিয়াছি—কলিকাতায় আর রূপবতী নারী দেখিতে

বাকী নাই ;—কিন্তু তেমনটী দেখি নাই। এখন বালিকা ; বয়স ১২ বৎসর মাত্র। এখনি এত রূপের ছটা—শোভার ঘটা। আহা ঠোট দুটী যেন দুটী রক্তিম গোলাপ ফুলের দুটী পাপড়ী। সেই ভাসা ভাসা চোক—যেন তাহাতে কত ভাষা আছে কত ভাবের তরঙ্গ আছে। দুটী হাতের আঙ্গুলগুলির এক একটী নয়ন ভরিয়া রাতদিন দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজাল কাল মেঘের ন্যায়—অমাবস্থার অন্ধকারের ন্যায়—আর তার মধ্যে সেই চন্দ্রবদন বাস্তবিকই নিষ্কলঙ্ক শশধরের তুল্য। কোরক সম এখনও বালিকা ; যৌবনে শীঘ্রই পদার্পণ করিবে। এখনও বক্ষ সমতল—কিন্তু যৌবন যখন সে দেহে প্রকাশিত হইবে ; যখন কোটীদেশ আরও ক্ষীণতর হইবে—মুখে লজ্জা-জ্যোতির সহিত যৌবন জ্যোতি মিলিবে—যখন নব কুচোদগমে বক্ষের শোভার নিকট কমল কোরকের শোভা মলিন হইবে, তখন বসন্তে বসন্তের শোভা আসিয়া মিশিবে—

সেই অধরে—রক্তিম অধরে—না জানি কত সুধা ক্ষরিবে ; সেই মৃগনিন্দিত নয়ন চঞ্চলতায় কত হৃদয়ভেদী—কত অস্থি-ভেদী অদৃশ্য মধুর শরজাল বর্ষিত হইবে—

সেই সুন্দরীর এক ফুৎকারে, এক নয়ন ভঙ্গিতে কত রাজ্য ডুবিতে পারে উঠিতে পারে ;—কিন্তু যে ডুবিবে সে আর উঠিবে না—যে উঠিবে সে আর ডুবিবে না।”

এইরূপ ভাবনার ঝটিকা বহিয়া হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে এমন সময়ে আর এক গম্ভীর ভাবের—পবিত্র ভাবের বজ্রনাদ হইল ঃ—

“ছি! ছি! কি ও? মানুষ না পশু? পশু না কীট? কীট না

অণু? কে তুমি? আশ্রয় দিয়া কন্যার ন্যায় দেখিয়া এ আবার কি? ওসব ভাল নয়। ওসব ভাবিতে নাই। ছি! ছি! মানুষের একি ধর্ম্ম। আশ্রিতাকে এ রকমে ভাবিতে নাই। তুই কি মানব দেহে কুকুরের আত্মা? না তুই মানববেশে নরকের কীট। আর এক কথা—তোমার স্ত্রী আছে; সে যদি কাহারও বাটীতে ঐ অবস্থায় গিয়া পড়ে, আর যদি আশ্রয়দাতা তোমার মত ভাবে উন্মত্ত হয়;—তুমি যদি তাহা জানিতে পার—তোমার হৃদয় যদি তার হৃদয়ের ভাবকে অনুভব করিতে পারে তাহা হইলে তোমার হৃদয় রাগিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে বলিবে; রে নরপিশাচ রে নিষ্ঠুর—নরকে যা—নরকে প'চে মর'।

হৃদয় মধ্যে স্বর্গ নরকের সংগ্রাম উপস্থিত। নরক আবার হৃদয়কে অধিকার করিবার জন্য বলিতে লাগিল:—

'কিসের ভয়? যতদিন আছ সুখ কর। যখন অমন রত্ন দৈবক্রমে পাইয়াছ তখন ভোগ কর। রাজারা অমন জিনিষের জন্য কত যুদ্ধে শোণিত স্রোত বহাইয়াছে—কত নগর অগ্নিতে ভস্ম করিয়াছে। এমন রমণী রত্ন তুমি অগ্রাহ্য করিও না। যাহাতে সেই রূপবতীর প্রণয়াস্পদ হইতে পার, যাহাতে তাহার ওষ্ঠ চুম্বনে আপনার মানব জন্মের সার্থকতা করিতে পার, তজ্জন্য বদ্ধ পরিকর হও। পাপ কি কর নাই—যখন একটী পাপ করিয়াছ তখন আর যাতনার ভয় রাখিও না—মরিতে যখন হইবে—মরণের হাত কেহ এড়াইতে পারিবে না; মরিবার পূর্ব্বে যত সুখ করিতে পার কর। আর এমন সুখ কি আছে। ঐ রূপ-জ্যোতিতে ডুবিয়া যাও—

ঐ হিরকমালা গলে পর, সেই মৃণালভুজ গলায় জড়াইয়া সেই অধর প্রান্তে চুম্ খাইয়া—সেই মধুর বিদ্যুতময় বক্ষ-স্বর্গ আপনার কর্কশ বক্ষে রাখিয়া জীবনের সার্থকতা কর, ভয় নাই—ভয় নাই'।

যুবা এই ভাবে অভিভূত হইল। দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরের আপাততঃ জয় হইল। হরিদাস মনে মনে বলিল, আমার সৌভাগ্যবশতঃ যখন পেয়েছি তখন আমি নয় তো কি আর একজন ভোগ করিবে? শুনেছি তার স্বামী আছে—তা থাকুক, গিয়া বলিব মরিয়াছে। তা হলেই সব আপদ চুকে যাবে। আর যৌবনের ভার সে কি সহিতে পারিবে? আমি নিজের ঘরে পাইয়াছি যখন, আর ভাবনা কি?

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। অবলা গোলাপ দুই জনে একটী কক্ষে শুইয়া আছে। হঠাৎ গোলাপ উঠিয়া শাশুড়ির আহ্বান শুনিয়া শাশুড়ির ঘরে গেল। শাশুড়ি বলিল, ও ঘরের শিকল দিয়া এস, আমার পেটে হাত বুলাও, বড় অসুখ কচ্ছে।

পুর্ণিমা। চন্দ্রালোক আকাশ প্লাবিত করিয়া বসুন্ধরা পৃষ্ঠে মধুর ভাবে নৃত্য করিতেছে। ফুলের বুকে বুক দিয়া জ্যোৎস্না হাসিতেছে; সরোবরের নিল জলে তরঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়া খেলা করিতেছে—প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর যৌবন কান্তিতে আপনার কান্তি মিশাইয়া কুমুদিনীমুখে চুম্বন করিতেছে। গাছ সকলের গায়, মাথায়, পাতায়, চন্দ্র কিরণ বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে। বনের ভিতরে গাছে ছায়া পড়িয়াছে—সেই ছায়ার মাঝে মাঝে চাঁদের কিরণ পড়িয়া ছায়ার সহিত দুলিয়া দুলিয়া

নাচিতেছে। যে কক্ষে অবলা নিদ্রিতা, সেই কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া কোমল স্নিগ্ধ রশ্মি অবলার মুখে পড়িয়াছে।

কি মধুর দৃশ্য! মনুষ্য চক্ষুতে যে এমন রূপলাবণ্যে সুধাকর কর পড়িতে দেখিয়াছে তার স্বর্গ সুখের আর আবশ্যক নাই।

গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত ছিল, হঠাৎ বায়ু বেগে দ্বার বন্ধ হইল। রূপের প্রতিমা অন্ধকারে আলো করিতে লাগিল।

অবলা স্বপ্ন দেখিতেছে—'যেন ডাকাতের দল অবলার ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই ছবিখানি লইয়া পা দিয়া ভাঙ্গিতেছে' অবলা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিল। নিদ্রার ঘোর কাটে নাই—ভাবিতেছে আমি কোথা, ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল গোলাপের কাছেই শয়ন করিয়া আছি। অমনি হাত দিয়া গোলাপের হাত ধরিল, কিন্তু দেখিল হাত শক্ত হাতে বালা নাই। মুখে হাত দিয়া দেখিল মুখে দাড়ি। অমনি বাবা গো মা গো বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিবা-মাত্র—'কেন? কেন গোলাপ? বলিয়া সজোরে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিল'। অবলাকে যখন আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল তৎক্ষণাৎ অবলা আপনার নখ সেই পুরুষের চক্ষে ফুটাইয়া দিল। অমনি যুবা যন্ত্রনায় অধীর হইয়া বালিকাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

শ্যামা ও গোলাপ 'কি—কি'—শব্দ করিতে করিতে গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল অবলা নীচে অচেতন প্রায় পড়িয়া আছে। অবলার চ'খে মুখে জল দিয়া চেতনা সম্পাদন করিল। অবলার মুখে সব কথা শুনিয়া স্থির করিল, নিশ্চয় চোর বা ভূত আসিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার পর হইতে অবলার মন বড়ই খারাপ। কিছু ভাল লাগে না। মন যেন দেহ ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে—মন যেন মন নয়—অবলা যেন সে অবলা নয়। ভাবিতে ভাবিতে সে রূপরাশিতে কালিমা পড়িল। মুখ বিবর্ণ—বিষণ্ণ—সর্ব্বদা অবনত। অবলা ভাবিতেছে 'যদি স্বপ্ন সত্য হয়—যদি সে ছবি আর না পাই তবে আমি কি প্রকারে বাঁচিব। আমি এ দেহ আর রাখিতে পারি না। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিল। আগে ছবির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিত বটে কিন্তু সে কান্নার তলায় যেন একটু সুখ ছিল; কিন্তু এখন যে কাঁদিল এ কান্নার প্রতি অশ্রুবিন্দুতে যেন মৃত্যুর সহস্র গুণ যন্ত্রণা—নরকের অনন্ত গুণ ভীষণতা। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে বলিল 'মা যেখানে, আমিও সেখানে যাব—আর থাকিব না—কেন থাকিব? আর খাব না—কেন খাব? সে ছবিখানি যদি পাই, তো[illegible] তলায় থাকিতে পারিব—শ্মশানে ভূতের দলে নির্ভয়ে হা[illegible]তে হাসিতে বাস করিতে পারিব। আর যদি না পাই' অবলা আর ভাবিতে পারিল না; অবলার শরীর থর থর করিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে—বুকের ভিতরে দূঢ় দূঢ় গুর গুর শব্দে শোকোচ্ছ্বাস উঠিতেছে। অবলা আবার ভাবিতেছে 'আচ্ছা ছবি নাইবা [illegible] তাহাতে কি; যাঁর ছবি'—ভাবনা এই পর্য্যন্ত আসিবামাত্র

অবলার মূর্ত্তিতে কে যেন গাম্ভীর্য্য ঢালিয়া দিল—কে যেন বালিকার মুখে সতীত্বের আলো জ্বালিয়া দিল—নয়নের জলে যেন স্বর্গের অমৃত-তরঙ্গ বিদ্যুৎ মাখিয়া খেলিতে লাগিল। সহসা যেন সিংহের সাহসে হৃদয় বলীয়ান হইল—শরীর কণ্টকিত হইল।—বালিকা স্বামীর জন্য হাসিতে হাসিতে সাগরের গর্জ্জনকে তুচ্ছ করিতে—বজ্রের ভীষণ শব্দকে হেয় জ্ঞান করিতে—এবং শত শত বীরের শাণিত তরবার-প্রহার আপনার বক্ষে ধরিতে পারে।

যাঁর ছবি তিনি কেমন?—ঠিক ছবির মত, না ছবি তাঁর মত? ছবির মুখ সেই মুখের মত, ছবির হাত পা সব তাঁরই মত। তা ছবি যায় যাক, যাঁর ছবি তাঁকে যদি পাই।—কেন পাবনা কেন? আমি এত কাঁদি যাঁর জন্য তাঁকে পাবনা? আমি এত ভুগি যাঁর জন্য তাঁকে পাবনা? তবে কাকে পাব? আর যদি তাঁকে না পাই—অভাগিণীর ললাটে যদি সে সুখ না থাকে—কি করিব? পৃথিবীতে তাঁর আকৃতি যখন পাইয়াছি তখন সেই আকৃতি লইয়া জীবন-পাত করিব। আহা সে ছবি দেখিলে কত আহ্লাদ, কত বুক ভরা সাহস, কত হৃদয়-পোরা শান্তি। সে ছবির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি যেন স্বর্গ পাই। ছবিকে লইয়া এত; না জানি তাঁকে পাইলে কত সুখ হয়। এই পর্য্যন্ত আসিয়াই প্রেমিকা একবারে অভিভূতা হইয়া সুখে কি দুঃখে নিমগ্না হইল বুঝিতে পারিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

চন্দ্র ডুবিয়াছে। একটু একটু অন্ধকার। গ্রামের পার্শে মাঠের মধ্যস্থ বড় রাস্তা দিয়া একখানি গোরুর গাড়ি ক্যাঁ কোঁ ক্যাঁ কোঁ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছে। গাড়োয়ান গাড়ির উপরে শুইয়া গাহিতেছে:—বঁধু ফিরে যাওহে শ্বশুর জাগে ভাসুর জাগে বঁধু ফিরে যাওহে. গাড়ির কিছু পিছুতে রাস্তার দুই পাশে দুই দল গোরু খড়ের বোঝা লইয়া যাইতেছে। হরিদাস মাঠের মধ্যস্থ একটী অশ্বথ বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া দূরস্থ ছায়ার ন্যায় সেই গাড়ি, গোরু ও মানুষ গুলি দেখিতেছে। অশ্বথ বৃক্ষের ডাল হইতে একটী কাক কা কা রবে উড়িয়া গেল। একটী শৃগাল আস্তে আস্তে হরিদাসের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। অদূরে মুসলমান পাড়ায় কুক্কুট গুলি কর্কশ শব্দে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিল।

হরিদাস ভাবিতেছে 'সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, পথ হাঁটিয়া কলিকাতা হইতে আসিলাম। ঘরে গিয়া শয্যায় সুবিধা মাপিক' আপনার কোলে পাইলাম। অতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল ছিল। এখন বাড়ির ভিতরে একটা নিশ্চয়ই গোলযোগ হইয়াছে। আমায় চিনিতে কখনই পারে নাই। গোলাপী ভাগ্যে জানিতে পারে নাই। আর যদিই জানিতে পারে তাহাতেই বা কি? দুইবার যে তাকে ভূতে পেয়েছিল সে সবই নষ্টামি। বাড়িতে যে ইট পাটখেল পড়িত, সে মানুষ

জুড়েই ফেলিত। ছুঁড়ি আমায় অনেক কষ্ট দিয়াছে—আমি এই বার শোধ দিব। তার সব গহনা গুলি অবলাকে দেব। মা রাগ করেন করবেন—রাগ ক'রে কিছুই করতে পারবেন না। গোলাপী যদি সুখের পথে কাঁটা দিতে প্রয়াস পায় তো ছুঁড়িকে বাড়ি হ'তে দূর ক'রে দেব। ছুঁড়ির চরিত্রটা খারাপ আছে—আরও খারাপ যাতে হয় তার চেষ্টা করব; তা হইলেই অবাধে অবলাকে বুকে রেখে স্বর্গ সুখে সুখী হ'ব। গোলাপী ছুঁড়িকে আর স্ত্রী ব'লে ভাববো না—অবলার চাক্‌রাণী ব'লেই ভাবিব'।

দেখিতে দেখিতে আকাশ পরিষ্কার হইল। পূর্ব্বদিকে লাল সূর্য্য প্রকাশিত হইল। চাষারা লাঙ্গল ঘাড়ে লইয়া একে একে গোরুর সহিত মাঠে গোলমাল করিতে লাগিল।

হরিদাস আস্তে আস্তে শঙ্কিত মনে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে গিয়াই দেখিল গোলাপ রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে; শ্যামা উঠানে বসিয়া কি করিতেছে। 'মা' বলিয়া হরিদাস বাবু শ্যামাকে চমকিত করিল।

শ্যা। কেরে? হরি? এত সকালে যে?

হ। সকাল কোথায়?

শ্যা। আর বাছা—সে দিনে বলেছিলে বাড়ীতে ভয় নাই—এই শেষ রাত্রে যে হ'য়ে গেছে—না বাছা—এ বাড়ীতে আর থাকা নয়।

হ। কি হয়েছে—কিছু নয়। ভূত নেই ভূত নেই।

অবলা শুনিতে পাইয়া গোলাপকে জিজ্ঞাসা করিল 'কিগা'?

গোলাপ চুপে চুপে বলিল ‘এ বাড়ীতে ভূত আছে বোন—ভূত আছে’।

হরিদাস ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল গোলাপের কাছে অবলা’। অবলাকে দেখিবামাত্র পাপিষ্ঠের হৃদয়ের রক্ত কাঁপিয়া উঠিল বক্রদৃষ্টে অবলাকে দেখিয়া গোলাপকে বলিল ‘দাও একখানা কাপড় দাও’।

গোলাপ কাপড় দিলে, হরিদাস বলিল ‘যাও কাজ কর্ম্ম কর গে’। গোলাপ ঘরের বাহিরে যাইবা মাত্র অবলা সঙ্গে সঙ্গে গেল। হরিদাসের ইচ্ছা গোলাপ যাউক অবলা একলা ঘরে থাকুক। পাপিষ্ঠ হরি অবলার পিছু পিছু চলিল।

অবলার বড় লজ্জা। এ পর্য্যন্ত আরাম হইবার পর কোন পুরুষের সহিত কথা কহে নাই। হরিদাসকে দেখিলে ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিত। হরির আকৃতি যে কিরূপ তাহা অবলা ভাল দেখে নাই দেখিবার মধ্যে পা দুটী দেখিয়াছিল। অবলা হরিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

গো। অবলা আমার ঘর হতে তেলের বোতলটা আন।

অবলা তেলের বোতল আনিতে ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র—হরি পিছু পিছু ঘরে ঢুকিল। অলবা লজ্জায় জড়িতা হইয়া আস্তে আস্তে বোতল খুজিতেছে; হরিদাস অবলার পদাঙ্গুলি হইতে কেশ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বিছানায় বসিয়া বলিল ‘অবলা তুমি হেথা এস দেখি, তেলের বোতল ও ল’য়ে যাবে এখন’।

ভক্তিপরায়ণা, দেবতার নিকট যে ভাবে যায়, অবলা সেই রূপে—নিম্ন-দৃষ্টিতে লজ্জার শোভা বিস্তার করিয়া, মৃদু মৃদু

পা ফেলিতে ফেলিতে হরির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অবলার সমস্ত শরীরের ভিতরে পবিত্রতা ও লজ্জার প্রভা দেখিবামাত্র হরির হৃদয়ে কে বলিল 'লজ্জিত হও—দেবীর অবমাননা করিও না'।

সে স্বর্গীয় ভাবে একটু আক্রান্ত হইয়া হরি ভয়ে ত্রাসে জড়িতস্বরে বলিল 'না তুমি বোতল ল'য়ে যাও'।

হরিদাসের মনের ভিতরে আবার দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কাম হরিদাসের মনে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে, সমস্ত প্রকৃতিতে একটা গোলযোগ বাঁধাইয়া বলিল, "হরি! তোর বুকে আমি অবলাকে সম্ভোগ করিতে পাব না? তুই কেন ভয় করিস? আমা হতে তোর কত সুখ হবে। আমি তৃপ্ত না হ'লে তোকে ছাড়িবনা। তোর মর্ম্মে সূচ ফুটাইব—তোর বুকের ভিতরে সর্প হইয়া দংশন করিব। তোর মাথায় আগুন হইয়া জ্বলিব। অমন সুন্দরীকে যদি ভোগ করিতে, অমন অধরে যদি অধর দিতে না পারিস তো, তুই বড় হতভাগ্য।"

আবার বিবেক সেই অন্ধকারে একটু আলো বিকীর্ণ করিয়া বলিল, "সাবধান! সাবধান! পাপ করিলেই নরকের আগুণে পুড়াইব। আমার হিতোপদেশ শ্রবণ কর। আমি যা বলি তা ঈশ্বরের বাণী। কথা শুন দেখি—দেখি অমৃত-ভোগ হয় কি না। কামের তৃপ্তিতে সুখ নাই। ওর মিথ্যা প্ররোচন বাক্যে মুগ্ধ হইলে তোমাকে ও বিপদের পর বিপদে ফেলিবে। কাম রাক্ষস অপেক্ষাও ভীষণ। তোমার বক্ষের শোনিত-পান না করিলে উহার তৃপ্তি হইবেনা। তোমার কাঁচা হাড় গুলি আগুণে পুড়াইতে পারিলে, তোমার মস্তিষ্কের ভিতরে বিবের

আগুণ জ্বালিয়া, তোমাকে পাগল করিতে পারিলেই উহার সুখ। কামের বক্ষে পদাঘাত কর, আমার কথা শুন—অবহেলা করিও না"। গম্ভীর স্বরে হৃদয়ে এই অমৃতময় উপদেশ উপস্থিত হইল। কামান্ধকারে বিবেকের আলো প্রজ্বলিত হইল। হরিদাস একটু লজ্জিত হইল, কামের নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসের হৃদয় গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হরিদাস মনে মনে বলিল, 'না—পাপ করিব না'। হরি বিছানায় শুইয়া আছে। অবলা আবার কিসের জন্য ঘরে আসিল। অবলাকে দেখিবামাত্র আবার কাম মাথা তুলিল। হরিকে আবার বিমুগ্ধ করিল। বিবেকের আলো নিবিল। বাহিরে ঘরের পাঁদাড়ে রসালের ডালে বসিয়া সর্ব্বনেশে কোকিল ডাকিল "কু"।

যেন কাম হরিকে মোহিত করিবার জন্য গান গাহিল।

অবলা বাহিরে গেল। কিন্তু স্মৃতির উদ্দীপনায় ঘরে অঁবলার সবই থাকিল। অবার কোকিল ডাকিল "কু"।

সেই "কুহু" স্বর একটা ভীষণ উদ্দীপনা—ভীষণ দাহ লইয়া পপিষ্ঠের হৃদয় প্রাণ জর্জ্জরীভূত করিল—রক্ত যেন আগুণে জ্বলিয়া উঠিল—পাপিষ্ঠ যেন সে আগুণে পুড়িতে থাকিল।

হরিদাস ইতিপূর্ব্বেই বিবেকের মাথায় পদাঘাত করিয়াছিল; ঈশ্বর প্রজ্জ্বলিত আলোক কামের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়াছিল;—এখন লজ্জাবিহীন হইয়া জড়িত স্বরে মাকে ডাকিয়া বলিল, "মা অবলাকে পাঠায়ে দাও, আমার বড় হাত পা কামাড়াচ্ছে—টিপে দেবে।"

গোলাপ প্রথমেই হরিদাসকে তত সকালে ঘরে আসিতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল,—নিশ্চয়ই ঐ হতভাগা,— রাত্রে ঘরে এসে অবলার কাছে শুয়েছিল। "হরিদাসকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্ম গোলাপ বার বার অবলাকে ঘরে পাঠাইতে ছিল। গোলাপ এসব বিষয়ে খুব চতুরা। পা টিপিবার কথা শুনিয়াই গোলাপ আপনি ঘরে গিয়া, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া, দাঁতে রাগ চাপিয়া বলিল "বলি অবলাকে কেন? আমি পা টিপলে কি হবে না" ?

হ। না না—তুমি কাজ করগে ;—শীঘ্র ছুটী ভাত রাধগে।

গোলাপ কিছু উত্তর দিলনা, রাগে ফুলিতে লাগিল। মনে মনে গালি দিয়া বিকৃত মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিয়া, অবলাকে ঘরে পাঠাইয়া দিল।

অবলা—সরলা—সে পাপের চক্র জানেনা। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া হরির পায়ের কাছে অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। পাপিষ্ঠ ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের ন্যায় অবলার রূপের প্রতি লোলুপ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল "পা টেপ"।

অবলা আস্তে আস্তে পা টিপিতে লাগিল।

ব্যাঘ্র বলিল, "হেথা স'রে এস ;—কেমন ক'রে টিপতে হয় দেখিয়ে দি"।

এই ফাঁদে ফেলিয়া কত দুর্বৃত্ত কত অবলার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপন করিয়াছে। এই জন্য স্ত্রীলোকের পর পুরুষের কাছে দাঁড়ান সর্ব্বনাশের কথা।

অবলা সরিয়া গেল। ব্যাঘ্র অমনি শীকারের হাত ধরিল। এই রকমে টিপিতে হয় বলিয়া অবলার হাত টিপিতে লাগিল।

অবলার বড় লজ্জা হইতে লাগিল কিন্তু মন্দ আশঙ্কা কিছু মনে আসিল না।

গোলাপ আড়াল হইতে সব দেখিতেছে। হরি অবলার হাত টিপিতে টিপিতে সেই কোমল করপল্লবের মাধুরি ও কোমলতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর পাপিষ্ঠ সর্ব্বনাশ করিল।—পাপিষ্ঠ উন্মাদ হইয়া সরলা বালিকার নিষ্কলঙ্ক হাতে চুম্বন করিল।

সেই সময়ে পাপিষ্ঠ বায়ুতে বিলীন হইল না কেন।

"যাও এইবার পা টেপগে"।—হরির বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিল। সরলা বালিকা তখন ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে নীরবে কাঁদিয়া ফেলিল।

মনুষ্যকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান হৃদয়ে এমন এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে পাপ করিবা মাত্র সেই শক্তি হৃদয় প্রাণে যাতনার বিষাগ্নি ঢালিয়া দেয়। হরিদাস যেই সেই শক্তির অবমাননা করিয়া স্বর্গের দেবীর হস্তে কলঙ্কের দাগ বসাইল—সে দাগ সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া হরিদাসের মুখে কালিমা সঞ্চারিত করিল—সে দাগ দেবীর হাতে বসিতে পারিল না। হরি কুকুরের ন্যায় কার্য্য করিবা মাত্র হৃদয়ের অন্তস্থলকে ভয়ে কে বিকম্পিত করিয়া দিল;—হরিদাস আজ নরকের দ্বারদেশে পদার্পণ করিব মাত্র কি এক ভয়ানক যন্ত্রণা-পূরিত ভীতির হস্তে পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীরবে বিছানায় শুইয়া থাকিল। অবলা ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের বাহিরে এক পা এক পা করিয়া যাইতেছে এমন সময়ে গোলাপ

ঘরে আসিয়া অবলার হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। বলিল 'তুই যা আমি সব বুঝেছি মা ডাকছেন আমি পা টিপছি'।

হরি ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়াছে। গোলাপ ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র কম্পিতস্বরে বলিল 'তুমি যে বড় গিন্নি হয়ে পড়েছ দেখছি—আমার উপর কর্ত্তাত্তি'।

গোলাপ চক্ষু রাঙ্গাইয়া দন্তে দন্ত টিপিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল 'বোঝা গেচে সব বোঝা গেছে'।

হ। কি? কি? কি?

গো। হাতে চুম খাওয়া।

কথাটার ভিতর দিয়া হরির প্রকৃতিতে যেন বজ্রাঘাত হইল। হরি এখনও তত পাপিষ্ঠ হয় নাই।

হরি চমকিত ভাবে আপন দুষ্কর্ম্ম চাপা দিবার ছলে বলিল, কি? কি? কি?

গো। মুখপোড়া! ছেলে মানুষ যদি এনেছিস তো—ওসব কি?

হ। কি? কি? কি?

হরিদাসের গোলাপের উপর বড় রাগ।

গো। অবলা না হ'লে পা টেপা হয় না—অবলা যেন ওঁর মাগ।

হ। কি? কি? কি? খুব লোক তো তুমি।

বলিতে বলিতে হরিদাস বিছানায় উঠিয়া বসিল।

গো। মাকে ব'লছি রোস। আর দেখি কেমন অবলা তোর কাছে আসে।

হ। মুখ সাম্‌নে কথা কবি? বলিয়া পাপিষ্ঠ গোলাপকে ঘুসী দেখাইল।

গো। কেন—মাগ তো আর মরে নি।

হরি মহা গোলযোগে পড়িয়া রাগে কি বকিতে বকিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

রন্ধনাদি শেষ হইল। হরি আহার করিয়া ঘরে শুইয়া এক ঘুম ঘুমাইল। বৈকাল হইয়াছে। গোলাপ হরির ঘরে বসিয়া চুল আঁচড়াইতেছে। আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মধুর কর সঞ্চালনে যুবতীর স্ফীত বক্ষদেশ আন্দোলিত হইতেছে—হরি একমনে সেই মধুরান্দোলন অবলোকন করিতেছে।

এমন সময় বাড়ীর বাহিরে এক দ্বারবান আসিয়া ডাকিল হরিবাবু ঘরমে হ্যা' 'কেও' বলিয়া হরিবাবু বাহিরে গিয়া দেখিল, মনিব সাহেবের নিকট হইতে দ্বারবান আসিয়াছে হরির আর থাকা হইল না; দ্বারবানের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস কলিকাতা যাইবার ২ ঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, ঘোষেদের বাড়ীর সেই যুবা পুরুষটী হরির বাটীতে আসিল। এ সময়ে যুবার কলেজ বন্ধ—গ্রীষ্মাবকাশ। হরি বাটীতে থাকিলে যুবা দুই একবার আসিত। হরি না থাকিলে দিবা রাত্রি কেন যে থাকিত ঠিক্ বলা যায় না। বোধ হয় গোলাপের সহিত কিছু সম্বন্ধ ছিল,—তাই।

যুবার নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র খুব সুন্দর পুরুষ। কলিকাতায় অনেক স্ত্রীর মাথা খাইয়াছে। কিন্তু এক কথা বলিয়া রাখি গোলাপই রামচন্দ্রের মাথা খায়। গোলাপের বাপের পার্শ্বস্থ বাড়ীটী রামচন্দ্রের মামার বাড়ী। রামচন্দ্র মামার বাড়ীতে গোলাপকে দেখিয়াছিল—গোলাপের বিবাহের পূর্ব্বে। বিবাহের পূর্ব্বেই—গোলাপ রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত। পরে বিবাহ হইল—গোলাপ যৌবনে ফুটিতে লাগিল। রামচন্দ্রের গোঁপের রেখা দিল। গোলাপের পূর্ব্বে কোন কুভাব থাকে নাই, তবে বাপের বাড়ীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত বসিয়া রামচন্দ্রের নিকট নানা প্রকার গল্প শুনিত। গল্প শুনিতে শুনিতে গোলাপ রামচন্দ্রকে হৃদয় বিক্রয় করে। রামচন্দ্রও গোলাপের নয়নবাণে আপনাকে পরাস্ত স্বীকার করে। মেয়ে ছেলের বিবাহ ছেলে খেলায় দিলে এ সব আপদের ভয় থাকে না।

এখন রামচন্দ্র আসিবামাত্র গোলাপ বসিবার আসন বাহির করিয়া দিল। রামচন্দ্র বসিয়া গোলাপের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। গোলাপ একটী পান আনিয়া রামচন্দ্রের হাতে দিবামাত্র রামচন্দ্র গোলাপের হাতে চিম্‌টি কাটিল। গোলাপ নয়ন ভঙ্গিতে রামকে বিদ্ধ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিল অবলাও গোলাপের কাছে বসিল। শ্যামা রান্না ঘরে কি কাজ করিতেছিল। শ্যামা বদ্ধ কালা।

গো। এই মেয়েটী কে জান?

রা। হরি বাবু এনেছেন যাকে সেইতো?

গো। কেমন মুখ দেখেছ?

রা। না—তোমার চেয়ে আর ভাল হবে না। দেখিনা—দেখি।

অবলা লজ্জায় মুখটী অবনত করিয়া রহিল। 'অত লজ্জা কেন' বলিয়া গোলাপ মুখ তুলিয়া রামচন্দ্রকে দেখাইল। রামচন্দ্র সেই কচি লাবণ্য পূর্ণ-ঢলঢলে-পবিত্রতা রচিত মুখ দেখিল।

রামচন্দ্র সে অতুল মুখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যেন অন্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চক্‌ মক্‌ করিল। এ যেন শীতল বিদ্যুৎ। দেখিবামাত্র রামচন্দ্রের মনে হু হু করিয়া পবিত্রতার ঝড় বহিল—রামচন্দ্র যেন পৃথিবীর চারি দিকে স্বর্গের শোভা প্রকাশিত দেখিল। স্বর্গের আলো যেন সেই বালিকা—সেই আলোকে আপনাকে যেন বিশ্বের কৃমির ন্যায় দেখিল—আর সেই গোলাপকে যেন ভয়ঙ্করা রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইল। রামচন্দ্র ইংরাজিতে পড়িয়াছিল Behold

the lillies of the field. এখন সে ভাবটী মনে কত ভাবের উদয় করিয়া দিল। দেখ্ দেখ্ কেমন সতীমূর্ত্তি—বিধাতার মধুর সৃষ্টি কেমন দেখ্—আর কি পাপ করা যায়—আর কি মনে পাপ থাকিতে পারে।

কি ক্ষণে, কি লগ্নে কি দেখিয়া কার মন কিরূপ হয় কে বলিতে পারে। বালিকার সৌন্দর্য্যে কোমলতা ও পবিত্রতার দীপ্তি রামের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল—নইলে ওরূপ হবে কেন? রমণীর রূপে যদি সতীত্বের রূপ ফোটে, তো, সেরূপ দেখিলে, মানুষের সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। সুভাব-স্রোতে পড়িয়া রামচন্দ্র ভাবিতেছে, "অবলা কে? কেন আমি পাপ করি? অবলা আমার ছোট ভগিনী—সহোদরা"। ভাবিতে ভাবিতে রামের হৃদয়ের কোমলতা অশ্রুধারায় পরিণত হইল। রামের সেখানে বসিতে ভয় হইল। গোলাপ যেন রাক্ষসী—যেন বাঘিনী। রাম ভাবে অভিভূত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাম বাড়িতে গিয়া মাকে বিস্মিতভাবে বলিল, "মা—বামুনদের বাড়িতে যে মেয়েটী এসেছে দেখেছ"?

মা। আহা মরি! যেন দুর্গা প্রতিমা।

রা। মা তুমি তাকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখ।

মা। আহা কেউ নেইরে—হরি কুড়িয়ে পেয়েছিল—ডাকাতে নাকি ফেলে রেখে গেছলো।

রা। মা—সেটী তোমার মেয়ে—তুমি তাকে মেয়ের মত দেখ্‌বে—তাকে ওখানে রাখা হবেনা—ওদের বাড়ি বড় খারাপ।

মা। বাড়িতে ওদের ভূতের দৌরাত্ম্য—সেদিন রাত্রে নাকি অবলার কাছে কে এক মিন্সের মত শুয়েছিল—তার পর যে কোথায় গেল দেখ্‌তে পায় নাই।

রা। আমাদের বাড়িতে তুমি এনে রাখ। ওখানে থাকা ভাল নয়।

মা। বামুনের মেয়ে হয়েই যে গোল হয়েছে।

রা। তা না হয় এক জন বামনী রাধুনী রেখে দেব। ওটী তোমার মেয়ে।

মা। তা কাল সকালে এখানে ডেকে আনবো।

রা। ওকে মেয়ের মত যত্ন করবে। যেমন আমি তেমনি অবলা। এটী তোমায় কর্ত্তেই হবে।

হরিদের বাড়ীটী কেমন তা জান তো?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অবলা একটী মেয়ে লোকসঙ্গে লইয়া নিজ গ্রামে যাত্রা করিল। স্বামীর চিত্র আনিবার জন্য, সেই চিত্রে আপনার জীবন সংস্থাপিত করিয়া ভবসংসারে সুখী হইবার জন্য অবলা চলিয়াছে। গ্রাম পার হইয়া মাঠে, আবার গ্রামে, আবার মাঠে এইরূপ গ্রামের পর মাঠ মাঠের পর গ্রাম, পার হইতে হইতে হাসিভরা মুখে অবলা চলিয়াছে;—আবার যদি সমুদয় আশা বিফল হয় এই ভাবনায় কাঁদিতে কাঁদিতেও চলিয়াছে। যাইতে যাইতে বেলা হইল; একটী গ্রামে একটী দোকান পাইল। মেয়ে লোকটী বলিল 'বেলা হয়েছে কিছু খাও না'।

অবলার মন ছবিখানির জন্য—জন্মভূমি দেখিবার জন্য—নিজের বাড়িতে পদার্পণ করিবার জন্য আনন্দে—দুঃখে উন্মত্ত। দুঃখ এই যে মা নাই, বাপ নাই, কেহ নাই; সুখ এই যে ছবিখানি পাইব—স্বামীর মূর্ত্তি দেখিব—সেই ছবি দেখিয়া আবার ছবি আঁকিব,—আবার দুঃখ এই, যদি ছবি না পাই। এই প্রকারে কত কি ভাবিতে ভাবিতে—কখন মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে—কখন শোকে দুঃখে অশ্রু মুছিতে মুছিতে, চলিয়াছে।

মেয়ে লোকটীর বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'আমি খাব না তুমি খাও'—

"পয়সা দাও"

"এই নাও"

"তা আরও ছুটী দাওনা—তুমিও খাও। ছেলে মানুষ, এখনও কতদূর, অসুখ করবে যে"।

"না আমি খাবনা"

অতি কাতর স্বরে অবলা এই কথা বলিল।

মেয়ে লোকটী খাবার কিনিয়া খাইল।

সে অবলাকে খাইবার জন্য অনেক জেদ করিল, অবলা কিছু খাইল না—কথার উত্তর দিল না—কি ভাবিতে ভাবিতে একটী দীর্ঘ শ্বাস ফেলিল।

মে। আর কতদূর?

অ। এই মাঠ.পার। মাঠে যেতে ভয় করে।

মে। কেন গা!

অ। এই মাঠেই আমায় ডাকাতে ফেলেছিল। কথাটী শুনিয়াই মেয়ে লোকটী ভয়ে সিহরিয়া উঠিল, বলিল "ও বাবা! না বাছা—আমি তবে ফিরে যাই" !!

অ। ডাকাত কি আর দিনের বেলা আছে। এমন সময়ে সেই খানে এক বুড়ি বাঁস বনে কাঠ ভাঙ্গিতে ছিল। বুড়িকে দেখিয়া মেয়ে লোকটী ডাকিবামাত্র বুড়ি কাঠের ঝুড়ি কোমরে করিয়া আস্তে আস্তে সেই খানে আসিল।

মে। হাঁগা ঐ মাঠ পার হয়ে যাব, কোন ভয় নেই তো?

বু। ওরে বাবারে—দুপুর বেলা—খবরদার খবরদার।

মে। দেখলে অবলা! তুমি ছেলে মানুষ, দেখ দেখি

অজানা দেশে লোকের অনুরোধে প'ড়ে এলাম। না বাছা আমি যেতে পারবো না।

বু। না না তোমরা যেওনা—মাঠে লেটেরার বড় ভয়—কাল নাকি কাকে মেরে ফেলেছে; বাবারে যেও না—যেও না।

মে। না—মা—আমি তো মেরে ফেল্লেও যাব না। ও যায় যাগ।

বু। তোমরা কোথা যাবে বাছা।

মে। সেনপুর।

বু। যে গাঁয়ে ওলাউঠায় সব মরে গেছে, ওমা! সে গাঁয়ে যে বড় ভয়।

মেয়ে লোকটীকে সে সব কথা কেহ বলে নাই; সে জানিত অবলা বাপের বাড়ী যাবে, সেখানে মানুষ আছে—যত্ন টত্ন হবে। এ সব শুনিয়া তার "আক্কেল গুড়ুম" হইল। সে অবলার দিকে মুখ ভাঙ্গাইয়া বলিল, 'হ্যাগা তাকি আমায় বলতে নেই আগে; কোন শালি তাহলে আসতো। না বাছা আমি যেতে পারবো না—ভূতের পুরীতে নে গে মারবে—অ্যাতভে আর কাজনি; ভালমানুষের মেয়েদের একাজ বটে!

গ্রীষ্মে রৌদ্র প্রখর হইয়াছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে; ধূসর রৌদ্র যেন হন্ হন্ করিয়া ছুটিতেছে। অবলা অবশেষে একলা যাইতেই প্রস্তুত হইল। মেয়ে লোকটীকে বলিল 'আচ্ছা—তুই ওই দোকানে ব'সগে আমি একলাই যাই'।

'তাই যাও মা তাই যাঁও। আমি কাছেই থাকলাম—তার আর ভয় কি'? বলিয়া মেয়ে লোকটী দোকানে গিয়া বসিল।

অবলা মাঠ পার হইতে লাগিল। ২ ঘণ্টার পরে নিজ গ্রামের নিকট গেল। গ্রামের নিকট শ্মশান দেখিল। শ্মশানে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বাপকে যেখানে পুড়াইয়াছিল; সেই চুল্লীর দিকে চাহিয়া কাঁদিল—কাঁদিতে কাঁদিতে থমকিয়া বসিল। দেখিল চুল্লীর পর চুল্লী। আধপোড়া বাঁস, কয়লা, কলসী, সরা, মড়ার মাথা, হাড়, সব গড়াগড়ি যাইতেছে। কোন চুল্লী কয়লাপূর্ণ, তাহাতে আধপোড়া বাঁস—উপরে একটী সরা ঢাকা কলসী—। কোন চুল্লীতে কেবল কয়লা, কলসী নাই—সরা নাই। কোনটার কাছে একটী কলসী উল্টিয়া পড়িয়া আছে। কোন চুল্লীর চারিদিকে লম্বা লম্বা ঘাস উঠিয়াছে—কাহার মধ্যে কাঁটা গাছ জন্মিয়াছে। কোনটীর কাছে বা একটী শিমুল গাছের চারা মাথা তুলিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে অবলা শ্মশান পার হইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। দুই ধারে বাঁসবন; বনের মধ্য দিয়া রাস্তা। রাস্তার কোনখানে মাদুর, কোনখানে বালিস, কোনখানে মড়ার মাথা।

খানিক দূরে গিয়া দেখিল মেটে ঘরগুলির প্রাচীরে ঘাস জন্মিয়াছে—বাড়ির দ্বার খোলা—ভিতর উপর ঘাস পূর্ণ। কোটা বাড়িগুলির কোনটীর ভিতরে একটী কুকুর কোনটীর ভিতর শৃগাল শুইয়া আছে।

অবলা রাস্তার ধারে সেই প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছ তলায় সেই ষষ্ঠী ঠাকুরাণী দেখিল। ঠাকুরুণের ললাটের সিন্দুরের প্রভা নাই। ঠাকুরুণের চারিদিক অশ্বথ পাতায় পূর্ণ হইয়াছে। আগে পূজার কলা দুই একটী পড়িয়া থাকিত—সে

সব কিছুই নাই। দেখিল সেই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর সম্মুখেই শৃগাল কুকুরে মলত্যাগ করিয়াছে—। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর নিকটে অবলা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল;—সেইখানে কত বার আসিয়াছে—কতবার ছোট চুবড়ি করিয়া খইকলা লইয়া সহচরীদিগের সহিত সাধ মিটাইয়া খাইয়াছে। সেই ঠাকুরের তলায় বোন ভোজন হইত। সেই তলায় কত খেলা খেলিত; সেই দেবীকে কত বার প্রণাম করিয়াছে—মা বাপ দাদার জীবনের জন্য কতবার প্রার্থনা করিয়াছে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে অবলা কাঁদিতে লাগিল। গ্রাম নিস্তব্ধ—শ্মশান তুল্য। সেই গাছের উপরে একটী কাক ডাকিতেছে—কা—কা—কা। একটী শকুনী মাথা তুলিয়া বসিয়া আছে। অদূরে দুটী ঘুঘু মাথা নাড়িতে নাড়িতে ঘুরিতেছে।

অবলা মনের দুঃখে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাড়ির দিকে যাইল। বাড়ির দ্বার সম্মুখে। দ্বার খোলা। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবলা দুঃখ-পীড়িত প্রাণে অশ্রু-ভরা নয়নে বাপের বাড়ী—বাপের ভিটা দেখিল। অবলা দেখিল দ্বার-দেশ গাছের পাতায় ভরিয়াছে—দ্বারের কপাটে উঁই ধরিয়াছে—দুদিকের কপাট অবলম্বনে মাকড়সা জাল বুনিয়া জালের মাঝখানে প্রহরীর ন্যায় বসিয়া আছে। অবলা দেখিল বাড়ির ভিতর জঙ্গালে পূর্ণ—তৃণে আচ্ছন্ন। কাঁঠাল গাছ যেমন তেমনি আছে কেবল একটী শালিক বাসা বানাইয়াছে—শালিকটী বাসায় বসিয়া ডিমে তা দিতেছে। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অবলা পাগলিনীর মত বাড়ির ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকিল।

সেই সব কথা—কত বৎসরের কথা—সুখের কথা—দুঃখের কথা—যাহা কখন ভাবে নাই সেই সব কথা কত প্রকারে শোকে কাঁপিতে কাঁপিতে অবলার মনে আসিতে লাগিল। অবলার দুচক্ষু লাল—অশ্রুজলে যেন বন্যায় ভাসিতেছে। ধীরে ধীরে মাকড়সার জাল ছিন্ন করিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল—বালিকা রান্না ঘরের দিকে চাহিয়া মৃতপ্রায় হইল। অবলা রোয়াকে বসিল; শোকে ডুবিয়া, কখন নীরবে কখন সরবে কাঁদিতে লাগিল। "মাগো কোথায় গেলি গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নির্জ্জন গ্রামে অনেক দিনের পরে শোকের অশ্রুজল পড়িল। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, পথ, ঘাট, আকাশ, সরোবর, সেই শোকের কান্না যেন একমনে শুনিতে লাগিল। আম গাছের তলায় রাশি রাশি আম কাঁঠাল গাছের তলায় কয়েকটা কাঁঠাল পড়িয়া আছে। অবলা ঘরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, অমনি যেন যাদুতে পড়িয়া অবলার ভিতরে আর এক নূতন অবলার প্রকাশ হইল। অবলা আপনার হাতে আলতা দিয়া স্বামীর ছবি দেখিয়া ছবি আঁকিয়া ছিল—সেই সব ছবি দেয়ালে এখনও বিলীন হয় নাই। দেখিবা মাত্র অবলার প্রকৃতি কাঁপিয়া প্রথমতঃ কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—শোক দুঃখ প্রবলতম হইয়া উঠিল—তার পরই সে সব একে একে—কোথায় লুকাইয়া পড়িল। [illegible] আকাশে চাঁদ উঠিল—আকাশের মেঘ কাটিল,—চাঁদ পৃথিবীকে জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ করিল। অবলা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। শয্যার উপরে সেই—"ছবি"—অবলার প্রেমাকাশের পূর্ণিমা। সেই ছবির উপরে মাটী, ময়লা

আরশোলা পড়িয়াছে——অবলা পাগলিনীর ন্যায় ছবি অধিকার করিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য জয় করিবার জন্য বেগে ধাবিতা হইল। ছবির কাছে গিয়াই অবলা থামিল—অবলার বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—অবলার স্বামীর আজ মহা বিপদ! সেই ছবির পাশে এক প্রকাণ্ড সর্প শুইয়াছিল—এখন নড়িয়া উঠিল। অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ছবির দিকে চাহিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে থাকিল। কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সাপের কাছে গিয়া সাপকে প্রণাম করিল। তারপর হস্ত প্রসারিত করিয়া ছবি ধরিল—সাপ একবার ফণা তুলিয়া অবলার দিকে চাহিল—বোধ হয় অবলার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোকের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সাপের দয়া হইল, —সাপ অমনি ফণা নত করিয়া চলিয়া গেল। অবলা আনন্দিত প্রাণে হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ধরিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। তখন সেই শোকপূর্ণ গ্রাম শোকপূর্ণ প্রকৃতি অবলার আনন্দে ভরিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মানুষ যখন দুঃখে পড়ে, তখন সে দুঃখে পরিণত হয়; তখন তাহাতে সব দুঃখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়; তখন তার চাহুনি দুঃখের চাহনি; তার স্বর দুঃখের স্বর; তার ভাব ভঙ্গি সবই দুঃখের। আবার যখন আনন্দে পড়ে তখন আবার তাই। অবলা যখন প্রেমের হুকুমে, ভীষণ সর্পকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার হারাণ সাম্রাজ্য—সেই "ছবি" খানি অধিকার করিয়াছিল; তখন অবলার প্রকৃতিকে কাঁপাইয়া, মুখে চখে প্রেমের রাঙা রঙ ফুটাইয়া, উপর্য্যুপরি কয়েকটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। অবলা তখন আপনাকে নূতন ভাবে নূতন উদ্দীপনায় পরিণত করিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তের উপর দিয়া জগতে যে একটা প্রেমের তুফান ছুটিয়াছিল, রূপের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাতে প্রকৃতির বুকে অমৃত-স্পর্শ-জনিত রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। সেই মুহূর্ত্তের পর অবলা আপনাকে ছবিতে হারাইয়া ফেলিল। ছবিময়ী অবলা ছবিখানি বুকে ধরিয়া রোয়াকে বসিল। সেই শ্মশানতুল্য গ্রাম তখন প্রেমিকার কাছে স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হইল। অবলা ছবি দেখিতে দেখিতে সে ছবিতে যেন আপনাকে মিশাইবার জন্য একদৃষ্টে ছবির অনন্ত সৌন্দর্য্য-তলে ডুবিতে থাকিল।

গ্রাম জনশূন্য; নীরবতায় গঠিত; ভীষণতায় রক্ষিত। এমন স্থলে আত্মহারা প্রকৃতিতে প্রেমের-তুফান উঠিল।

অবলা রোয়াকে বসিয়া ছবিখানি কোলে রাখিল। ছবি দেখিতে দেখিতে ভাবিল যেন প্রকৃতই স্বামীর সঙ্গে আছে। সেই ছবি যেন বস্তুতঃ রক্ত মাংস গঠিত। অবলা ছবি দেখিতে দেখিতে হর্ষোৎফুল্ল মনে আপনা ভুলিয়া প্রেমভরে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্বামীর মুখে একটী চুম্বন করিল—সেই চুম্বনের সঙ্গে যেন আপনাকে সেই মূর্ত্তিতে বিসর্জ্জন করিল। তখন অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। তখন কত কোমল ভাব অবলার প্রাণে আসিয়া জমিল; কত আশা, কত আবদার, কত আকিঞ্চন, অবলার প্রাণে বল দিতে লাগিল। অবলার সুখের অশ্রুবিন্দু ছবির উপরে পড়িল। অবলা আঁচলে মুছে; আবার কাঁদে—আবার ছবির উপরে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। অবলার মহাসুখের সময়ে, একটা বিষাদের ছায়া তাহার সুখের ছবিতে পতিত হইল। অবলার মা সেই ছবি কত যত্নে রাখিয়াছিল, আজ অবলার মা নাই। মার কথা ভাবিবা মাত্র অবলার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অবলা দুঃখের স্মৃতিতে বিভোর হইল।

সম্মুখে ছবি, পশ্চাতে অবলার দুঃখ-পূর্ণ পূর্ব্বজীবন একত্রে মিলিয়া বালিকার কোমল প্রাণে চাপ দিতে লাগিল। অবলা তাহাতে অভিভূতা হইল। শোকাভিভূতা বালিকা অশ্রুভরা নয়নে আকাশের দিকে তাকাইল—সেই আকাশ ও গাছপালা সকলের অতীত স্থলে কি এক দেশ আছে; সেই দেশে অবলার মা বাপ ভাই সব যেন স্নেহ পূর্ণ স্বরে রোদন করিতেছে। অবলার কান্না শুনিয়া তাহারা আকাশের ভিতরে যেন গোপনে নীরবে কাঁদিতেছে। অবলা ভাবে অভিভূত হইতে হইতে

যেন তাহাদের কান্না শুনিতে পাইল। অস্ফুট ভাবে গ্রামের নীরবতার অন্তরালে অবলার মা, অবলার জন্য প্রাণ ফাটাইয়া কাঁদিতেছে; আর চারিদিকের আকাশে, চারিদিকের গাছ পালায় যেন সেই কান্নার সুর জড়ান রহিয়াছে। সেই জড়ীভূত ক্রন্দনের সুর যেন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল; অবলা পার্শ্বস্থ আকাশে যেন কাহাকে অনুভব করিল; অবলার মার স্নেহ যেন মাতৃরূপে অবলাকে স্পর্শ করিল; অবলার সম্মুখে যেন অবলার মা আসিয়া দাঁড়াইল। অবলা প্রাণে তাহা বুঝিল; হৃদয়ে স্পর্শ করিল; চোখে দেখিল না।

অবলা সেইভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে অভিভূতা হইল। মুখে আর কথা সরে না; গলার ভিতর টন্ টন্ করিতেছে; কপালের ভিতর যাতনায় যায় যায় হইয়াছে; বুকখানা ফাটিয়া যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ সে সব সহ্য করিয়া অবলা অর্দ্ধস্ফুট শোকস্বরে ডাকিল; "মা"!

অমনি সেই মাতৃস্নেহপূর্ণ আকাশে কে যেন ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "কেন মা"! তখনি অবলার শোক ক্ষুব্ধ বিক্ষোভিত প্রাণের ভিতরে কে যেন উত্তর করিল, "কেন মা"! আবার পত্রাবলীর মাতৃস্নেহভরা সৌন্দর্য্যের ভিতর হইতে কে উত্তর দিল "কেন মা"! সেই প্রত্যুত্তরের ভিতর হইতে একটা স্নেহ-ধারা অবলার প্রকৃতিকে স্পর্শ করিল; অবলা তাহাতে নীরব থাকিল; অবলার চক্ষু ভাবভরে মুদিয়া আসিল; প্রাণ মোহস্পর্শে অসাড় হইল; অবলা মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে কালের শুশ্রূষায় অবলার জ্ঞানসঞ্চার হইল। অবলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। একটা চমক অবলার

মন প্রাণকে জড়াইয়াছিল; সেই চমকের যেন একটা কাল ছায়া প্রকৃতিতে ছড়ান ছিল। সেই চমকে অভিভূতা হইয়া দিশেহারার মত অবলা স্পষ্ট শুনিল; কে যেন বাটীর বাহির হইতে তার নাম ধরিয়া স্নেহস্বরে ডাকিল, "অবলা"!

শুনিবামাত্র অবলা চমকিয়া উঠিল—অবলার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল—অবলা উঠিয়া সেই দিকে ধাবিতা হইল—সেই শব্দ অবলার মার মত। অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে বাটীর বাহিরে গেল। মহাভয় মহাবিপদ সম্ভাবনা থাকিলেও মরা মাকে দেখিতে কার প্রাণের সাধ উথলিয়া না উঠে!

অবলা বাটীর বাহিরে গেল। সেখানে কাহাকেও দেখিলনা কথা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকিল—প্রাণ পাতিয়া থাকিল।—

আবার কে ডাকিল "অবলা"! অবলা পাগলিনীর মত সেই দিকে ধাবিতা হইল। কিন্তু কাহাকেও দেখিলনা—কিছুই শুনিলনা। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে গ্রামের মধ্যে এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিল। একবার বড় পুকুরের ধারে গেল। সে পুকুরের বাঁধা ঘাটে গিয়া—ঘাটের দুর্দ্দশা দেখিয়া অবলা কাঁদিল। ঘাট ঘাসে ভরিয়াছে, স্থানে স্থানে আগাছা জন্মিয়াছে; পুকুরের জল শেহলায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। অবলা ঘাটে বসিয়া পুকুরের চারিদিকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিল; তারপর যখন ভাব গাঢ় হইল তখন চক্ষু মুদিয়া অবনত মুখে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে আস্তে আস্তে সে স্থান, সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িল; মাঠে গিয়া পিছনে ফিরিয়া শ্যামল

বৃক্ষলতাপূর্ণ জন্মভূমির দিকে মাঝেমাঝে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাঠে কিয়দ্দূর গিয়া আবার সেই শ্মশানে উপস্থিত হইল। শ্মশানে পিতৃ চুল্লীরধারে বসিল। কাঁদিতেলাগিল কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুর অন্তরালে পিতৃ চুল্লিপানে নিরীক্ষণ করিয়া পিতৃশোকে অবলা অস্থির হইল। চুল্লীর কাছে তদবস্থায় গিয়া করযোড়ে বলিল, "বাবা! তোমার অবলা—তোমার আদরের মেয়ে আজ তোমায় জনমের মত প্রণাম করিতেছে"।

অবলা গভীর ভক্তিরসহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃচুল্লীকে—পিতার সেই শ্মশান শয্যাকে প্রণাম করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কালের আকর্ষণে অনিচ্ছায় সেইস্থান পরিত্যাগ করিল।

অবলা ছবি খানিকে বুকে ধরিয়া শ্মশানের উপর দিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যাইতে ছিল এমন সময়ে হঠাৎ একটা মড়ার কাঁটা অবলার পায়ে ফুটিল। অবলা টের পায় নাই। অবলার দুর্ভাগ্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

অবলা দুঃখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন মাঠ অতিক্রম করিতেছিল, তখন গাছপালায় একটু একটু সোনালী রঙের রৌদ্র ছিল। অবলা যখন মাঠ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব গ্রামের নিকট পঁহুছিল তখন ধরা পৃষ্ঠ হইতে রৌদ্র মুছিয়া গিয়াছে; রাত্রের কাল ছায়া আকাশে পড়িয়েছে; শৃগাল সকল গভীর স্বরে প্রকৃতিকে তোলপাড় করিতেছে; উইচিঙ্গড়া বাজখাঁই সুরে পাঁচালী আরম্ভ করিয়াছে; পাখী সকল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে।

মেয়ে লোকটী অবলাকে বিদায় করিয়া দিয়া পথের ধারে এক দোকানীর দাওয়ায় গিয়া বসিল। বসিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে একটা সম্পর্ক বাহির করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিল। দোকানী বাধ্য হইয়া একটা ছেঁড়া মাছুর বসিতে দিল। মাগী মাছুরে বসিয়া গল্প করিতে করিতে শুইয়া এক ঘুম ঘুমাইল। তারপর সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অবলার জন্য একটু ভাবিত হইয়া ধীরে ধীরে মাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠের অনেক দূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল—কাহাকেও দেখিতে পাইলনা। খানিক পরে দেখিল কে এক জন নী নী করিতেছে—ক্রমশঃ একটু স্পষ্ট—তারপর একটী বালিকার মত—তার পর অবলার মত—তার পর অবলা। বুড়ির বড় আনন্দ। অবলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো!

কাঁদ্ কাঁদ্ কেন"? অবলা কোন উত্তর দিলনা মুখ হেঁট করিয়া থাকিল।

বুড়ি আবার জিজ্ঞাসিল, "কি আনতে গেছ্লে পাওনি বুঝি? তাই মনটা খারাপ খারাপ"। অবলা বলিল "পেয়েছি—এখন শীঘ্র শীঘ্র চল। রাত হবে।

বু। বলি কি জিনিস্ গা? টাকা কড়ি বুঝি! তা আমাকে দুআনা যেয়াদা দিও। আমি এতক্ষণ তোমার জন্য ছট্ ফট্ করছি মা—আমার কি মনে স্বস্তি আছে—মনে করেছিনু একটু ঘুমাব—ঘুম কি হয় মা! তাকি গয়না পত্র আনলে আমায় দেখাতে আর দোষ কি মা!

অবলা পেটকাপড় হইতে "ছবি" দেখাইল। ওমা! ঐ একখানা ছবির জন্য কি ভূতের পুরিতে গেছলে! আমার সঙ্গে ন্যাকামো কর কেন মা! আমি কি কেড়ে লব। আমায় এমন ভেবোনা মা! গরিব দুঃখী বটে কখনও কারও এক কড়া কড়ির দিকে চেয়ে দেখিনি। রামের মা আমায় জানে।

অবলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বুড়ি! টাকা কি গহনা কোথায় এই দেখ!" বলিয়া বুড়িকে কাপড় ঝাড়িয়া দেখাইল।

বুড়ি তখন গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা'! তা ওই ছবি খানার জন্য তোমার এত হাঙ্গামা! ওতো বাজারে অনেক বিক্রি হয়।

অবলা কিছু বলিলনা। ব্যস্ততার সহিত পথ চলিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা, রাত্রি ৯টার সময়, মেয়ে লোকটীর সঙ্গে, হরিদাসের বাটীতে পঁহুছিল। পথে মেয়ে লোকটী যে অবলাকে একলা ছাড়িয়া দিয়া দোকানে ছিল, সে কথা অবলা কাহাকেও বলিল না। অনেক কষ্টে স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি পাইয়াছে ইহাতে যে কত আনন্দ, কত শান্তি তাহা কি বর্ণনা করা যায়। রাত্রে আহার করিয়া গোলাপের কাছে শয়ন করিলে গোলাপ বলিল 'ভাই! কি ছবি দেখি' ?

অবলা ছবি দেখাইল।

এ্যাঃ—এই ছবি—এর জন্য এত—ও বাবা আমার ওসব ছবি পসন্দ হ'ল না—আরে দূর দূর—ছবিখানা ফেলে দে।

কথাটা শুনিয়া অবলার বড় ক্লেশ হইল—মনের কষ্টে বলিল সব ছবির চেয়ে আমার এই খানাই ভাল লাগে।

গো। আচ্ছা সে আসুগ। খুব সরেশ ছবি একখানা আনতে ব'লবো। দেখি সে দেখে, তুই এখানা ছুড়ে ফেলে দিস কি না। ওর সাহেবের ঘরে না কি ২০০ টাকা দামের একখানা ছবি আছে, সেখানা একবার আনতে বলব।

অবলা আপনার ছবি খানির গোড়ামির জন্য রাগিয়া বলিল সে আমি ছুড়ে ফেলে দেব—এর চেয়ে ভাল ছবি আর নাই।

গো। এ কার চেহারা বল দেখি ? এযে ফটগ্রাফের মত।

অ। যাঁরই চেহারা হ'ক না।

গো। ব'লবিনা? আমি এতক্ষণে বুঝেছি—হো হো হো বুঝেছি—তোর ভাতারের চেহারা বুঝি। অবলা লজ্জাভিভূতা হইল—চোখ দুটী ছল ছল করিতে লাগিল—সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিল।

গো। তা লজ্জা কি? ওমা! ভাতারের চেহারা খানা আনবার জন্য এত কাণ্ড! এক রত্তি ছুঁড়ী বাবা! লজ্জায় যে মরে যেতে হয়! আমাদের ভাতারকে তো গ্রাহ্যই করি না। যা হ'ক ভাই তুই বড় বেহায়া। দেখি দেখি কেমন চেহারা তোর ভাতারের।

বলিয়া চেহারা খানি প্রদীপের নিকট ধরিয়া দেখিতে লাগিল।

অবলা আনন্দের সহিত বলিল 'দেখ দেখি ভাল ক'রে দেখ দেখি; এমন কি কখন দেখেছ—সত্য কথা বল ভাই'—

গোলাপ নাক শিটকাইয়া বলিল 'আ রাম আ রাম—ওমা ওই চেহারা অত ভাল—ওযে গুলিখোরের চেহারা'।

অবলা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল—ইচ্ছা গোলাপকে কেহ আসিয়া কাটিয়া ফেলে। অবলা এমন একদিনও রাগে নাই। রাগের উপরে অবলা দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা ছবি খানি লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। অবলা ভাবিতেছে আর এ বাড়িতে থাকিব না—এই রাত্রেই চলিয়া যাইব'।

ছবি খানির নিন্দা শুনিয়া অবলা একটী অস্থিভেদী যাতনায় ছট্ ফট করিতে ছিল। যাতনায় পড়িয়া কত কি ভাবিতেছে

এমন সময়ে অবলার পা কট্ কট্ করিয়া উঠিল। পায়ে যন্ত্রনার সঞ্চার একটু পূর্ব্বেই হইয়াছিল ছবি দেখিতে দেখিতে অবলা জানিতে পারে নাই। এখন পাটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করিতে লাগিল।

গোলাপ বাহিরে আসিয়া বলিল ওমা! মাথায় ক'রে নে বেড়াবি দেখছি যে।

অবলার রাগ তাল পাতার আগুনের মত ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়াই নিবিয়া গিয়াছে। অবলা আর কিছু না বলিয়া কেবল বলিল ভাই! কিছু মনে করিস্‌নে আমার পা কন্ কন্ ক'র্‌ছে বড়।

গো। কেন বল দেখি?

অ। কি জানি খামকা।

গো। রো'স মাকে ডাকি বলিয়াই গোলাপ খাশুড়ির ঘরের দ্বারে ধাক্কা মারিতে লাগিল। খাশুড়ি শুনিতে পাইয়া বলিল কে গো!

গো। আমি—একবার বেরিয়ে এস।

শা। কেন?

গো। অবলার পায়ে কি হয়েছে।

শ্যামা বাহিরে আসিল। আসিয়া অবলার পা দেখিয়া বলিল পায়ে কি ফুটেছে, তা সকাল হ'ক, ভাল করে দেখা যাবে, এখন সব শুগে যা।

শ্যামা ঘরে খিল দিয়া শুইয়া ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল। অবলা গোলাপের সঙ্গে ঘরে গিয়া শয়নকরিল। গোলাপ ঘুমাইয়া পড়িল। অবলার ঘুম হইতেছে না যন্ত্রনায় কাঁদিতে লাগিল।

রামচন্দ্র অবলার কান্না শুনিতে পাইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। কান খাড়া করিয়া এক মনে শুনিতে লাগিল কান্না লক্ষ্যকরিয়া হরিদাসের বাটীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বাটীর দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, দরজা খোল দরজা খোল, গোলাপ অমনি আসিয়া দ্বার খুলিয়াই দেখিল তারসখের সামগ্রী রামচন্দ্র। চারিদিকে চাঁদের আলো, দুপুর রাত্রি মাঝে মাঝে ককিল ডাকিতেছে, শাশুড়ি মড়ার মত ঘুমাইতেছে অবলা নিজের যন্ত্রণায় অস্থির। স্বামী কলিকাতায়, গ্রাম নিস্তব্ধ এইসব সুবিধার কুলটা স্ত্রী প্রাণের রামচন্দ্রকে দেখিয়া কামাসক্ত হইল। মস্তকের কাপড় আপনি খুলিয়া পড়িল, ক্রমে বক্ষ হইতে কাপড় নামিয়া ভূতলে পড়িল, গোলাপ সেই অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় কামোত্তপ্ত শরীরে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিবা মাত্র রামচন্দ্র রাক্ষসীকে দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, খবরদার তোমার স্বামী আসুক সব বলিয়া দেব।

গোলাপ আবার আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে দেখিয়া রামচন্দ্র দূরে চলিয়া গেল। গোলাপ আর কিছু না বলিয়া অভিমানে রাগিতে রাগিতে অবলার কাছে গিয়া বসিল। অবলা বড় কাঁদিতেছে।

রামচন্দ্র ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল কিন্তু অবলার কাতরতা শুনিয়া আবার ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল হরির বাড়ির দ্বার খোলা। বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গোলাপের দ্বারে আঘাত করিল। গোলাপ দ্বার খুলিয়া, বাহিরে একটু দূরে গিয়া ভূমে শুইয়া পড়িল। গোলাপ ভাবিল রামচন্দ্র অভিমান ভাঙ্গি বার জন্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। রামচন্দ্র গোলাপকে

অগ্রাহ্য করিয়া অবলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরে মিট্ মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া রাম বাহিরে আসিয়া হরির মাকে ডাকিতে লাগিল। গোলাপ রামকে বাহিরে দেখিয়া রামের কাছে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল বলি! অবলাকে পেয়ে আজ আমায় তাচ্ছল্য করলে! রামচন্দ্র ক্রুদ্ধস্বরে জ্বালাতন ক'রনা সরে যাও বলিয়া হরির মার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া হরির মাকে ডাকিল কিন্তু কেহ শাড়া দিল না। রাম আবার অবলার ঘরে গিয়া একটু করুণস্বরে বলিল, কেন দিদি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে আমায় বল? তুমি আমার ছোট ভগিণী—আমি তোমার বড় ভাই। বলিয়া রাম কাঁদিয়া ফেলিল। কান্না সম্বরণ করিয়া আবার বলিল, কেন বোন কাঁদছ কেন? এই করুণ কথা শুনিয়া অবলা সতীশকে মনে ভাবিল। শতীশ যে দিন মরিয়াছে—সে দিন হইতে আর কেহ ওরূপ ভাবে অবলাকে ডাকে নাই।

অবলা চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া চিনিতে পারিল—সেই যে আমার মুখ দেখিয়াছিল। দেখিয়াই অবলা লজ্জায় মুখ অবনত করিল, মাথায় কাপড় দিল।

রাম আবার বলিল, তুমি আমার ভগিনী সহোদরা আমি তোমার বড় ভাই আমার কাছে দিদি তোমার কিসের লজ্জা।

অবলা একটু চক্ষু চাহিয়া দেখিল রাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। দেখিয়া অবলা উঠিয়া বসিল। রাম অনেক কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, দিদি আর তোমারভয় নাই' কি হয়েছে আমাকে বল?

অবলা অবনত মুখে বলিল, "দাদা"! এই বলিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল। অবলা অনেক দিন কাহাকেও দাদা বলে নাই। সতীশ অবলাকে কত আদরের সহিত [illegible] বলিয়া ডাকিত। আজ এই যাতনার সময় কে সেই মধুর স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিয়া বালিকার প্রাণ স্নেহে ভাসাইয়া দিল। অবলা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

রামের হৃদয়ে সেই কাতর স্বর যেন বিষাক্ত তীরের ন্যায় —প্রচণ্ড সংহারক বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। ভাবাবেশে রামের দু চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, জননী। তখন রামের [illegible] ভাসাইয়া অশ্রুধারা বহিল দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত রাম মাকে [illegible] মা! অবলাকে আমাদের বাড়িতে কাল নিয়ে যা'ব। অবলা চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে ঠিক্ তার মায়ের মত কে রামের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তখন অবলার মায়ের শোক অধিকতর বর্দ্ধিত হইল; স্থির নয়নে সেই রামের জননীকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে কাঁদিতে থাকিল।

রাম ধীরে, ধীরে বলিল মা, তোর মেয়ের কাছে ব'স।

রামের মা বলিল 'এদের গিন্নিই কোথা আর বউই কে [illegible]'। অমনি গোলাপ আসিয়া বলিল 'ঠাকুরপো এলো ব'লে আমি বাহিরে গিয়ে ব'সে ছিনু।

রামের মা অঞ্চল দিয়া অবলা অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে আমি তোমার মা আর ওই আমার ছেলে তোমার দাদা! তুমি কাল আমাদের বাড়ি গিয়ে থাক্‌বে। তোমার কিছু ভয় নাই আমার যেমন রাম তেমনি তুমি। কেঁদনা, লক্ষীমা আমার

কেঁদনা—তোমার কি হয়েছে মা কি হয়েছে।

অ। আমার, পা বড় কন্ কন্ ক'রছে।

'পায়ে কি ফুটেছে,—বোস—আমি একটা ঔষধ আনছি, বলিয়া রামের মা বামা, বাহিরে গোলাপকে সঙ্গে লইয়া যাইল। কিসের পাতা আনিয়া তার রস পায়ে লাগাইয়া দেওয়ার পর যাতনা কমিল। অবলা ঘুমাইতে লাগিল।

রামের মা অবলাকে ঘুমাইতে দেখিয়া রামকে বলিল চল আমরা ঘরে যাই আর ভয় নাই—ওলো বউ তুই ঘরে এসে শো। রাম বলিল, 'না মা—আমি আমাদের বাড়িতে চাবি দিয়ে আসি, তুমি থাক আজ আর ঘুমান হবে না।'

রাম বাটীতে চাবি দিয়া আসিলে রামের মা বলিল, বউ তুই অবলার কাছে শুগে যা। আমরা মায়ে পোয়ে বাহিরে শুইগে একটা মাদুর আর বালিস দে।

গোলাপ একটা মাদুর আর বালিস দিল। রাম মার সঙ্গে শুইয়াপড়িল। মা ঘুমাইয়া পড়িল, রামের ঘুম হইল না। পর দিবস ঔষধের গুণে কাঁটাটা আপনি পা হইতে বাহির হইল। অবলা সুস্থ হইল। রামের মা ঘরে চলিয়া গেল। রামও কিছুক্ষণ পরে ঘরে গেল। ঘরে গিয়া রাম মাকে বলিল 'মা তুমি অবলাকে ল'য়ে এস। 'মা বলিল, হরিকে না ব'লে কি আনা ভাল দেখায়। হরি আসুক তাকে ব'লে আনা যাবে। তাহলে ওরাও বাঁচে—ওদের খরচ ক'মে যাবে'।

রাম তাহাতেই স্বীকৃত হইল। কালই রামের কলেজ খুলিবে; রাম আর থাকিতে পারে না। পরদিন কাপড়

চোপড় পরিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিবার কালে 'মাকে বলিল 'মা তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্য কর যে অবলাকে তুমি মেয়ের মত ভাববে; আর হরি এলেই ব'লে আমাদের বাড়িতে আনবে'।

মা ছেলের মাথায় হাত দিয়া তিন বার দিব্য করিল। রাম কাপড় চোপড় পরিয়া ব্যাগ হাতে করিয়া অবলার সহিত দেখা করিতে গেল।

বাড়িতে যাইবামাত্র অবলা দাদাকে বসিতে আসন দিল। রাম বলিল, না দিদি—আমি আর ব'সবো না আমি আজ চ'ললাম; তুমি রোজ আমাদের বাড়িতে মার কাছে যাবে, যখন যা দরকার হবে মার কাছে চাবে—তোমার কিছু ভাবনা নাই—আর আমার মাকে মা ব'লে ডা'কবে'।

অবলা ধীরে ধীরে বলিল 'দাদা কবে আবার আসবে গা'।

রাম বলিল 'আমি রবিবারে আসবো'। বলিয়া রাম বিষণ্ণ মনে কলিকাতায় যাত্রা করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আষাঢ় মাস শনিবার বিকাল বেলা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর আকাশে একটু একটু ছেঁড়া মেঘ রহিল। তাহা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইল। নীল আকাশে তারা ফুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিয়া আষাঢ়ের আকাশে সোণার লাবণ্য প্রকাশ করিল। গাছের পাতায় পাতায় ঘাসের ডগায় ডগায়, জলের ফোঁটায় ফোঁটায় যেন হীরা জ্বলিতে লাগিল। পৃথিবী পৃষ্ঠে চন্দ্রকরের একটা আশ্চর্য্য শোভায় প্রত্যেক পদার্থ ঝকমক্ করিয়া উঠিল। আকাশে মেঘের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্না যেন ছাঁকিয়া পড়িতে লাগিল। ভূতলে ভেক ডাকিতেছে। উইচিঙ্ড়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য গীতি গাহিতেছে। দুই একটা নিশাচর পশু ঘাসের উপরে পদশব্দে এদিক ওদিক ফিরিতেছে। আকাশে বাদুড়েরা উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময়ে শ্মশানের নিকটস্থ বড় রাস্তায় এক ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে পথ অতিক্রম করিতেছে।

মাথায় চাদরের পাগড়ি বাঁধা। ডান হাতে সাদা ব্যাগ। বাম বগলে একটা ছাতা। বাম হাতে এক জোড়া জুতা লইয়া, পার কাপড় আটুর উপরে তুলিয়া, ভদ্র লোক গ্রামের দিকে যাইতে যাইতে থামিল। পথের উপরে ব্যাগ, ছাতি, জুতা রাখিয়া কিজন্য শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইল। শ্মশানে উঠিয়া চমকিত ভাবে দাঁড়াইল। আবার দ্রুতবেগে ধাবিত

হইল। যুবা দেখিল চুল্লি সাজান!—তাহার উপরে মৃতদেহ! একি! যুবা অবাক হইল। প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। তারপর চমকিত ভাবে সেইদিকে ছুটিল। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে যুবার আপাদ মস্তক কম্পিত হইল—বুকে রক্ত যেন জমিয়া গেল। যুবা কাঁপিতে কাঁপিতে চুল্লির নিকটে দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতকে আহুতি দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—হৃদয় ফাটিবার মত হইল। যুবা একদৃষ্টে সেই শবের সুন্দর মুখে সেই মৃতের মর্ম্মভেদী জীবন চরিত পাঠ করিতে করিতে গভীর শোক-বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, সেই খানে বসিয়া পড়িল। আধোমুখে থাকিয়া মর্ম্মগত যাতনাকে চাপিতে চাপিতে যেন একটা প্রলয়ের স্রোতে ভাসিতে থাকিল। তারপর অনেক কষ্টে মুখ তুলিল। শবের আরও কাছে সরিয়া গেল। মৃতের মৃত হাত খানি একবার আপনার অশ্রুপূর্ণ চোখের উপরে ধারণ করিল—সে অশ্রুজল উত্তপ্ত—প্রাণবাহী, কিন্তু হস্ত শীতল—প্রাণহীন। যুবা আবার সেই মৃতহস্ত শোকপূর্ণ বুকের উপরে রাখিয়া তাহাতে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া অধীর হইয়া পড়িল। শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে আকাশের উপরে চাহিয়া বলিল "হা ভগবান"! যুবার প্রাণ যেন সেই জ্যোৎস্না পূর্ণ আকাশ ভাঙ্গিয়া একবার বিধাতাকে দেখিবার জন্য—বিধাতার নিকট হইতে আপনার ভগিনীকে কাড়িয়া আনিবার জন্য উন্মত্ত হইল। কিন্তু তাহাতে প্রাণ ক্লান্ত হইয়া আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল চোখের উপরে সেই মৃত হস্ত স্পর্শ করিয়া অশ্রুজলে তাহাকে ধৌত করিতে করিতে অধোমুখে যুবা—"হা অবলা" বলিয়া

কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব থাকিল। তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন শোকের ঘন আবরণে আচ্ছন্ন হইল। যুবা জগতের অসাড়-তায় ডুবিয়া থাকিল। তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া এক প্রাণে সেই মৃতদেহের পানে তাকাইতে তাকাইতে মৃতহস্ত খানি আপনার বুকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "অবলা"! বোন আমার! তোমার কপালে এই ছিল!!

তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া "ভগবান! আর কেন? আকাশের চন্দ্রতারা সব মুছিয়া ফেল! অবলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৃষ্টির লীলার অবসান হওয়াই ভাল। অবলা যেখানে আমিও সেখানে যাই"। যুবা শোকে বড় অধীর হইল। যুবা ভাবিল যখন অমন অবলার এমন দশা তখন আর এজীবনের প্রয়োজন কি? ভাবিতে ভাবিতে আপনার ব্যাগের ভিতর হইতে কি আনিতে ধাবিত হইল। ব্যাগ খুলিল। একখানা ছুরি বাহির করিল। সেই ছুরির সাহায্যে অবলার পথানুসরণ করিতে উন্মত্ত হইল। তখন যুবার জীবন অবলম্বন শূন্য—আশা শূন্য। একবার জননীর স্নেহমূর্ত্তি কল্পনায় দেখিল—অমনি যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পার্শ্বে সেই লাবণ্যময়ী অবলার সে দশা দেখিয়া আবার প্রাণ শোকে অস্থির হইল। যুবা ভাবিল "সোণার প্রতিমা অবলা আমার ভগিনী—না আরও কিছু অধিক;—আমার জীবন;—না, তাহা অপেক্ষাও অধিক;—অবলা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—এমন অবলা যখন গেল—তখন দেহ ধারণ বৃথা। এই বালিকার পার্শ্বেই প্রাণ বিসর্জ্জন করি"।

যুবা তখন কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যাগটী ও জুতা জোড়াটী দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, ছাতাটী মড় মড় করিয়া

ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছুরিখানি লইয়া শবের নিকট বসিল। বসিয়া অবলাকে নয়ন ভরিয়া জনমের মত দেখিতে দেখিতে বলিল 'ভগিনি! তোমার দাদা তোমার নিকট চলিল' বলিয়া ছুরিখানি গলায় দিতে যাইবে এমন সময়ে রাম দেখিল অবলার হাতটী নড়িতেছে। তখন রাম ছুরিখানি ভূতলে রাখিয়া একদৃষ্টে অবলাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। রাম অবলার নাড়ি ধরিয়া দেখিল, নাড়ি একটু একটু চলিতেছে।

রামের একটু আশা হইল—আশায় বুকটী গুর গুর করিয়া কাঁপিল একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

ক্রমে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল একটু একটু নিশ্বাস বহিতেছে—বুকে হাত দিয়া দেখিল, মৃদু মৃদু নড়িতেছে।

এমন সময়ে বড় রাস্তা দিয়া একখানি পাল্কি হিমপল্লা হিমপল্লা শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। রাম কোন ডাক্তারের পাল্কি মনে করিয়া সেইদিকে ছুটিল। কাছে গিয়া বলিল 'পাল্কি থামাও থামাও'। যে প্রকার ব্যাকুলতার সহিত রাম পাল্কি থামাইতে বলিল, তাহাতে ডাক্তারের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। ডাক্তার বেহারাদিগকে পাল্কি নামাইতে বলায় বেহারারা পাল্কি নামাইল।

রামচন্দ্র ডাক্তারকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। রাম ডাক্তারকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল মহাশয় 'বড় বিপদে পড়েছি রক্ষা করুন'।

ডাক্তার বলিল 'এ কি! মাঠে কি বিপদ'?

রা। আমার একটী ভগিনী শ্মশানে আছে একবার দেখবেন চলুন। আমার আজ বড় বিপদ।

ডা। মারা গেছে আর কি দেখব?

রা। মরে নাই—একটু একটু নড়ছে—আপনি রক্ষা করুন আপনার পায়ে ধরি। বলিয়া রাম ডাক্তারের পা ধরিতে উদ্যত। ডাক্তার বলিল 'পায়ে ধরবেন না—চলুন—চলুন—কোথায় মড়া চলুন'।

রামচন্দ্র ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মড়ার নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তার বলিল 'আপনি কি একলা মড়া এনেছেন নাকি'।

রাম কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল 'আপনি এখন দেখুন পরে সব কথা ব'লব'।

ডাক্তার হাত দেখিয়া—বলিল 'ভয় নাই—চিকিৎসা ক'রলে বাঁচতে পারে'। আমার পাল্কি হ'তে আমার ঔষধের বাক্সটী আনতে বলুন। রাম নিজেই ছুটিয়া গিয়া পাল্কি হইতে ঔষধের বাক্স আনিল।

ডাক্তার একটী ঔষধ বুকে মালিস করিতে বলিল। মালিসের গুণে অবলা এক বার চক্ষু চাহিয়া আবার মুদিল।

ডাক্তার বলিল 'বাঁশের উপর হতে আপনি কোলে শোয়ান'

রাম অমনি ধীরে ধীরে অবলাকে ধরিয়া আপনার কোলে শোয়াইল। অবলাকে ধরিয়া কোলে শোয়াইবার সময় রামচন্দ্র ভ্রাতৃস্নেহের অমৃত-স্পর্শে শিহরিত কলেবরে গদ গদ ভাবে বলিল "অবলা! তুমি মনে জান জগতে তোমার কেহ নাই! সে ভাবস্পর্শে ডাক্তার নীরবে অশ্রু মোচন করিল—

করুণার অমৃতসঞ্চারে বিগলিত প্রাণ হইয়া যুবার হৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইল।

রাম ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে অবলার বুকে মালিস করিতে লাগিল। মালিস করিতে করিতে রাম অবলার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া ডাক্তার আর্দ্রস্বরে বলিল "কাঁদবেন না! ভাল হবে"।

রাম ছুরিখানি অমনি একহাতে ধারিয়া ডাক্তারের দিকে পাগলের ন্যায় তাকাইয়া বলিল "আর যদি ভাল না হয়, এই ছুরি এই গলায় দেব"।

ডাক্তার সমস্ত রহস্য বিশেষরূপে জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিল কিন্তু এ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিল।

অবলা আবার চক্ষু চাহিল। চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিল।

ডাক্তার বলিল 'ভয় নাই'।

রাম আবার কাঁদিল।

অবলা বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া রামের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু মুদিল। রাম অবলাকে চক্ষু মুদিতে দেখিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার বলিল—ভয় নাই কাঁদেন কেন? অবলা আবার চক্ষু চাহিল। রামের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিতেছে 'মার কোলে আছি' ভাবিয়া মৃদু-স্বরে বলিল 'মা ওমা'। রাম বলিল 'অবলা—আমি তোমার দাদা'। অবলার দুটী চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল ঝরিল। ডাক্তরের বেহারা গুলি রাস্তায় পাল্কি রাখিয়া সেই শ্মশানে

আসিয়া জড় হইয়াছে, এমন সময়ে রাস্তা হইতে একজন যুবা পুরুষ, শ্মশানে কিসের গোল হে, বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল। রাম চাহিয়া দেখিল হরিদাস। হরিদাসকে দেখিয়া রামচন্দ্র চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল :—ব্যাপারটা কি?

হ। ব্যারাম হয়েছিল, তারপর ম'রে গেছে ভেবে আমরা পাঁচ জন সৎকার ক'রতে এনেছিলাম। তার পর শ্মশ্মে চ'ড়য়ে দেখি না নড়ছে তাই দান পেয়েছে ভেবে ভয়ে দৌড়ে সব পালিয়ে গেলাম।

একজন বেহারা অমনি বলিল "ডাক্তার মশাই! আপনি চলুন! ও দান পাওয়া মড়া,—মেরে ফ্যালাবে পালাই চলুন!

ডাক্তার বলিল "দূর ব্যাটা; চুপ কর, তোদের দান পেয়েছে"।

তারপর ডাক্তার অবলার হাত দেখিয়া বুঝিল, নাড়ির অবস্থা ভাল। জীবনের আশা আছে। ডাক্তার তখন অবলার ভাষায় বলিল "আর নয়—রোগীকে এখানে রাখা আর ভাল নয়—বাড়িতে ল'য়ে যান। ডাক্তারের এই কথা শুনিবামাত্র রামের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। রাম আশায় বিহ্বল হইয়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। রাম আশ্বাসিত প্রাণে বলিল "তাই আমি কোলে ক'রে ল'য়ে যাই"।

কথাটা শুনিয়া সেই শ্মশানস্থ হরিদাসের ভিতরে খল সাপটা ফোঁস করিয়া উঠিল। হরি দাস শ্মশানে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এবং জানিনা কেন তেমন দুঃখের সময়েও রামের উপর মনে মনে

চটিতেছিল। রাম অবলাকে কোলে করিয়া আপন বাটীতে লইয়া যাইতে চাহে শুনিবামাত্র হরিদাসের রক্তস্রোত উষ্ণতর হইল—নিশ্বাস গরম হইল—দুকান দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। হরিদাস রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল "রামচন্দ্র! উড়ে এসে জুড়ে বসেছ নাকি? কে তুমি?—বলি কে তুমি যে অবলাকে ঘরে ল'য়ে যেতে চাও? আমার অবলাকে আমার দাও—আমি মানুষ পশু নহি। অবলার সেবা শুশ্রূষা করিতে তুমি কে? পাপিষ্ঠ বলিয়াই হরিদাস রাগে ফুলিতে ফুলিতে রামকে মারিতে উদ্যত। বেগতিক দেখিয়া ডাক্তার হরিদাসের হাত ধরিল। হাত ধরিয়া ডাক্তার বলিল "এমন সময়ে রাগা-রাগি কি ভাল! আপনাদের মধ্যে যিনি হন একজন আমার পাল্কি ক'রে রোগীকে ঘরে ল'য়ে যান।"

রামচন্দ্র বিপদে ধৈর্য্য ধরিয়া নম্রস্বরে বলিল হরি বাবু রাগ করছেন কেন? অবলার বড় দুরাদৃষ্ট! এখন আপনি আপনার বাড়িতে ল'য়ে যেতে চান ভালই। চলুন আমিও সঙ্গে যাই।"

তখন রামচন্দ্র ও হরিদাস ধরাধরি করিয়া অবলাকে ডাক্তারের পাল্কিতে শায়িতা করিল। বেহারারা পাল্কি ঘাড়ে করিয়া তুলিল। গ্রামের দিকে চলিল। ডাক্তার সেই মাঠের রাস্তার উপরে পাইচারি করিতে থাকিলেন।

বেহারারা যখন পাল্কি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল তখন রামচন্দ্র ভাবিল হরিদাসের বাড়িতে পাঠানটা ভাল নয়। ওখানে সেবা শুশ্রূষা আদতে হবেনা।" এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র পাল্কির পিছনে পিছনে যাইতেছিল।—পাল্কি যখন রামের বাড়ির সম্মুখে আসিল তখন অবলাকে অপরের

বাড়িতে পাঠান রামের পক্ষে বড় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল—রাম কাতর প্রাণে হরিদাসকে বলিল "হরি বাবু! আপনার বাড়িও যা আমার বাড়িও তা। কাছে এসেছে যখন আমার বাড়িতেই চলুক"। হরিদাস কথার কোন উত্তর দিল না; চুপ করিয়া রাগে ফুলিতে থাকিল। হরিদাসের মৌন সম্মতি লক্ষণ ভাবিয়া রাম বেহারাদিগকে বলিল" পাল্কি এই বাড়িতে ল'য়ে আয়"। কথা শুনিবা মাত্র হরিদাসের রাগ বাক্যে প্রকাশিত হইল উড়ে এসে জুড়ে বসেছ নয়? এতদিন আমি মানুষ করিলাম আর আজ তুমি একটু বুকে মালিস্ ক'রে কিনে ব'সলে নয়? সুন্দরী দেখে পাগল হয়েছ বটে!—পাপিষ্ঠ !! হরিদাসের শেষ কথাটা শুনিবা মাত্র রামের শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ উষ্ণতর হইল, রাম ক্রোধে ফুলিতে লাগিল হাতে ঘুসি বাগাইয়া বলিল "হরিদাস বাবু। মুখ সামলে কথা কবেন। অবলা আমার ভগিনী"।

হরিদাস রামের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বেহারাদিগকে বলিল "পাল্কি বরাবর আমার সঙ্গে ল'য়ে আয়। বলিয়াই হরিদাস দ্রুত বেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু পিছনদিকে চাহিয়া দেখিল বেহারারা রামের বাড়ির সম্মুখে পাল্কি লইয়া দাঁড়াইয়াছে হরি থমকিয়া দাঁড়াইল। বেহারারা পাল্কি ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। "কি ঝকমারি! কি দায়!! এত গের ঘটাতেও আমাদের ডাক্তার বাবু পারেন। এত জানলে কোন্ সালারা আসতো।" বেহারাদের মধ্যে কেহ এই কথা বলিল। তাহারা রামকে ভাল করিয়া জানিত; সুতরাং রামের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। দেখিয়া হরিদাস বেহারা-

দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "পাল্কি ও বাড়িতে ল'য়ে গেলে এই লাথিতে পাল্কি ভাঙিয়া ফেলিব"। বলিতে বলিতে হরিদাসকে উন্মত্তের ন্যায় অগ্রসর দেখিয়া, রাম ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে কাঁদ্ কাঁদ্ ভাবে বলিল "আচ্ছা তোরা ওঁরই বাড়িতে পাল্কি ল'য়ে যা"। বেহারারা তাহাই করিল রাম সেইখানে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে পাল্কির দিকে যতক্ষণ পারিল চাহিয়া থাকিল। রাম সেইখানে দাঁড়াইয়া অবলার দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল। তারপর বাটীর ভিতরে ক্ষিপ্ত প্রাণে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরির সঙ্গে অবলাকে বিদায় দিয়া অবধি রামচন্দ্রের প্রাণে মহাক্লেশ। বাটীতে গিয়া নিদ্রিতা জননীকে উঠাইয়া বিষাদিত প্রাণে সমুদয় খুলিয়া বলিল। রাত্রে জননী অনেক অনুরোধ করিলেও রাম কিছু খাইলনা। চুপ করিয়া আপনার শুইবার ঘরে গিয়া খিল দিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল। রামচন্দ্র প্রদীপের আলোকে দাঁড়াইয়া হৃদয়ের যাতনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ক্রোধের নানা ভাব শরীরের নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। কখনও রাগে কখনও প্রতি হিংসায় ফুলিল। হরিদাসকে শাস্তি দিয়া কোন প্রকারে অবলাকে তখনি গিয়া আনিবার জন্য মনে সাহস বল একত্র করিল;—অবলার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও দুরাদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মাথায় দুই হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ঘর ভাল লাগিল না,—প্রদীপের আলো ভাল লাগিলনা। রাম প্রদীপ নিবাইল। ঘরের বাহিরে আসিল। ঘরে শীকল দিল। চালের বাতায় একগাছা ছড়ি ছিল, সেই গাছা লইয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাটীর বাহিরে গেল। তখন বেশ জ্যোৎস্না। রামচন্দ্র জ্যোৎস্নার আলোকে কর্দ্দমিত পথে অবলার জন্য ভাবিতে ভাবিতে পদচারণা করিতে লাগিল। রাম ভাবিল ওদের বাড়ীর অযত্নে অবলা ভাল হবে না। গোলাপ যেরূপ দুষ্টা মুখরা; হরির মা যেরূপ গণ্ডগোলে তাহাতে অবলার বাঁচা

ভার। ভাবিতে ভাবিতে হরির বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। বাটীর দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া কোন কথা শুনিবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিলনা। হরির মার দুএকটা কথা গোলমেলে স্বরে শুনিল, বিশেষ কিছু বুঝিলনা;—তবে হরির মা অবলাকে আনার জন্ত বড় চটিয়াছে—বাড়ির অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এই প্রকার ভাবের একটা বকুনি উগ্রস্বরে হরির উপর বর্ষিত হইতেছে। শুনিতে শুনিতে দুঃখে রামের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল শোকবেগে প্রাণটা বড় কাতর হইল। রামচন্দ্র নিরূপায়। অবলাকে সে বাড়ি হইতে আনিতে অসমর্থ তাই আপনার যাতনায় আপনি অস্থির। রামচন্দ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে ফিরিল। ঘরের ভিতরে গিয়া অন্ধকারেই আপনার বিছানায় শয়ন করিল। ঘুম আর আসে না। অবলার ভাবনাটা মাথার ভিতরে এমনি যাতনা দিতে লাগিল যে রামের ঘুম আর হয় না।—অনেক রাত্রে অনেক চিন্তার পর একটু সামান্য নিদ্রা হইল—তাহাও স্বপ্নময়ী—কেবল অবলার দুঃখে পূর্ণা। পর দিন প্রাতে রামচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিল। মুখ হাত না ধুইয়া প্রাতঃক্রিয়া না করিয়া ক্ষিপ্তভাবে হরিদাসের বাটীতে যাইল। তখন হরিদাস বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া বাঁধা হুকায় তামাকু খাইতে খাইতে পাইচারি করিতেছিল। একটী যুবা একটী দাঁতন কাটী লইয়া তাহার কাছে বসিয়া দাঁতন করিতে করিতে নানাবিধ মুখভঙ্গি ও দন্তকেলি করিতেছিল। হরিদাস রামকে তাহার কাছে আসিতে দেখিয়া ক্রোধিত হইল। হরিদাস চক্ষু অবনত করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র হরির কাছে গিয়া ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "অবলা—ভাল আছে তো" ? হরি কোন উত্তর দিল না।

রাম আবার জিজ্ঞাসিল "হরি বাবু! রাত্রের খবর কি অবলা ভাল তো" ? হরি তখন রাগে ভারি কুঞ্চিত ভ্রূ মুখ খানা তুলিয়া বলিল "অবলা বাঁচুক আর মরুক, তাতে তোমার কি ? অবলা যুবতী, তুমি যুবা, এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়না" ? হরির ক্রোধ ও শ্লেশপূর্ণ কথায় তেজে রামের রক্ত গরম হইয়া উঠিল ; দাঁতের উপরে দাঁত বসিল ; শীরা সকল স্ফীত হইল। সেই ভাবে রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করিল 'তোমার বাড়ি ভাল নয় সেই জন্ম আমার এত তল্লাস' !!

হরি আরও রাগিয়া বলিল "তুমি আমার সীমানা হইতে দূর হও"—পাপিষ্ঠ ! রাম ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "তুমি থাক একদিন দেখিব"। বলিয়া ছড়িটা ভূমে ঠুকিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

হরি "তোমার যত ক্ষমতা বুঝা যাবে" বলিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের বাটীতে গিয়া অবলা আরাম হইল। এক মাসের মধ্যে অবলা বেশ সারিয়া উঠিল। রোগা গায়ে মাংস গজাইল। রূপ দিন দিন ফুটিতে থাকিল। অবলা চৌদ্দ বৎসরে পড়িল। যৌবন তুলি দিয়া অবলার গায়ে রং ফলাইতে লাগিল। প্রকৃতি যে রং চাঁপা ফুলে মাথায়, যৌবন তাহা অবলার গায়ে মাথাইল। প্রকৃতি যে রং গোলাপ ফুলে মাথায়, যৌবন সে রং অবলার ঠোঁটে মাথাইল। প্রকৃতি যে রং মেঘে মাথাইয়া মেঘকে কাল করে—দিনের গায়ে মাথাইয়া দিনকে রাত্রি করে, যৌবন সে রং লইয়া অবলার চুলে মাথাইল, ভ্রূতে মাথাইল, চোখের পাতায় মাথাইল। প্রকৃতি যে রং মুক্তার গায় মাথায়, যৌবন সে রং অবলার দাঁতে মাথাইল। প্রকৃতি যে রং ভ্রমরের গায় মাথায়, যৌবন তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া অবলার চোখের দুই তারায় মাথাইল। যৌবন সমাগমে অবলার বক্ষদেশ ক্রমে ক্রমে ভারি—ঘন উন্নত হইতে লাগিল। নিতম্ব আরও ঘন হইল, আরও গোল হইল। অবলার রূপের ভিতর রূপ ফুটিতে থাকিল।

পাপিষ্ঠ হরিদাস, সে রূপ যখনি দেখিত তখনি রিপু দংশনে জ্বালাতন হইত;—হরির প্রকৃতি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিত;—বুকের রক্ত জ্বলিয়া উঠিত। হরির উপাদানে কোন সদ্ভাব আসিত না—কু বাসনার ঝড় উঠিত।

হরিদাস কলিকাতায় যাইতে বিলম্ব করিতে থাকিল। আজ যাই, কাল যাই করিয়া ২মাস অতিবাহিত করিল। তার পর মনিবের কড়া চিটিপাইয়া চাকুরি যাইবার ভয়ে ত্বরায় কলিকাতায় যাত্রা করিল।

কলিকাতায় যাইয়া হরিদাসের প্রকৃতিতে একটা বিষম বিপর্য্যয় ঘটিল। হরি বাবুর মনে ভ্রমের বড় বৃদ্ধি হইল। হরি বাবু বাসায় গিয়া, বাসার দাসীকে তার প্রকৃত নামে না ডাকিয়া মাঝে মাঝে 'অবলা' নামে ডাকিতে লাগিল। হরি বাবুর বাসা-ড়েরা হরি বাবুকে তজ্জন্য ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। হরি বাবুর ভ্রম ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। হরি বাবু ভাত খাইবার পর পান খাইতে ভুলেন। কোন দিন আফিসে বিনা চাদরে শুধু জামা গায়েই উপস্থিত হন। আফিসে কাগজে ভুল। আত্মীয়ের নিকট পত্র লেখায় ভুল। হরিবাবু পত্র লিখিয়া নীচে নাম স্বাক্ষর করিতে ভুলেন; কখনও বা পত্র লিখিয়া উপরের ঠিকানা না দিয়া ডাকে দেন; কখনও বা কার্ডের উপরে ঠিকানা মাত্র লিখিয়া অপর পৃষ্ঠা সাদা রাখিয়া পত্র ডাক বাক্সে ফেলেন। ছাতা ভুলিয়া আসেন; কখনও বা বিনা ছাতায় কোন স্থানে গিয়া আসিবার সময় ছাতা খোঁজেন। পাইখানায় গাড়ু ভুলিয়া আসেন, গঙ্গা স্নানে গিয়া গামছা হারাইয়া ফেলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরি বাবুর প্রকৃতিতে আর একটা বিপর্য্যয় ঘটিল। হরি বাবু বড়ই বাবু হইয়াছেন। মাথাটী সর্ব্বদা আঁচড়ান—কেড়িটী সর্ব্বদা টাটকা। গোঁপে আতর দেন, পমেটম, অডিকলম ব্যবহার করেন। ফিন্ ফিনে কাপড় পরেন, আর্শিতে মাঝে

মাকে মুখ দেখেন। হরি বাবুর বন্ধু বান্ধব হরিবাবুকে বিশেষ রূপেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। হরি বাবু কলিকাতায় আসিয়া ১৫।১৬ দিন পরে মনিবের তহবিল ভাঙিল। এক হাজার টাকা হস্তগত করিল। সেই দিনই পোদ্দারের দোকানে গিয়া কয়খানি সোণার গহনা খরিদ করিল। কাপড়ের দোকান হইতে অবলার জন্য ভাল ভাল কাপড় ক্রয় করিল। গোলাপের জন্য কিছু কাপড় কেনাও হইল।

পরদিন শনিবার হরিদাস কাপড় গহনা লইয়া বাড়িতে উপস্থিত হইল। বাড়িতে গিয়া মাকে বলিল—মা! তোমার বউকে বাপের বাড়ি এখনি পাঠাও আমার সম্বন্ধির বড় ব্যারাম। গোলাপকে তৎক্ষণাৎ পাল্কি করিয়া তার বাপের বাড়ি পাঠান হইল। পাঠাইবার পর হরিদাস মাকে চুপে চুপে ডাকিয়া বলিল, 'মা একটা কথা তোমায় এতদিন বলি নাই; এখন বলি;—বল, গোলমাল ক'রবেনা'।

মা। কি?

হ। আমার কটা বে বল দেখি?

মা। সেকিরে! পাগল হলি নাকি! ১টা বিয়ে।

হ। না মা! তুমি তা জান না।

মা। কি বলিস বাপু বুঝতে পারিনা!!

হ। তোমায় ব'লবোনা।

মা। কি বল—আমায় বলবি তার ভয় কি?

হ। ব'ল্লে, যা ব'লবো তাই ক'রবে?

মা। তুই আমার একটী ছেলে, তুই যা ব'লবি তা ক'রবো না? কত তপস্যা ক'রে তোকে পেয়েছি।

হ। আচ্ছা—অবলা তোমার কে বল দেখি?

অবলা ঘরে, ঘুমাইতেছে কিছু জানে না।

মা। আমিও তা ভেবেছিনু—আহা অমন সুন্দর সুধীর বউ কি আর আমার কপালে হবে।

হ। হ্যা মা। আমি বে ক'রে এনেছি।

মার বড় আনন্দ হইল। গোলাপ বড় দুষ্টা তাহাকে লইয়া ঘর করা বড় দায়—গোলাপের চরিত্র খারাপ। শাশুড়ি বলিল, 'বাঁচ্‌লাম আর সে আবাগীর মুখ দেখবো না। তা বাবা তুই এতদিন আমায় বলিস্‌নি কেন? শাঁক বাজাই রোস; পাঁচ বাড়ির লোক ডাকি—বরণ করি।'

হরিদাস বলিল এই না দিব্য ক'রলে কাকেও ব'লব না—আবার ও কি? যদি বল তো বিষ খেয়ে ম'রবো।

মা। সে কিরে? অমন বউ নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ক'রবো না।

হ। সে এখন থাক, ৫।৬ দিন বাদে হবে। তোমার বউ সে দিন রোগথেকে উঠেছে—একটু সুস্থ হ'ক তার পর হবে। আর একটা কথা আছে তোমার এ বউকে কোন কথা ব'ল না। কেবল তোমায় দেখে মাথায় কাপড় দিতে বলবে।

মা। হাঁরে মাথায় কাপড় দেয় না কেন বল দেখি?

হ। আমি বারণ ক'রে দেছিনু। আর সহরে অনেক দিন ছিল কিনা! তা এবার আমি মাথায় কাপড় দিতে ব'লে দেব।

হরি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল অবলা অঘোরে ঘুমাইতেছে, অবলার সে শোভা দেখিয়া হরি মনে মনে ভাবিল, যে ফাঁদ

কেঁদেছি এ আর এড়াবার যো নাই।' পরে অবলার হাত ধরিয়া টানিবা মাত্র, অবলা দেখিল সামনে হরি; অবলা মহা লজ্জায় জড়িতা হইল। 'মাথায় কাপড় দাও লজ্জা যে নাই' আমরা তোমার শ্বশুরের কুটুম তা কি মা তোমায় বলে নাই। হরি এই কথা বলিবামাত্র অবলা আরও লজ্জায় জড় সড় হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। হরির মা ঘরে আসিয়া বলিল 'এই তো চাই—বউ মানুষ ঘোমটা না দিলে লোকে নিন্দা করবে যে।'

অবলা কিন্তু সর্ব্বদাই মাথায় কাপড় দিয়া থাকিত তবে ঘোমটা দিত না বটে। অবলা ভাবিল এরা তবে সত্যিই শ্বশুরের কুটুম;—ভাবিয়া বড় লজ্জিতা হইল।

অবলা দুর্ভাগ্যবশতই হউক, আর অধিক লজ্জার দরুণই হউক সে দিন হইতে ঘোমটায় মুখ ঢাকিতে লাগিল। ইহাতে হরির একটী অসুবিধা এই যে অবলার সে মুখ আর দেখিতে পায় না, সে কবরীর শোভা দেখিয়া উন্মত্ত হইতে আর পারে না। যাহা হউক হরি ভাবিল, আজ রাত্রে মা নিজে এখন আমার কাছে শুইয়ে দেযাবে। এই আশার কুহকে পড়িয়া হরি কখন মাথায় পমেটম মাখিতেছে, কখন গোঁপে আতর লাগাইতেছে, কখন রুমালে ঘাম মুছিতেছে, কখন দর্পণে মুখ দেখিতেছে—কখন গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতেছে—কখন আপনি বিছানাটী ঝাড়িতেছে, তাহাতে ফুল সাজাইতেছে—কখন ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিয়া অবলার কাছে পাইচারি করিতেছে।

অবলা ঘুম হইতে উঠিয়া গোলাপকে দেখিতে পাইল না।

গোলাপ কোথা গেল এই ভাবিতে লাগিল। শ্যামার সহিত আজ কথা কহিতে লজ্জা হইতেছে।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। হরিদাস মাকে ডাকিয়া বলিল 'মা দেখে যাও কি এনেছি।' বলিয়া গহনাগুলি দেখাইয়া বলিল এগুলি সব পরিয়ে দাও।

শ্যামা বলিল 'আহা যেমন বউ তেমনি গহনা'। অবলা শুনিতে পাইল।

শ্যামা গহনাগুলি লইয়া গিয়া অবলাকে বলিল 'মা এস মা এস—দেখ দেখি কেমন তোমার গহনা হ'য়েছে এস প'রবে এস।'

অবলা আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা একে একে গহনাগুলি অবলাকে পরাইয়া দিল। অবলা ভাবিল 'এরা আমায় আপনার মেয়ের মত স্নেহ করে আমি এদের ঋণ শুধতে পারবোনা। অবলা গহনা পরিল বটে কিন্তু সেজন্য মনে আনন্দ হইল না।

হরি সন্ধ্যা বেলা মাকে বলিল 'মা আমি এখন এক জায়গায় যাই আসিতে রাত্রি হবে তা যতক্ষণ না আসি তোমরা দুজনে আমার বিছানায় শুয়ে থেক। আমি অবলার জন্য এক জোড়া ভাল কাপড়ও আনিব। অবলা ভাবিল 'আমায় এরা এত ভাল বাসে। পরের বাড়িতে এত যত্ন তো দেখি নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

তুমি যাহাকে প্রাণের মত ভালবাস তাহার যদি দূরে কোন বিপদ হয়, তোমার অন্তরাত্মা তাহা জানিতে পারিবে। তখন তোমার কাজ ভাল লাগিবে না, কাজে ভুল হইবে। আহার ভাল লাগিবে না—মনের চঞ্চলতা বশতঃ হয়তো হাতের আঙ্গুল কামড়াইয়া ফেলিবে অথবা জীবটাকে দাঁতে নিষ্পেষিত করিয়া আলাতন হইবে। যদি পথ হাঁটিতে থাক হোঁচট খাইবে। যদি কিছু লিখিতে থাক অনেক ভুল হইবে, লেখার মাঝে মাঝে অনেক হরপ তোমায় কাটিতে হইবে। তখন অন্তরাত্মা যেন তারে খবর পাইয়া পাগলের মত হইবে—দাড়াইয়া বসিয়া খাইয়া সুখ হইবে না—মনটা সর্ব্বদা উদাস হইয়া থাকিবে—কখন বা বিনা কারণে দুই একটা দুঃখের ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকিবে, ভাল বাসার ইহা নিশ্চিত পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামচন্দ্র বাড়ির সম্মুখের মেটে রাস্তায় বেড়াইতেছিল—অবলার কথা ভাবিতেছিল; হরির বাড়িতে হয়তো কত তার ক্লেশ হইতেছে ভাবিয়া মনে মনে যাতনা অনুভব করিতেছিল। হঠাৎ মনের যাতনা বাড়িয়া উঠিল—মন বড় চঞ্চল হইল। আর পথে বেড়ান ভাল লাগিল না—অন্যমনা হইয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রদীপ জলিতেছিল—রামের মা দাওয়ায় বসিয়া হরি নামের মালা

জপিতেছিল বাড়ির বিড়াল দাওয়ার ধারে বসিয়া হাই তুলিতেছিল।

রামচন্দ্র ঘরে গিয়া প্রদীপের আলোকে বসিয়া একখানা বই পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিল—কিন্তু তাহা আর ভাল লাগিল না। খোলা বইএর উপরে হেঁট মাথায় চোখ মুদিয়া আবার অবলার বিষয় ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে মনটা বড়ই চঞ্চল হইল—বিরক্তির সহিত রামচন্দ্র বইখানা মুড়িয়া ফেলিল। পার উপরে পা রাখিয়া আঁটুটা নাড়িতে নাড়িতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল—ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে ছোট খাট দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিল। তাহাও ভাল লাগিল না—উঠিয়া দাঁড়াইল—বিছানায় গিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আরও ভাবিতে লাগিল। অবলার জন্য প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল—হৃদয় স্নেহে গলিয়া গেল—রামের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। রাম ভাবিল আজ মন এত খারাপ হইল কেন? এক দিনও তো এরূপ হয় নাই—আবার ভাবিল—না ওসব ভাবিব না—ভাবিয়া মিছা কষ্ট পাওয়া—মন স্থির করিয়া অধ্যয়ন করি। রাম আবার ম্লান মুখে পুস্তকের কাছে গেল একখানা বই খুলিল। খুলিয়া খানিকটা পড়িল। তাহা ভাল লাগিলনা—পাতা উল্টাইয়া এক যায়গায় দুই পংক্তি পড়িল;—ভাল লাগিল না, বই মুড়িল। প্রাণের ভিতর চড়াৎ করিয়া একটা ভাবনা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, রাম ঘরের বাহিরে আসিল—দাওয়ার ধারে আসিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিল—অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র চক্‌মক্‌ করিতেছে, তাহা দেখিয়া

রামের মনে অবলা স্নেহ প্রবলতর হইল, অবলাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। রাম চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছে হঠাৎ প্রাণ মন অবলাকে দেখিবার জন্য চঞ্চল হইল।

রাম মনের চঞ্চলতা দমন করিবার জন্য যত্ন করিল। রাম মনকে বুঝাইল, হরির সঙ্গে আমার ঝগড়া—আমি তার বাড়িতে কি প্রকারে যাব?—যাবনা। মন বুঝিল না, মন অবলার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল—একটা আকর্ষণে রামের প্রকৃতি হরির বাড়ির দিকে যেন চলিতে থাকিল। মনের সেই ঝোঁকে পড়িয়া, রাম চমকিত হইয়া ভাবিল, অবলার আজ কোন বিপদ হবে নাকি? রামের সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—শিরায় রক্তস্রোত দ্রুত বহিল—চক্ষু আরক্ত ও সজল হইল—হৃদয়ে আকস্মিক সাহসের সঞ্চার হইল। রাম আবার ভাবিল '—এ কি? সত্যই কি অবলার বিপদ হবে? রামের হৃদয়ে দুঃখের উচ্ছ্বাস উঠিল। রাম ভাবিল—তা হতে পারে। পাপিষ্ঠ হরি যেখানে—রাম আর ভাবিতে পারিল না—রামের হৃদয়ে ভয়ানক যাতনা হইল—রাম চক্ষু মুদিয়া থাকিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে অস্থির হইয়া বাটীর বাহিরে গেল—মনের যাতনায় এদিক ওদিক পদচারণা করিল, দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে ভাবিল 'আমি পাগল হলাম নাকি'? হরির বাড়িতে যাব নাকি? না যাবনা—গিয়া কাজ নাই—মনে ওরকম বোধ হয় অনেকেরই হয়—ওসব মনের খেয়াল। ভাবিয়া রাম আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। মার অনেক অনুরোধে পড়িয়া ভাত খাইতে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে দুই এক গ্রাস উদরস্থ করিল—হঠাৎ একটা আঙ্গুল কামড়াইয়া ফেলিল—ভাল খাওয়া

হইল না। আঁচাইয়া শয়ন করিল। শয়ন করিয়া ভাবিতে থাকিল—ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রার মত আসিল অমনি কে যেন অবলার সতীত্ব নষ্ট করিতে যাইতেছে দেখিয়া চমকিত ভাবে ক্ষিপ্তের ন্যায় রামচন্দ্র উঠিয়া বসিল। রাম কাঁদিয়া ফেলিল রামের হৃদয় রাগে ফুলিতে লাগিল—দুঃখে ফাটিতে থাকিল রামের গলদ্ঘর্ম্ম হইল দুঃখে রাগে ভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকিল। রাম রক্তিম সজল নেত্রে দেওয়ালের দিকে চাহিল—একখানা পুরাতন তরবার দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহা বেগে গিয়া ধরিল—এই তরবার লইয়া আজ একবার হরির বাড়ীতে যাই অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে—আমি অবলার জন্য মরিতে প্রস্তুত—এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতবেগে পাগলের মত রাম মাকে কিছু না বলিয়া হরির বাটীর দিকে যাত্রা করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর হরি বাহিরে গিয়া মদ্যপান করিল। অবলা ভাত খাইল। শ্যামা জল খাইয়া অবলাকে লইয়া সেই হরির বিছানায় শয়ন করিল। অবলা ঘুমে অচেতন শ্যামা ছেলের জন্য জাগিয়া আছে। ছেলে আসিয়া ডাকিল 'মা' ছেলে নেসায় টলিতেছে। মা ঘর খুলিয়া দিল।

মা। ভাত এনে দি—খা।

হ। না মা, মা না মা মা ভাত খাব না।

মা অনেক জেদ করিল, হরি ভাত খাইতে স্বীকার করিল না। মা বলিল, তবে ঘরে গে শো। বলিয়া শ্যামা নিজের ঘরে গিয়া খিল দিল। সুন্দরী বউ হইয়াছে—শ্যামার মহা আনন্দ।

সরলা অবলা সংসারের কুচক্র বুঝিত না। হরিদাস যে তাহার সর্ব্বনাশের যোগাড়ে আছে তাহা আদতে অনুভব করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে যে হরিদাস হস্ত চুম্বন করিয়াছিল অবলা তাহা ভুলিয়াছিল—।

হরি ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিল, ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিল। ঘরের ভিতরে মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে—বিছনায় আতরের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে, হরিদাস নেসায় উন্মত্ত হইয়াছে—আর সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া যুবতী শয্যায় শায়িতা। সেই মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তিতে সেই সব অলঙ্কার। অবলার হাত পা মুখ সবই পৃথিবীতে অপূর্ব্ব অলঙ্কার; তাহাতে সেই

আলঙ্কারের উপরে অলঙ্কার। হরিদাস দেখিল অবলা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে—মাথার কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে—বক্ষের কাপড় চ্যুত হওয়ায় নবীন কুচযুগল নিশ্বাসে আন্দোলিত হইতেছে। হরিদাস নেশায় উন্মত্ত হইয়া কাছে দাঁড়াইয়া কামান্ধ হইয়া একদৃষ্টে অবলার নিশ্বাস কম্পিত উন্নত বক্ষে অপনাকে হারাইতে হারাইতে, উন্মত্তের ন্যায় সেই গোলাপী ঠোঁটে চুম্বন করিতে উদ্যত,—এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কাহার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত তাহার পৃষ্ঠে যমের অঘাতের ন্যায় পতিত হইল। অমনি হরিদাস, "বাবা গো" বলিয়া ভূমি তলে লুণ্ঠিত হইল। সেই গোলমালে অবলা জাগ্রত হইল—সিহরিয়া উঠিল;—সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য তরবার হস্তে ভীম মুর্ত্তিতে রামচন্দ্র দণ্ডায়মান। অবলা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রামচন্দ্র তখন বীরের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিল "অবলা"! আজ তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই তরবার আনিয়াছি। আমার সঙ্গে এস। সমস্ত গহনা খুলিয়া ওই খানে রাখ। এ নরকে আর থাকিও না। হরি তোমার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু কার সাধ্য ভাই থাকিতে ভাই এর সম্মুখে ভগিনীকে স্পর্শ করে। ভগিনি! কিছু ভয় নাই। যদি বল—এই তরবারে পাপিষ্ঠের মস্তক চ্ছেদন করি অথবা নিজের মাথা এই তরবারে কাটিয়া ফেলি।

রামের শব্দ শুনিয়া হরির মা শ্যামা ক্ষিপ্তার ন্যায় "কিও" "কিও" বলিতে বলিতে সেই ঘরে উপস্থিতা হইল। শ্যামা—কাণ্ড—দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিল "কে কোথায় আছ এসগো। সর্ব্বনাশ হ'ল। রেমো আমার ছেলেকে খুন ক'রে ফেল্লে। বাটীর পিছনে চৌকিদার যাইতেছিল খুনের কথা

শুনিয়াই সরিয়া পড়িল। আর কেহ শুনিলনা—আসিলনা রাম অবলার গা হইতে গহনা খুলিয়া দিয়া বলিল, "চল ব'ন আমাদের বাড়ি চল"। অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে দাদার সঙ্গে চলিল। অবলা রামের সঙ্গে যায় দেখিয়া শ্যামা আবার একবার চীৎকার করিল, "ওগো তোমরা কে কোথা আছ শীঘ্র এস। রেমো আমার বউ বার ক'রে নিয়ে গেল।" অবশেষে ভূতলগত হরির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"হরি! ও হরি! ওঠনা! বউ যে কুলে কালি দিলে। হরিদাস নেশার ঘোরে উত্তর দিল—"কালি—কালি—তা—তা দোয়াতে ধ'রে রাখনা বা বা—গো বেটী।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল—যে ভীষণ নরক গলিত কুষ্টময় হস্ত প্রসারণ করিয়া স্বর্গকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; সে ঘটনা যদিও অবলাকে প্রকৃতপক্ষে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই;—সেই রাক্ষসের গরলময় নিশ্বাস যদিও অবলাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি হিন্দু সতীর হৃদয় এরূপ স্বর্গীয় উপাদানে বিরচিত যে অবলা সে বিষয়ের স্মরণে—আপনার সম্মুখে সেই দৃশ্যের উপস্থিতিকে আপনারই পাপের ফল বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে অবলা যাইতেছে। অবলা যেন কি এক নরকে পা ফেলিতে ফেলিতে যাইতেছে। অবলার হৃদয়ে নরকের ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত—সমস্ত হৃদয় যেন কিসের চাপে ভারি, মাথার উপরে যেন পাপের পর্ব্বত চাপান—পথের চারিদিকে গাছপালা সব যেন দুঃখ—শোক ও কলঙ্কে আবৃত। মাথার উপরের আকাশ যেন অবলাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এত বিষম ভাব, তার উপর তদ্রূপ ভয়—তদ্রূপ লজ্জা। ভয়ে লজ্জায় অবলা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রামের বাড়ীর ভিতরে উঠানে পঁহুছিল। রামের মাকে কি প্রকারে মুখ দেখাইবে ভাবিয়া ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে পাগলের মত বসিয়া পড়িল। রাম দেখিয়া বড় ভয় পাইল। রাম

চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিল। রামের মা ঘুমাইতেছিল হঠাৎ জাগ্রত হইয়া আলোক সহিত ব্যাস্তভাবে সেইখানে আসিল। আসিয়া সব শুনিতে শুনিতে অবলার সুশ্রুষা করিতে লাগিল। সুশ্রুষার গুণে অবলার মন একটু প্রকৃতিস্থ হইল। অবলা রামের মার মুখের দিকে চাহিল—অমনি দুটী স্রোতের ন্যায় দু চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। কাছে আলো জ্বলিতেছে। অবলার কাছে রাম ও তার জননী। অবলার কান্না দেখিয়া রামচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি! তুমি কাঁদ কেন? আর কাঁদিওনা—তোমার কিছু ভয় নাই। ইহা শুনিতে শুনিতে অবলা আরোও কাঁদিতে লাগিল। রামের মাও আঁচলে আপনার চক্ষু মুছিল।

যখন মা মরিয়াছিল, যখন সেই ভীষণ দুরবস্থায় পড়িয়াছিল তখন অবলা এরূপ কাঁদে নাই। কাঁদিয়াছিল বটে কিন্তু সে কান্নার ভিতরে এত তীব্র জ্বালা ছিল না। এখন অবলার অস্তিত্বের ভিত্তিকে কম্পিত করিয়া যেন যন্ত্রণা বহির্গত হইতে লাগিল। অবলা—কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছে, 'আর এ জীবন রাখিবনা'—হায়! আমার কপালে বিধাতা এত লিখিয়াছিলেন!! স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল!!'

অবলা আবার ভাবিতেছে, "আমি আর সে নাম লইবার উপযুক্ত নই; সে ছবি কই, সে ছবি কই! অবলার মাথায় বাজ পড়িল—অবলা উন্মাদিনী হইল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল "আর ছবি পাইব না—যদি পাই তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিব না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবলা যাতনায় অস্থির হইল। রামের মা অবলাকে আপনার কাছে শুয়াইয়া

কত সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। অবলা সে রাত্রে ঘুমায় নাই, কেবল কাঁদিতে লাগিল। অবলা—কখনও শুইয়া কাঁদিল কখনও বসিয়া কাঁদিল। অবলা অন্ধকারে আপনার দুঃখ চিন্তায় অধীরা হইতে থাকিল। যাতনার ঐকান্তিকতায় কখন বালিসের কাছে মাথা রাখিয়া অন্ধকারের ভিতরে ভীষণতর অন্ধকারে ডুবিতে থাকিল। এইরূপে বিছানায় বাসিয়া শুইয়া এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল।

রামচন্দ্র অবলাকে আপন বাটীতে আনিয়া কৃতার্থ হইল। রামের মা অবলাকে মেয়ের মত যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিল। কিন্তু অবলার আর মনে সুখ নাই। রাম, রামের মা, অবলার ব্যথা বুঝিয়া কত বুঝাইতে লাগিল; কিন্তু অবলার মন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। মানুষ নরহত্যা করিলে যে প্রকার হয়; বিষপান করিলে যে প্রকার হয়; অবলা সেইপ্রকার হইল।

ক্রমে বেলা হইল। রাম কোথায় গেল। রামের মা রাঁধিতে বসিল। অবলা রামের মার কাছে বসিয়া বসিয়া কুটনা কুটিতে কুটিতে ভাবিতেছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে আর মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে। অশ্রুবিন্দু ঝরিতে ঝরিতে হাত হইতে হঠাৎ শোণিত ধারা ঝরিল। আহা! বালিকা অন্য মনে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে—কিন্তু অবলার চেতনা নাই—মন কোথায় গিয়াছে। রামের মা সহসা দেখিতে পাইয়া বলিল 'ওমা কি করলে—হাত গেছে যে'। বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অবলার হাত ধরিয়া ফেলিল। অবলার কাছে আজ সে বিপদ বিপদই নহে। হাতে জলের পাটি বাঁধিয়া দেওয়ায় রক্ত বন্ধ হইল।

রামের মা অবলার সহিত কথা কহিতে লাগিলঃ—

আমাদের বাড়িতে থাকিতে কি তোমার লজ্জা করে?

'না' বলিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল।

কেন? ওকি? অত কান্না কি ভাল। আমি তোমার মা ভয় কি?

অবলা কান্নার বেগ একটু কমাইয়া কম্পিতস্বরে বলিল, 'আমার কিছু ভাল লাগে না, আমার মা বাপের জন্য বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে; আমার স্বামী কোথা আমি তাঁর কাছে যাব।

অবলা গভীর যাতনায় প্রাণের আবেগে এই কথা বলিয়াই অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। তা ভালইতো, তোমার স্বামীর অনুসন্ধান রাম কলিকাতায় গিয়া লইবে, তার জন্য ভবনা কি?

এসব শুনলে তিনি আমায় হয়তো কেটে ফেলবেন—তা কাটেন ভালই তাহাতে আমার ভাল হবে' বলিয়াই অবলা আপনার জীবনে এক নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল—অবলা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। অবলার স্বামির জন্য যে ভালবাসা ছিল তাহার কিছু, মানসিক আবেগের বশবর্ত্তিনী হইয়া অবলা প্রকাশ করিল।

তোমায় কাটবেন কেন? এমন লক্ষ্মী তুমি মা তোমার মত মেয়ে কি আর আছে?

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় নাড়িয়া বুঝি কি মনের ভাব প্রকাশ করিল এবং চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া কয় বিন্দু অশ্রুজল ফেলিল।

এমন সময়ে রামচন্দ্র অসিয়া বলিল 'মা! আমায় এখনি [illegible] বাড়ি যেতে হবে। আমার ভয়ানক বারাম।

রামের মা চমকিত হইয়া বলিল 'মামার ব্যারাম! কি ব্যারাম রাম! রাম বলিল 'শুনিলাম নাকি বিকার'।

রামের আর থাকা হইল না। তাড়াতাড়ি দুটি খাইয়া 'মা! অবলা রহিল দেখিবে' এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

রাম চলিয়া যাইলে রামের মা অবলাকে বলিল 'মা রান্নার যোগাড় করেছি দুটি রেঁধে লও'।

অবলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'না'।

রামের মা বলিল 'সে কি'! না খেয়ে মারা যাবে যে মা!

কি করিবে অনেক অনুরোধে পড়িয়া অনিচ্ছায় অবলা দুটী চাল আধসিদ্ধ করিয়া খাইল।

খাওয়া দাওয়ার পর একপার্শ্বে বসিয়া অবলা ভাবিতেছে:— আমি এখানে থাকিব না। লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লোকের সহিত কথা কহিতে লজ্জা হয়। হঠাৎ সেই ছবি মনে পড়িল অমনি এক স্বর্গীয় তেজ অবলার প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠিল। অবলা একটা যাতনায় অধীর হইয়া কিয়ৎকাল স্পন্দহীন হইয়া থাকিল। তার পর আবার ভাবিল, "ওদের বাড়িতে সেই ছবি আছে। ওদের বাড়ী তো নরক। নরকে সে ছবি যখন ফেলিয়া আসিয়াছি তখন আমা অপেক্ষা পাপিয়সী আর কে আছে? আমার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে আমার যে অপমান করিয়া আমার স্বামির অপমান করিয়াছে—তাহাকে আগুনে জীবন্ত পুড়াইলেও আমার রাগ আমার দুঃখ যাবে না"। ভাবিতে ভাবিতে অবলা প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিল। আবার ভাবিল, "পাপিষ্ঠকে আমি গুরুর ন্যায় ভাবিতাম, দেবতার ন্যায় মনে করিতাম;"—অমনি যেন একটা আগুনের

স্রোত অবলার হৃদয়, প্রাণ পুড়াইতে থাকিল ;—নিশ্বাস ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ভাবিতে ভাবিতে অবলা কখনও ক্রোধে কাঁপিতেছে, দুঃখে কাঁদিতেছে। অবলা বরাবর বড় ভীতু ছিল ; কিন্তু আজ ভয়ানক সাহস, ক্রোধ নারীহৃদয়কে বলীয়ান করিতেছে। অবলা রাগে, শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভাবিতেছে, "ছবিখানিকে—আমার প্রাণটীকে ওদের নরক হইতে আনিব। যাই এখনি আনিতে যাই। যদি গিয়া না পাই। যদি পাপিষ্ঠ আমাকে দেখিয়া আবার উন্মত্ত হয়। যদি ছবি না দেয় তাহা হইলে কি করিব? সেই পাপিষ্ঠের সম্মুখে হয় নিজে প্রাণত্যাগ করিব, নতুবা যে কোন প্রকারে পারি তাহার মুণ্ডপাত করিব"। এই ভাব হৃদয়ের ভিতরে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বালিকার শিরায় শিরায় বিদ্যুত-স্রোত প্রবাহিত করিল, রমনীর হৃদয়ে বীর পুরুষের উৎসাহ ও সাহস মদিরা ঢালিয়া দিল। অবলা বসিয়াছিল, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল ; এদিক ওদিক চাহিল ; চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সতীত্বাগ্নির তেজ চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। অবলা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার চারিদিক পূর্ণ করিতেছে। রাস্তায় একটী কুকুর শুইয়া আছে। রাস্তার ধারের একটী ডোবায় একটি বৃদ্ধ ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছে। অবলা দ্রুত-বেগে অগ্নিময়ী মূর্ত্তিতে হরিদাসের বাটীর দিকে ধাবিত হইল। বাটীর দ্বারে পঁহুছিল—একবার দাঁড়াইয়া কি ভাবিল—ভিতরে প্রবেশ করিল,—হরিদাস বাটীতে ছিল না ; হরিদাসের মা রোয়াকের একপাশে বসিয়া অন্যমনে কি করিতে ছিল ; কেবল

একটী বিড়াল হরিদাসের ঘরের দ্বারের নিকটে বসিয়া দু চক্ষু মুদিয়া বোধ হয় কি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। ঘরের দ্বার খোলা থাকায় অবলা দ্রুত বেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল সিন্দুকের উপরে সেই ছবি! অবলার হৃদয়ে আশার উচ্ছ্বাস উঠিল। অবলা ছবি দেখিয়া যেন স্বর্গ জয় করিল—যেন স্বর্গের রাণী হইল। আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে গিয়া ছবি খানিকে জোরে ধারণ করিল। দু হাতে ধরিয়া বুকে রাখিয়া রক্তিম মুর্ত্তিতে দ্রুতবেগে ঘরের বাহিরে উপস্থিত হইল। একি! সম্মুখে ভীষণ ব্যাঘ্র উপস্থিত!! অবলা দেখিবা মাত্র ক্রোধিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল,—তার পর দ্রুতবেগে বাটীর বাহিরে চলিল। হরিদাস ক্ষুধার্ত্ত ব্র্যাঘ্রের ন্যায় পিছনে পিছনে ধাবিত হইল। রাস্তায় পঁহুছিয়া অবলা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল! অবলা দুই চক্ষু জলে আগুণে পূর্ণ করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পাপিষ্ঠের মুখের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া থাকিল। অবলার দুই চক্ষু দিয়া স্রোত বহিতে দেখিয়া পাপিষ্ঠ আর সেখানে থাকিল না—চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

———:০:———

হরিদাস ঘরে আসিয়া ভাবিতেছে 'অবলা কেন আমার ঘরে আবার আসিয়াছিল ; বোধ হয় আমায় ভালবাসে তাই। কিন্তু রাস্তায় আমার দিকে যখন চাহিয়াছিল তখন চক্ষে জল দেখিলাম। যেন আগুণের মত তেজ দেখিলাম। কেন? আমায় দেখিয়া কি অবলা কাঁদিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে চক্ষুতে কোন কুভাব নাই। আমি সে চক্ষু দেখিয়া ভয় পাইলাম, আমার বুক গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু অমন তো কখন দেখি নাই। আমায় ও কখনই ভালবাসে না। তা হলে পালাবে কেন? যদি ভালবাসিত তাহা হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে নিশ্চয় আমার গলা ধরিত, 'আমার বক্ষে তাহার প্রফুল্ল শতদল তুল্য মস্তক স্থাপন করিয়া আমার বক্ষের জ্বালা দূর করিত। যদি আমায় ভালবাসিত, তাহা হইলে এতদিনে আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইত। সে দিনে যে ফাঁদ পেতেছিলাম সে ফাঁদে নিশ্চয়ই পড়ত। আমাকে ও নিশ্চয় ভালবাসে না—আমাকে ঘৃণা করে—অশ্রদ্ধা করে। রামচন্দ্র শালাকে ভাল বাসে। উঃ একি সহ্য হয়। রেমো শালা অমন গোলাপ ফুল সম্ভোগ করিবে! ও পদ্মের মধু স্বর্গের দেবতার উপযুক্ত অমন মধু রেমো শালা ভোগ করিবে। তা কখনই হবে না। এই সময়ে একটা ভয়ানক হিংসা যাতনা হরির বুক ভাঙিতে লাগিল ক্রমে হরি আবার ভাবিল

কি করিব? কোন উপায়ে অবলাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলেই রোমের ঘাঁতে ঘা পড়িবে, তার দফা রফা হইবে। কি করিব? এক কাজ করি। আজ রাত্রে ওরা যে ঘরে শুইয়া থাকিবে সেই ঘরে আগুণ ধরাইয়া দি। মেটে ঘরে আগুণ দিলেই ঠিক্ হইবে। অবলা কোন ঘরে ঘুমায়, আগে তার সন্ধান লইতে হইবে। ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তার পর আস্তে আস্তে মাকে ডাকিল। মা আসিয়া বলিল 'কেন'? হরিদাস বলিল 'দেখিতেছ তো ওদের রেমো শালা কি কাজ করেছে—লজ্জায় কাকেও বলি নাই; যদি লুকিয়ে বিবাহ না করতাম, তা হ'লে এসব কাণ্ড দেখতে হ'ত না।' হরির মা বলিল 'তাইতো বাবা! এমন বিবাহ কেন করলি বল দেখি? হ্যারে! তা বলে কি বউ ওদের বাড়ীতেই থাকবে? ও বউটাও পাজি—ও খানকী, ওকে আর এনে কাজ নাই। এমনি অদৃষ্ট যে একটা বউ আমার ভাল হ'ল না! হরির মা কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল 'যাক ও সব. কেউ তো আর জানে না যে তুই বিয়ে করেছিস। ও শুথেকোর বেটী যা করে করুক। তোর আমি আবার বিয়ে দেব'।

হরি বলিল। মা! তুমি আস্তে আস্তে ওদের বাড়ি গিয়ে চুপে চুপে জেনে এস দেখি অবলা কোন ঘরে শোবে।

হরির মা বলিল। 'না বাবা! আমি পারবো না'।

হরি। কেন? পারবে না কেন? খেতে পারবে?

হরির মা। 'কি হবে জেনে? যাগ, ও বউ চাই না। তোর আমি আবার একটা বে দেব।'

হরি রাগিয়া বলিল 'যেতে হবে, না গেলে আজ সব ঘর দোর ঘটি বাটী ভেঙ্গে একাকার ক'রবো। যা বেটী এখনি য বলছি'। বলিয়াই হরিদাস মাকে যেন মরিতে উদ্যত হইল।

কি করিবে হরির ভয়ে মা আস্তে আস্তে ঘোষেদের বাটীতে গিয়া জানিয়া আসিল। আসিয়া বলিল, রাম তার মামার বাড়ি গেছে—আবাগী ওদের বড় ঘরে শোবে। মুখে আগুণ আমি গেলাম—রামের মা ব'সতে বল্লে, দু একটা কথা কইলে সে বেটী একবার ঘরের বাহিরেও এলো না।

হরি। তুমি রামের মার সঙ্গে কি কথা কইলে?

হরির মা। আমি বল্লাম হ্যাগা হরির মা! তোর সঙ্গে আমার এত ভাব, তুই যে, আমার ছেলে বেলার সই,—ত তোরই বা কি কাণ্ড। তোর ছেলে আজ আমার বউ বা ক'রে নিয়ে এল—তা তুই কিছু বল্লিনা। বলা চুলোয় যাগ তুই আবার ঐ মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়েছিস। আজ ন হয় কাল গাঁয়ের দশজনের যখন কানাকানি হবে তখন—আমা তো মুখে কালি পড়েছে না পড়তে আছে—তোর মুখটো কোথা থাকবে?

হরি। রামের মা কি বল্লে?

হরির মা। ওমা! তার রাগ দ্যাখে কে?

হরি। আমরণ কি ব'ল্লে বলনা।

হরির মা। বল্লে—অবলাকে তোমার হরি রাস্তায় কুড় পেয়েছে বলে কি অবলা তোমার বউ হ'ল। অবলার তিন বছরের সময় বে হয়েছে। অবলার স্বামী আছে। ওস কি কথা! হরি কি একেবারে গোল্লায় গেছে! পরের মে

নিয়ে এত অত্যাচার! এখনও চন্দ্র—সূর্য্য উঠছে! কথা শুনলে যে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হয়। এসব ব'লে আমায় লজ্জায় ফেলে দিলে। আমি শুনতে শুনতে অবাক হ'য়ে রইনু।

হরি। তোমার মুখে আগুণ! ছুঁড়িকে টেনে আনতে পারলে না।

হরির মা। আ মরণ! তাকে নিয়ে আবার কোন লজ্জায় ঘর ক'রবি? সে যে খানকী। আবাগীর ব্যাটা! এক খানকীর জ্বালায় পুড়ে মরছি আবার এক খানকি কোথা হ'তে আনলি। বলিয়াই হরির মা রাগে ফুলিতে ফুলিতে একটা খ্যাংরা লইয়া রান্না ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

হরিদাস রাগে, দুঃখে, হিংসায় পুড়িতে পুড়িতে ঘরে গিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিয়া অবলাকে প্রাণে মরিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ন। সূর্য্য পশ্চিমাকাশের বৃক্ষ শ্রেণীর মাথার উপরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। গোলাকারের চারিদিকে রশ্মির ছটা সকল প্রখর ভাবে বহির্গত হইতেছে। গ্রীষ্ম কালের মাঠে বাতাস একটু নরম—একটু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। মাঠের মধ্যে একটী দীঘি। দীঘির ঘাটে নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতে দুইটী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে লইয়া জল লইতে আসিল। কাঁকাল হইতে কলসী নামাইয়া জলে নামিল। নামিয়া ঝামা দিয়া পা মাজিতেছে আর কে কি দিয়া ভাত খাইয়াছে তাহারই কথা হইতেছে। একথা হইতে সে কথা; বের কথা হইতে হইতে একেবারে ওদের বুড়ির কথা; বুড়ির কথা হইতে হইতে শ্রাদ্ধের কথা; এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রাণের কথা উপস্থিত হইল। একজন বলিল 'আচ্ছা ভাই! তোর স্বামী তোকে কেমন ভাল বাসে? সত্যি কথা ক'স ভাই। অন্য জন বলিল 'সে ভাই বল্‌ব রাত দিন তোমার মুখ খানি দেখতে ইচ্ছা হয়—রাত দিন তোমায় বুকে রাখতে ইচ্ছা হয়।' এই কথা বলিয়াই বলিল 'এখন আমি তো বল্লাম। তোমার তিনি এখন তোমায় কেমন ভাল বাসেন বল ভাই'। অন্য জন বলিল 'সে ভাই চিরকালই বিদেশে থাকে—তা কেমন ক'রে জানবো বল'। অপর বলিল 'তা ভাই তুই তার কাছে যানা কেন? এ বয়সে স্বামী ভোগ

যদি না ক'রলি তবে আর কবে ক'রবি? মুখে আগুণ স্বামী এখনও চিনলিনা! বলিয়াই পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'ভাই পাড় দিয়ে কে আসছে দেখ'।

অপর জনা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই চিনিতে পারিল—বলিল 'ওলো যাদের ঘর কাল রাত্রে পুড়ে গেছে।

অন্য জনা বলিল 'ওলো—সেই একটা মেয়ে যাদের বাড়িতে ছিল বুঝি—ওর নাম না রাম; এমন সময়ে 'রামচন্দ্র সেই ঘাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল'।

রাম ঘর পোড়ার কথাটী স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিয়া রামের সমুদয় শরীর কম্পিত হইতে ছিল। রাম কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ঘাটের কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিল 'ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কাঁপিতে কাঁপিতে রামের মুখ শুকাইল—চক্ষু দুটী তেজোহীন হইল, রামচন্দ্র পাগলের ন্যায় দ্রুতবেগে বাড়ির দিকে যাইতে লাগিল। পথ আর ফুরায় না—বাড়ি যেন দূরে পলাইতেছে।

রামচন্দ্র গ্রামে প্রবেশ করিল। কাহারও সহিত কথা কহিল না;—কহিতে ভয় হইল। অন্য কেহও রামের কাছে তার সর্ব্বনাশের কথা কহিতে সাহস পাইলনা। রাম খানিক গিয়া দূর হইতে দেখিল, বড় ঘরের চাল নাই; ঘরের দেওয়াল সব লাল হইয়াছে; বাটীর কাছের গাছপালা সব ঝলসাইয়াছে। চারি দিকে পাঁশ পড়িয়া আছে—পোড়া বাখারি ছড়ান রহিয়াছে। দেখিবা মাত্র রামের কাঁপুনি বাড়িল, প্রবল অশ্রুবেগ উপস্থিত হইল—দুচক্ষু মুদিয়া সেইখানে পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। উপস্থিত বিপদে গ্রাসিত হইয়া

ধীরে ধীরে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। বাটীর ভিতরে গিয়া একবার দাঁড়াইল—চারিদিকে পাগলের মত তাকাইল—কই? কেহ নাই। মা নাই—অবলা নাই—তাহার পক্ষে এ জগৎ যেন আর নাই। সেদিন রান্নাঘরের দাওয়ায় মার সহিত কথা কহিয়াছিল—মা সেদিন ভাত খাওয়াইয়া ছিল;—সে মাকে দেখিতে পাইল না। সেদিনে সোণার প্রতিমা অবলাকে রান্নাঘরের দ্বারে দেখিয়া গিয়াছিল—সে অবলাকে রাম দেখিতে পাইল না। বড় ঘর পুড়িয়াছে—ছোট ঘর পুড়িয়াছে—রান্না ঘর, গোয়াল ঘর সব পুড়িয়াছে। প্রাচীরের চালের খানিক খানিক পুড়িয়াছে। বাড়ির ভিতরে একটী আম গাছ ছিল তার পাতা ঝলসাইয়া গিয়াছে। রামের একটী টিয়া পাখী ছিল—খাঁচা পড়িয়া আছে—পাখী নাই।

রাম আর বাড়ির ভিতরে দাঁড়াইতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির বাহিরে গিয়া নিচুদিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বসিয়া পড়িল।

'আর কি আছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মা নাই—আর মাকে দেখিতে পাইব না; আর অবলা? আমার ভগিনী অবলা? আহা বালিকা অবলা—আর কি আছে? গালে হাত দিয়া এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে রাম দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিল—রামের অস্তিত্বের চারিদিকে যেন কোয়াসা—যেন নিবিড় অরণ্য—যেন দুর্গন্ধময় শ্মশান;—রাম যেন চারিদিকে নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ—রামের হৃদয়ে যেন মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ উপস্থিত। সে উত্তাপে রাম ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। রাম এই প্রকারে বসিয়া আছে—বসিয়া অন্তরহ শ্মশানাগ্নিতে

পুড়িতেছে—এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা একটী যুবা, পরে একটী বালক, ক্রমে ১০।১২ জন লোক সেখানে উপস্থিত হইল। রাম রক্তিম জল নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া মুখ নামাইল। রামের অশ্রুবেগ বাড়িল রাম কাঁদিতে, লাগিল।

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! আর ভাবলে কি হবে বল! যা হবার তা হয়েছে।" আর একজনা স্ত্রীলোক বলিল, "এসব শক্রতা ক'রে করা বাছা! বাছা আমার কিছু জানেনা গো! পোড়া কপালে মেয়েটার জন্য বাছার আমার এত লাঞ্ছনা"! পুরুষদের মধ্যে রামকে কেহ কেহ মোকদ্দমার কথা কহিল।

এমন সময়ে পুলিশের দুই জন লোক আসিল। তারা একটা রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া গেল। রামের মা ও অবলার মৃত্যুর কথা সকলে গোপন করিল। পুলিশের লোক সরিয়া গেলে, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে মার মৃতদেহ, অবলার মৃতদেহ, খুঁজিতে লাগিল। রাশি রাশি পাঁশ সরাইয়া ফেলিল। মার অস্থি কঙ্কাল পাইল—কিন্তু অবলার কোন চিহ্ন পাইল না। রাম কাঁদিতে কাঁদিতে সেইদিন রাত্রে মার সৎকারাদি সমাপন করিল।

মার দেহ কঙ্কাল ভস্মীভূত হইলে শ্মশানের আগুণ নিবান হইল। কিন্তু রামের প্রাণে শোকের চুল্লী ধু ধু করিয়া জ্বলিতে থাকিল। স্মৃতি সেই শ্মর আগুণ জ্বালিতে থাকিল।

রাম আত্মীয়দের অনুরোধে একবার তাহাদের সঙ্গে ফিরিয়াছিল—বটে, কিন্তু দেশাচারের নিয়মাদি সম্পন্ন করিয়া আবার শ্মশানে ফিরিয়া মার নিবান শ্মর কাছে বসিয়া পাগলের মত

কাঁদিতে লাগিল। আকাশে তারা মিট্ মিট্ জ্বলিতেছে—দূরে চাঁদ ডুবিতেছে। আকাশের তারার মত মানুষের প্রাণ মিট্ মিট্ করিতেছে। তারা সকল আবার জ্বলিবে—চাঁদ আবার উঠিবে; কিন্তু মানুষের প্রাণ আবার জ্বলিবে কি? সেই শ্মশানে গাছে কত ফুল ফুটিতেছে—গাছে আবার ফুল ফুটিবে; কিন্তু রামের জীবনে আর মাকে ফুটিতে দেখিবে না, অবলাকে ফুটিতে দেখিবেনা। নদীর জলে আকাশের তারা সকলের প্রতিবিম্ব ঝক্ মক্ করিতেছে—আর রামের হৃদয়ে তার মার, তার অবলার প্রতিবিম্ব তদ্রূপ ঝক্ মক্ করিতেছে—আকাশ হইতে যখন তারা মুছিবে জলে আর তারা থাকিবে না আজ সংসার হইতে রামের মা, রামের অবলা মুছিয়াছে কিন্তু রামের স্মৃতিতে আগের অপেক্ষা অধিক দীপ্তিতে রামের মা রামের অবলা ঝক্ মক্ করিতেছে। স্মৃতি যদি নিবে তো স্মৃতির সে আগুন নিবিবে—স্মৃতি যদি শুকায় তো স্মৃতির সে প্রতিবিম্ব শুকাইবে। রাম কত কি ভাবিল—যেন ভাবনার জোরে মাকে অবলাকে পরলোক হইতে ফিরাইবার প্রয়াস পাইল। কতলোক এইরূপ প্রয়াস করে কিন্তু সে প্রয়াসে মানুষের বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হয়—মানুষ আর ফেরে না।

রাম আবার ভাবিলঃ—পুড়িয়ে মারবে জানলে আমি কখনই অবলাকে আমার বাড়িতে আনতাম না। কি? কি? পাপিষ্ঠ আমার ভগিনীকে স্পর্শ করে কলঙ্কিত ক'রত যে—না—না—এনে ভালই করেছি—ভগবান আছেন—অত্যাচারের প্রতিফল ভুগতে হবেই হবে। পাপের শাস্তিদাতা যে এক জন আছেন তা আমি বেশ বোধ কর'ছি। [illegible] বা

কেন ক'রবো। যাই—যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই। রামচন্দ্র সেই রাত্রে—দুঃখে শোকে বৈরাগ্যে সেই শ্মশান ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিল—সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাট ফাটা রৌদ্র পৃথিবীকে ক্লান্ত করিতেছে। গাছ পালা সব সে রৌদ্রের তেজে পুড়িয়া যাইতেছে। তেজে পাতা গুলি সব নুইয়া পড়িয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম। বাতাসের স্তরে স্তরে আগুণ ছুটিতেছে—গোরু মানুষের গা দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। পল্লীর মধ্যে সব নিস্তব্ধ। পশু পক্ষী যে যাহার আড্ডায় চুপ করিয়া আছে। মানুষের মধ্যে কেহ ঘরে, কেহ বাহিরে গাছ তলায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া ছট্ ফট করিতেছে। ছেলেরা জল জল করিয়া মাকে ব্যস্ত করিতেছে। কাহারও বা ভেদ, কাহারও বা বমি—কাহারও বা সর্দ্দি গর্ম্মি হইতেছে। বাতাস নড়েনা—গাছ পালা নড়েনা—জলাশয় গ্রীষ্মে উত্তাপে নড়েনা। পুকুরে মাছ আর ঘাই দিতেছে না—সব গ্রীষ্মের উত্তাপে চুপ করিয়া জলের ভিতরে রহিয়াছে। বনের ভিতরে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া দুই একটী সাপ ফণা ধরিয়া গাছতলায় গর্জ্জন করিতেছে। মাঠে রাখালেরা গোরু গুলিকে লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। পুকুরের পাড়ে

—কোথাও একটা গরু, কোথাও একটা ছাগল চরিতে চরিতে শুইয়া ধুঁকিতেছে। এইরূপ সময়ে একটী বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ তলে একটী স্ত্রীলোকের একটী কুড়ে। ঘরের বাহিরে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া তামাক খাইতেছে। তার ঘরের ভিতরে ভিক্ষার ঝুলি, একটী বেহালা আর রান্নার হাড়ি ও একখানা ছেঁড়া মাদুর ও একখানি ছেঁড়া কাঁথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে। নাকে উল্কি—কপালে উল্কি। দেখিতে শ্যাম বর্ণ; মাথা ভরা চুল পৃষ্ঠের উপরে লুটিতেছে আর রমণী সেই অবস্থায় পা ছড়াইয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গাহিতেছে :—

(রাগিণী জয়জয়ন্তী তাল আড়াঠেকা।)

ভাল বাসা কিবা ধন বুঝিবে তা কেমনে।
যে ভাল ভেসেছে কভু সেই জানে জীবনে॥

দারুণ গ্রীষ্মে সেই নিস্তব্ধতাকে পূর্ণ করিয়া সঙ্গীতামৃত মাঠ পূর্ণ করিতে লাগিল। অদূরে আর একটী বৃক্ষতলে একটী রূপের প্রতিমা বসিয়াছিল। তার কানে এই সঙ্গীত প্রবেশ করিবামাত্র সে একবারে স্বর্গে প্রবেশ করিল। সেই দারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট অপসৃত হইল। বালিকা কান পাতিয়া গান শুনিতে লাগিল। আবার গান হইতেছে।

ভাল বেসে যে যাতনা, সে যে রে অমৃত কণা,

রমণীর হৃদয়তন্ত্রী এভাব স্পর্শে বাজিয়া উঠিল। রমণী দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া কোন দিকে গান হইতেছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সঙ্গীত চলিতেছে;—

"যদি ভাল বেসে থাক এ মানব জীবনে।
ভালবাসা আছে ব'লে, এখনও শোণিত চলে ;
এখনও নিশ্বাস আমি লইতেছি ভুবনে।"

রমণী সেই গীত লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। যে রমণী গান গাইতেছিল, সে দেখিল তাহার দিকে একটী পরমাসুন্দরী যুবতী একলা মাঠ হাঁটিয়া আসিতেছে। সে এরূপ রূপ কখন দেখে নাই।

রমণী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে স্থান যেন রূপে আলোকিত হইল। সেই রূপের আভায় ভিখারিণীর শ্যামবর্ণ বিভাসিত হইল। ভিখারিণী বালাকে বসিতে বলিল। বালা বসিল। পরে দুইজনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ভি। হাঁ মা তুমি যে এখানে ?

বা। কোথায় যাইব ?

ভি। তোমার ঘর কোথা ?

বালা। 'ঘর থাক্‌লে আর হেথা আসি' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এই নিশ্বাসে ভিখারিণীর মন যেন একটু ভিজিয়া উঠিল।

ভি। হাঁ মা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কেন ?

বা। ফেলিয়া ফেলিয়া অভ্যাস হইয়াছে মা।

শুনিয়া ভিখারিণী যেন স্তম্ভিত হইল। একদৃষ্টে সেই বিদ্যুতময়ী মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

বা। আপনি এখানে একলা থাকেন ?

ভি। হাঁ মা একলাই থাকি !

বা। আপনার কি আর কেহ নাই ?

ভি। আছেন বই কি?

বা। কে?

ভি। অনেক আছে।

বা। তা আপনি এখানে থাকেন কেন? আপনার কি প্রকারে চলে?

ভি। ভিক্ষা করি।

বা। এই বল্লেন আপনার অনেক আছে, আবার বলিতেছেন, ভিক্ষা করি?

ভি। পৃথিবীতে এ এক মজা।

বালা তখন আপনার অবস্থার সহিত ভিখারিণীর অবস্থার সাদৃশ্য দেখিয়া ভাবিল, 'ভগবান শুধু আমাকেই এমন করেন নাই'। ভাবিয়া আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালা কাঁদ কাঁদ হইল।

ভি। মা! আমার স্বামী আছেন। নানা দুঃখে পড়িয়া এবং আমার জ্বালায় জ্বালাতন হ'য়ে কোথায় বিবাগী হ'য়ে চলে গেছেন। তিনি আমায় পথের ভিখারিণী ক'রে গেছেন, তাই ভিখারিণী হ'য়েছি।

এই সময়ে দু চক্ষু বহিয়া স্রোতের ন্যায় রূপটী অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

ভি। মা তুই কে মা! তোর অমন রূপ, অমন কচি বয়স, তুই মা একলা এখানে কেন এলি?

বা। আপনার যে দশা আমারও সেই দশা। মা আমি তোমার কাছে থাকিব। তোমার সঙ্গে ভিক্ষা করিব।

ভি। হাঁ মা! তোর কি আর কেহ নাই? স্বামী আছে তো?—

আছে বই কি—মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহা—আছে বই কি। তোমার পেটকাপড়ে ও কি মা!

বা। “ছবি,” বলিবামাত্র বালার দুই চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

ভি। দেখি মা দেখি—এই তোমার স্বামীর ছবি। মা! ঠিক এই প্রকার চেহারার একটী লোক আমি কলিকাতায় দেখেছি।

কথাটী শুনিয়াই অবলার হৃদয় আকস্মি আসায় নাচিয়া উঠিল—অবলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অবলা ভাবিল, বিধি বুঝি এইবার সদয় হইলেন। ভাবিয়াই, বলিলেন ‘হাঁ মা! তাঁকে কোথায় দেখেছ? তাঁর নাম কি? এই সময়ে অবলার অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

ভি। নাম মা জানি না। কিন্তু ঠিক এইরূপ চেহারার একটী লোক আমি কলিকাতায় দেখেছি। কলেজে সে পড়ে মা।

অ। তাঁর পরিচয় আর কি কি জানেন বলুন।

ভি। আর অধিক জানি না মা; ব্রাহ্মণের ছেলে—কুলীন, বিয়ে নাকি ছেলে বেলায় হয়েছিল, আর অধিক জানি না মা।

অবলার শরীরে রোমাঞ্চ হইল—গদ গদ ভাবে জিজ্ঞাসিল কবে আপনি দেখেছিলেন?

ভি! মা! তবে, এসে ব’স। ওখানে যে ছায়া নাই—রোদ যে মাথার উপরে পড়েছে মা। গা থেকে যে গল্ গল্ করে ঘাম বেরুচ্ছে। চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজিয়াছে।

বালিকা সরিয়া ছায়ায় বসিল। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কবে আপনি দেখেছিলেন?'

ভি। মা! আমি—মাঝে মাঝে প্রায়ই কলিকাতায় যাই। এই প্রায় পাঁচ মাস হইল গিয়াছিলাম। এবারে কিন্তু গিয়া দেখি নাই, তার পূর্ব্বে অনেক বার দেখেছিলাম, তাঁদের বাসায় প্রায় রোজই ভিক্ষা করিতে যাইতাম।

অ। তবু কত দিন হইল আপনি তাঁকে দেখেছেন?

ভি। প্রায় এক বৎসর হইবে।

অ। আপনি আবার কবে যাইবেন?

ভি। দুই এক দিনের মধ্যে যাইতে পারি, কেন মা?

অ। আমি আপনার সঙ্গে যাইব। কাল যাইতে পারিবেন না? বলিয়া অবলা অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে লাগিল—চোখের জল আর ফুরায় না।

ভি। তার আর কি গেলেই হ'ল। এখনি চল না কেন? আমরা ভিক্ষা করি মা—যেখানে হ'ক একটা আড্ডা ক'রে নিয়ে রাতটা কাটান মাত্র। কলিকাতায় গড়ের মাঠে গঙ্গার ধারে একটী বড় গাছ আছে। যখনই যাই, তখনই সেই গাছতলায় আড্ডা করি। তা আজ আর নয় কালকেই যাব। এখন তোমার পরিচয় শুনতে বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে—বল মা শুনি।

ভিখারিণী বালিকার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাবিল, 'যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, যদি বশীভূত করিতে পারি তো দুই মাসে দোতালা বানাতে পারবো'।

তাহার পর ছলে বলে ভিখারিণী নানা কথা পাড়িয়া বালিকার মন বুঝিতে লাগিল। বুঝিয়া মনে মনে ভাবিল

'বাবা! যেন আগুণ—বড় শক্ত মেয়ে—একে বশ করিতে যদি তিনি পারেন, তবেই তাঁর বাহাদুরী—আমি তো দুই এক দিনে পারিব না। আসুন তিনি—দেখি তাঁর চক্ষের কত তেজ—অনেককে তো ম'জায়েছেন, একে যদি মজাতে পারেন তবেই তাঁর বাহাদুরী।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। আকাশে চাঁদ উঠিল। ভিখারিণী বলিল, 'মা! এ মাঠে বড় লেঠেলের ভয়, আর বাহিরে থাকা ভাল নয়,—কুঁড়ের ভিতরে গিয়া বস'। বালিকা কুঁড়ের ভিতরে গিয়া বসিল।

সেই কুঁড়ের ভিতরে বালিকার রূপের শোভা দেখিলে—সে পবিত্রতা ও প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিলে মহাপাপীরও মনে অনুতাপ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

একটু রাত্রি হইল। ভিখারিণী কুঁড়ে হইতে একটু দূরে চলিল। গিয়া দেখিল, তিনি নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া ছড়ি হাতে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন।

ভিখারিণীকে দেখিয়া আরও দ্রুতবেগে কাছে আসিয়া বলিল, 'খুব শীকার করেছি!' ভিখারিণী বলিল, 'আমার চেয়ে আর নয়।'

তি। মাইরি!

ভি। যাহা কখন দেখ নাই, তাহা দেখাইব।

তি। আমি কি প্রকার দেখেছি, আগে শোন।

ভি। কি প্রকার?

তি। 'দেখিয়া সে রূপ ভয়ে তড়িৎকম্পিত'—

ভি। আমি ভাই অত কবিতা জানি না। দেখাই গিয়ে চল—দেখে বুঝো।

তি। অত তামাসা কেন? কালীর দিব্য?

ভি। মিথ্যা হয় গালে চড় মেরো।

তি। তা হ'লে জুটো হয়েছে।

ভি। আমি যা দেখেছি, তা যদি বশীভূত করিতে পার তো মাসে ১০০০৲ কিন্তু বশীভূত করা তোমার কর্ম্ম নহে। সে রূপের কাছে দাঁড়াইলে তোমার চোকে ধাঁধাঁ লাগিবে।

তি। কি প্রকার বল দেখি? সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

ভি। দুপুর বেলা বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গান গাহিতেছিলাম, এবার সেই তোমার সখের গানটী গাহিতে-ছিলাম—সেই গান শুনিয়া তাঁর প্রাণ চমকিয়া উঠায় তিনি আমার কাছে আসিয়াছেন।

তি। 'গান শুনে প্রাণ চমকে উঠেছে' বারুদঘরে আগুণ পড়েছে; তবে আর পায় কে।

ভি। সে আমার ঘরের ভিতরে আছে—কিন্তু বড় শক্ত— তার বড় স্বামীভক্তি।

তি। আচ্ছা তা দেখা যাবে, কত বড় স্বামিভক্তি! চল চল—এখনি তাকে মজাব।

পাপিষ্ঠ সেই ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। পাপিয়সী বলিল 'শুন শুন'

তি। কি? কি?

ভি। একবারে ঘরে প্রবেশ করিলে কার্য্য সফল হইবে না।

তি। আমি তত বোকা নহি। পকেটে ১০০৲ টাকা আছে—আর এই এক শিশি আতর আছে।

ভি। তবে তুমি যাও। আমি এইখানে বসিয়া থাকি। ওই যে দুঃখিনী বালা—ও আমাদের অবলা; পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। গৃহে অগ্নি লাগিবার পূর্ব্বেই রামের বাটী অতি অদ্ভুত ঘটনায় পড়িয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই ঘটনাটী পর পরিচ্ছেদে দিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস অবলাকে পৃথিবী হইতে দূর করিবে—সে ঘনীভূত জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্ভোগে যদি না আসিল, তবে সে মূর্ত্তি পৃথিবীতে না থাকাই ভাল। হরিদাস সেইদিন সন্ধ্যাকালে মাঠে গেল—মাঠে গিয়া এদিক ওদিক করিতে লাগিল। মাঠে রাত্রি ক্রমশঃ ঘন হইতেছে—ভীষণ হইতেছে। অন্ধকারে মাঠের আইল, গাছ, ঝোঁপ সব ডুবিয়া গেল। হরিদাস অন্ধকারে ডুবিয়া হৃদয়ের আলো নিবাইয়া ফেলিল—মাথার উপরে আকাশ যদি নক্ষত্রহীন হইত তো—হরিদাসের মনের আঁধার বাহিরের আঁধারের সমতুল্য হইতে পারিত। হরিদাসের বুদ্ধিজ্যোতিঃ নিবিয়াছে, হৃদয়জ্যোতিঃ নিবিয়াছে;—হরিদাস ভীষণ মূর্ত্তিতে নক্ষত্রবিহীন রাত্রি আপনার হৃদয়ে পূরিয়া বিচরণ করিতেছে। সেই অন্ধকারে হরিদাসের দুই চক্ষু ক্রোধে, হিংসায়, অভিমানে জ্বলিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘসিতে লাগিল, শিরা সকল—কুঞ্চিত—ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইতে লাগিল। হরিদাস ভাবিতেছে, বধ করিব স্বহস্তেই বধ করিব। এত দিনের আশা বিফল হইল। রেমো শালা আমার ভাতে ঘা দিল!" ভাবিতে ভাবিতে দ্রুত মাঠের এক দিকে ধাবিত হইল। থামিয়া আকাশের দিকে চাহিল—একদৃষ্টে পাগলের মত কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া হৃদয়ের ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া আক-

মোচন করিল "অমন রূপ—অমন রূপ—আহা! চোখের কি গঠন! কি তেজ! কি মাধুরি! আর সেই মুখ? নিখুঁত—নিটোল—লাবণ্যময়—বিধাতা অতি যত্নে চন্দ্র হইতে খুঁদিয়া বাহির করিয়াছেন—উঃ প্রাণ ফেটে যায়" বলিয়া দ্রুত অন্য দিকে ধাবিত হইল। বুকের ভিতরে নরকের আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিল—হরিদাস তাহাতে অস্থির হইল। হরিদাস সেই মাঠে অন্ধকার মধ্যে একটী উচ্চ ঢিপির উপর বসিল—অস্তিত্বের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল—হরিদাস উঠিয়া পড়িল—দ্রুত গ্রামের দিকে ধাবিত হইল। তখন রাত্রি ঝিঁ ঝিঁ করিয়া ডাকিতেছে—সেই শব্দ যেন হরিদাসকে পাগল করিয়া ফেলিল—হরিদাসের অতৃপ্ত আশার জন্য যে ক্ষোভ—আপশোষ অভিমান সব সেই রাত্রির শব্দে উত্তেজিত হইল—হরিদাসের প্রকৃতি ফাটিবার মত বোধ হইল—"উঃ গেলুম গেলুম!" বলিয়া হরিদাস ছুটিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন খুব গভীর হইয়াছে—গ্রামে সমুদয় গৃহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে; কেবল দুই একটা কুকুরের "খেউ খেউ" শব্দ হইতেছে; কেবল কোন গৃহে কচিছেলে কাঁদিতেছে শয্যায় শুইয়া কেহ বা কাশিতেছে। হরিদাস রামের ঘরে অগ্নি দিবার জন্য যাইতেছে; ঐ সব শব্দ শুনিয়া বড় ভয় হইল—হরিদাস গ্রামের ভিতরে একস্থানে দাঁড়াইয়া ভীষণ চিন্তায় ডুবিয়া থাকিল। কুকুরের খেউ খেউ শব্দ থামিল, কচিছেলের কান্না থামিল, কাশির আওয়াজ বন্ধ হইল, হরিদাস সর্ব্বনাশের জন্য যমমূর্ত্তিতে অগ্রসর হইল।

এমনি সময়ে হত ভাগিনী অবলা ঘরের মধ্যে রামের মায়

কাছে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে—অবলা সেনপুরে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে। এমন সময়ে আকাশে একটী প্রকাণ্ড আলোক জ্বলিতে লাগিল। হঠাৎ সেই আলোকের ভিতর হইতে অবলার মা বাহির হইয়া বলিল "তোর আজ বড় বিপদ তাই পরলোকের বাতাস ছাড়িয়া তোর উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছি।" অবলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দুই বাহু ছড়াইয়া মাকে জাপটাইতে গেল, কিন্তু প্রতিবিম্বের স্তায় বোধ হইল—স্পর্শ করিতে পারিলনা। সে প্রতিবিম্ব আকাশে বিলীন হ ল—আকাশে অমনি নক্ষত্র সকল নিবিয়া গেল—অবলা ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অবলা মার জন্ত কাঁদিতে লাগিল। অবলা জাগ্রত হইল—ঘরের ভিতরে এক আলোর মানুষ—অবলার মার মত দাঁড়াইয়া হাত ছানি দিয়া অবলাকে ডাকিল। অবলা চমকিত ভাবে উঠিল। অবলা দেখিল সম্মুখে অদ্ভুত মূর্ত্তি। প্রদীপের শিখা প্রকাণ্ড হইয়া রমনীমূর্ত্তি ধারণ করিলে যেরূপ হয়, এ সেইরূপ মূর্ত্তি—পৃথিবীতে অবলার মার মুখ, চোখ, গঠন, আকৃতি যেরূপ ছিল—এ আকৃতি সেইরূপ। প্রভেদ এই যে অগ্নি শিখায় আলোক হয় ইহাতে আলোক হয় নাই। ঘরের চারিদিকে অন্ধকার যেমন নিবিড় সেইরূপ নিবিড় আছে; অথচ মধ্যস্থলে শিখাময়ী মূর্ত্তি অবলার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া আছে—মাথায় চুল নাই—ভ্রুতে চুল নাই। সেই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অবলা প্রথমে ভয়ে কাঁপিয়া দুচক্ষু মুদিল। সেই মূর্ত্তি তখন স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল "অবলা! আমায় চিনিতে পারছনা"।

কথার আওয়াজ অবলার মার মত। অবলা ভয়ের উপর বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

মূর্ত্তি আবার বলিল অবলা! মা আমার তোমার ভয় কি মা! আমি যে তোমার মা!

অবলা সে মাতৃস্বর স্পর্শে কাঁদিয়া ফেলিল—চক্ষু চাহিল—চাহিয়া দেখিল, মার মূর্ত্তিই বটে। তখন অবলা মা! ও মা! বলিয়া মাকে ধরিতে গেল, কিন্তু প্রতিবিম্বের ন্যায় স্পর্শ করিতে পারিল না। তখন অবলার মা বলিল "অবলা! কান্না কাটনা রাখ মা! এজীবন কাঁদিলে নরম হয় না—কান্নার জলে সংসারের কঠিন মাটী নরম হয় না। তোমার ও যোগীনের বড় বিপদ; সেই বিপদ হইতে রক্ষার জন্য উপরের বাতাস হইতে নিম্নের বাতাসে আসিয়াছি—আমি যা বলি শুন—আর সময় নাই; আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে। মা! তোমার ছবি লইয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। এ বাটী এ গ্রাম এই রাত্রে পরিত্যাগ কর—নহিলে যোগীনের আমার প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। অতি গোপনে আমার সঙ্গে সঙ্গে এস—কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—আর সময় নাই শীঘ্র এস।

যোগীনের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা—অবলার অস্তিত্ব ঘুরিতে লাগিল—শীঘ্র ছবি লইয়া মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গ্রামের অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই মূর্ত্তি দ্রুত চলিল, অবলা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। অবলা থামিতে থামিতে কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিয়াছে। যোগীনের প্রাণ যাইবে—যেন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিমদশা উপস্থিত অবলা সেইরূপ ভাবে প্রেতাত্মার পিছনে পিছনে চলিয়াছে। গ্রাম পার হইয়া সেই মূর্ত্তি মাঠে গেল—মাঠে দাঁড়াইল। অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসিল, মা! আমার তোর সঙ্গে লয়ে চনা মা! তোর সঙ্গে

বাবার কাছে দাদার কাছে লয়ে চনা মা!" বলিয়া অবলা বদ্ধকণ্ঠা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই মূর্ত্তি সান্ত্বনা দিল তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে মা! মহানরক হইতে আমরা তোমার পুণ্যে যে স্বর্গে গিয়াছি মা! মা! অবলা! তোমার স্বামী ভক্তির জোরে চৌদ্দপুরুষ যে উদ্ধার পেয়েছে মা! মা আমার কাছে সরে এস দুটো আদরের কথা বলি। অবলা সরিয়া যাইল! দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া একদৃষ্টে মার দিকে চাহিয়া থাকিল।

অবলার মা বলিল "মা! ভগবতী তোমার সহায় হইয়াছেন, তোমার কিছু ভয় নাই। তোমার জনক ও আমি সর্ব্বদা ভগবতীর পূজা তোমার ও যোগীনের মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকি। যে ছবি পাইয়াছ ঐ ছবিই তোমাকে আমাদের স্বর্গে আনিবে যোগীনকে তুমি পাবে—তবে সংসার নাকি স্বামীভক্তি বিহীন হয়েছে মা! তাই তোমায় ধুনার মত আগুণে পুড়য়ে সংসারের দুর্গন্ধ ভগবান দূর করিবেন। অবলার মা অবলার স্বামীভক্তি পরীক্ষার জন্য আবার বলিল, তা তোর যদি বড় কষ্ট বোধ হ'য়ে থাকে তো, আমার সঙ্গে নাহয় আয়। এখন তো কষ্টের সন্ধ্যা কাল, ঘোর রজনী সম্মুখে—অনেক যাতনা জ্বালা—তোমার সহিতে হবে—পৃথিবীর সুখ তোমার কপালে আদৌ নাই। তাই বলি, যদি কষ্ট বোধ হয় আমার সঙ্গে আয় তোর পিতাকে, দাদাকে দেখে—তোর সব যাতনা দূর হবে।

অবলা বলিল "মা! আর এখানে থাকবোনা মা! তোমার দেখা পেয়েছি যখন, আর তোমায় ছাড়বোনা মা! আমায় একবার খানি কোলে করনা মা!" বলিয়াই অবলা ব্যাকুল

প্রাণে তখন দুবাহু ছড়াইয়া মার কোলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। অবলার মা বলিল—সে দেশে যাইতে হইলে ও ছবি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—ছবি তবে এই মাঠে রাখিয়া আমার সঙ্গে এস মা। ছবি পরিত্যাগের কথা শুনিবামাত্র, অবলার বুকের হাড় যেন মুচড়িয়া গেল,—বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। অবলার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। অবলা মার কথায় কোন উত্তর দিলনা—অবনত মুখে নীরব হইয়া থাকিল। তখন অবলার মা আবার বলিল, অবলা! কথা কওনা কেন? তবে আমার সঙ্গে এস—ছবি ঐখানে ফেলিয়া দিয়া আমার সঙ্গে এস—বলিয়াই অবলার মা অগ্রসর হইল। অবলা ছবিখানিকে বুকের উপরে দৃঢ়রূপে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল—"না—না তোমায় ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিবনা—তোমার জন্য যদি অনন্ত নরকে যাইতে হয় যাইব—নরকে যদি তুমি থাক, তো সে নরক আমার বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও মহা সুখের স্থল—আর তুমি যদি না থাক তো—বৈকুণ্ঠ আমার ঘোর নরক।" অবলা ভাবিতে ভাবিতে অসাড় প্রাণে, অসাড় দেহে সেই খানে বসিয়া পড়িল—বসিয়া একটী ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অবলার মা অবলার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া আসিল—ফিরিয়া আসিয়া অবনতমুখী অবলার মস্তকের উপরে আপনার হাত রাখিল—অবলার দেহ প্রাণের অসাড়তা দূর হইল। অবলা মুখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে মা, দেখিয়া কাতরস্বরে বলিল "না মা! আমার অদৃষ্টের কষ্ট কিছুতে যাবে না। আমি এমন সুবিধা পাইয়াও আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিলাম"।—

তখন অবলার মা বলিল "মা! তা আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি। ঐ ছবিই তোমার সুখ, তোমার আরাম, তোমারশান্তি, তোমার স্বর্গ, তোমার সকল রোগের, সকল দুঃখের, ঔষধ; ঐ ছবি তোমার আরাধনা, ঐ ছবি তোমার তপস্যা, ঐ ছবি তোমার ধ্যান, জ্ঞান, মান—ঐ ছবি যে দিন যাবে সেই দিন তুমি মরিবে। ইহাতে আমরা বড় সুখী—ইহার তেজেই আমরা নরক হইতে স্বর্গে উঠিয়াছি। অবলা দেখিল মা আবার অগ্রসর হইতেছে—অবলা পিছনে পিছনে চলিল। মা দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া অতি গম্ভীর ভাবে অবলাকে বলিল—রাত্রি যতক্ষণ না ফুরাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে—ভোর হইলেই আমি কয়েকটী কথা বলিয়া উষার শীতল বাতাসে মিসিয়া যাইব।"

সেই শিখাময়ীমূর্ত্তি দ্রুত চলিল; অবলা পিছনে পিছনে চলিল। রাত্রি অন্ধকারে ভীষণ হইয়া শাঁ শাঁ করিতেছে আর অবলা প্রেতাত্মার পিছনে পিছনে যাইতেছে। পরিশেষে একস্থানে যাইয়া ভোর হইল। প্রেতাত্মা দাঁড়াইল। অবলার দিকে ফিরিয়া বলিল এইখানে বসিয়া থাক—বেলা দুপুরের সময় একটী গান শুনিবে সেই গান ধরিয়া গাহিকার কাছে যাইবে। তার কাছে গিয়া যা হয় হবে। হাঁ গা মা! অদৃষ্টের জন্য কি ভয় পাও?

অ। না মা আমি আর কিছু ভয় পাই না কেবল এ ছবি এবং যাঁর ছবি তাঁর জন্যই ভয়, ভাবনা, যাতনা হয়।

প্রে। তা মা! আমি জানি। এ জীবনে অনেক কষ্ট তোমার আছে। কিন্তু যত কষ্টেই পড যেমন কাটা বনে পদ্ম ফোটে, গোলাপ ফোটে—মহা কষ্টের বনে তোমার হৃদয় ফুল

ফুটিবে—সে গন্ধে তোমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। কষ্টের কঠিন আবরণে সুখের শাঁস আস্বাদন করিবে। মা! আজ মা হইয়া ভগবতীর আদেশে স্বয়ং কষ্টের মুখে তোমায় ফেলিতে আসিয়াছি—এই কষ্টের মুখে তোমার যোগীনের মঙ্গল হবে—যোগীনকে পাবার সূত্রপাত হবে। মা! আর নয়! হতভাগিনী মা তোমার জনমের মত চলিল—প্রাতঃকালের সুগন্ধপূর্ণ শীতল বাতাস বহিতেছে—খদ্যোতের জ্যোতি নিবিতেছে আর নয় মা! আশীর্ব্বাদ করি মা! যেন এক মাথা সিঁদুর পরে যোগীনের কোলে পতিব্রতার গতি লাভ করতে পার।" এমন সময়ে বৃক্ষ শাখা হইতে পাখীরা কলরব করিলে প্রেতমূর্ত্তি আকাশে মিশিয়া গেল। অবলা সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা কুঁড়ের ভিতর বসিয়া ভাবিতেছে, 'রামচন্দ্র দাদাকে বলিয়া আসিলাম না—তাঁর মাকেও বলিয়া আসিলাম না। কাজটা ভাল করি নাই।' আবার ভাবিতেছেন, 'কিন্তু কি বা বলিয়া আসিব? আমি তাঁদের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছি। পাপিষ্ঠ হরিদাস যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত, তাহাতে সে দেশে কথনই থাকা উচিত নহে; আসিয়া ভালই করিয়াছি। আমি থাকিলে রাম দাদাকে আমার জন্য হয়তো নানা বিপদে পড়িতে হইত। আমার নামে মিথ্যা দুর্ণাম উঠিয়াছে। যদিও মিথ্যা, কিন্তু স্ত্রীলোকের নামে দুর্ণাম উঠাও স্ত্রীলোকেরই পাপের ফল বলিতে হইবে।' ভাবিতে ভাবিতে অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

অবলা কাঁদিতেছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে বাহির হইতে দরজা দিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে কতকগুলি টাকা আসিয়া পড়িল। অবলা অবাক্ হইল—ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের দিকে চাহিল। অবলা ভাবিতেছে, ভিখারিণী কোথায় গেল'। আবার ঝন্ ঝন্ শব্দে কতকগুলি টাকা আসিয়া পড়িল। অবলা ডাকাত আসিয়াছে ভাবিয়া স্বামীর ছবি-খানি পেট কাপড়ে বাঁধিল। আবার এক খানি আতর মাখান রুমাল আসিয়া অবলার বক্ষদেশে পতিত হইল। অবলার মনে এবার অন্য প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল,—ভাবিল, 'কোন

দুষ্ট লোক'; দেখিতে দেখিতে কুঁড়ের ভিতরে এক যুবা আসিয়া উপস্থিত।

অবলার শিরায় শিরায় সাহসের মদিরা প্রবাহিত হইল—রমণী হৃদয়ে সতীত্ব-সমুদ্র গর্জ্জন করিল—চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া পবিত্রতার জল পড়িতে লাগিল। সেই চক্ষু ঘরের অন্ধকারের ভিতরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠ সে মূর্ত্তির সে ভাব দেখিয়া ভীত হইল—কম্পিত কলেবর হইল। সেই প্রেমের আকাশে সতীত্বের বজ্র কড় কড় করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—সেই পবিত্রতার উচ্ছ্বাস মহাবেগে উচ্ছসিত হইয়া পাপীর দুষ্প্রবৃত্তির মস্তক অবনত করিয়া দিল—পাপীর মস্তিষ্কের ভিতরে যেন পাপ যন্ত্রণার আগুণ জ্বালিয়া দিল—পাপীর হাড়ে হাড়ে, মজ্জার স্তরে স্তরে আত্মগ্লানির বিষজ্বালা ছড়াইয়া দিল। সেই বিস্তীর্ণ জনশূন্য মাঠে—সেই কুটীরের ভিতরে যে স্বর্গের দেবী বাস করিতেছে—যে ভগবতী সতী সাধ্বী সাবিত্রী বাস করিতেছে—তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিতে স্বয়ং পাপাসুর সয়তানও সক্ষম নহে।—নরক যে পদরেণু স্পর্শে স্বর্গে পরিণত হয়, সে স্বর্গকে—সে সতীকে কলঙ্কিত করা কি দুশ্চরিত্র মানবের সাধ্য? স্বয়ং মা ভগবতী যাঁর হৃদয়ের ভিতরে সতী রূপে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, সে সতীকে কুভাবে স্পর্শ করিলে কি পৃথিবী থাকিবে—না চন্দ্র সূর্য্য আর আকাশে উঠিবে? কার সাধ্য অবলাকে স্পর্শ করে—কার ক্ষমতা অবলার নিকটে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে কুভাব পোষণ করে? ঐ দেখ পাপিষ্ঠের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হই-

তেছে—পাপিষ্ঠ আপনার লজ্জায় আপনি লজ্জিত। পাপিষ্ঠ অবলা সতীকে দেখিবামাত্র প্রথমে ভয়ে ভীত কম্পিত—পরে লজ্জায় লজ্জিত—এবং আত্ম-পাপ-স্মরণে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। অবলাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

'এ ঘরে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে' এই স্থির করিয়া অবলা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মাঠ বাহিয়া অন্যত্র যাত্রা করিল।

অবলা বরাবর চলিল। কোথায় একলা যাইবে জানে না। যাইতে যাইতে ভাবিল, 'এ রাত্রে আর কোথায় যাইব? বরাবর কলিকাতায় যাই'। কলিকাতা যেন স্বর্গ। কলিকাতার কথা মনে আসিবামাত্র হৃদয়ে যেন কে বলিল 'ভয় কি? চল্ কলিকাতায় চল্'। অবলা ভাবিতেছে, কলিকাতায় যাইবার পথ কোথা'? ভাবিতে ভাবিতে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া গভীর ভাবনায় ডুবিতেছে, এমন সময়ে কে একজন পশ্চাতে আসিয়া অবলার হাত ধরিল। অবলা চিনিল—এ সেই ভিখারিণী। ভিখারিণীকে দেখিয়া অবলার ভয় হইল। ভয়বিহ্বলা হইয়া অবলা তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে পাগলিনীর মত চাহিয়া আছে—দেখিয়া ভিখারিণী বলিল;—

কেন মা! অমন ক'রে চেয়ে আছ?

অবলা কাঁদিয়া ফেলিল।

কেন মা! অমন ক'রে কাঁদছ?

অবলা কিছু বলিল না—আপনার অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিল।

ভি। মা! আমায় দেখে ভয় পেয়েছ?

অ। যদি পেয়ে থাকি তো আর কি হবে!'—বলিয়া অবলা আবার কাঁদিতে লাগিল।

ভি। মা! তুমি কলিকাতা যেতে চেয়েছিলে না?

অ। তোমায় বলিয়া কি হইবে?

ভি। কেন? আমায় তো আগে বলেছিলে।

অ। আগে আপনাকে বুঝিতে পারি নাই।

ভি। এখন বুঝিয়াছ?

অ। বুঝিয়াছি।

ভি। কি বুঝিয়াছ?

অ। ভাল লোক আপনি নন।

কথা শুনিয়া ভিখারিণীর বড় রাগ হইল। রাগের ভরে বলিল:—এখন এই রাত্রে মাঠে কেহ নাই। তুমি একলা কোথা যাবে?

অ। কলিকাতা যাব।

ভি। তোমার অতি অল্প বয়স। এ বয়সে একলা রাত্রে কোথা যাবে? আমার তোমার প্রতি সন্দেহ হয়েছে।

অ। কি সন্দেহ?

ভি। তুমি কোন গৃহস্থের বউ—পালিয়ে এসেছ—তোমার চরিত্র ভাল নয়।

'পাপিষ্ঠা দূর হ, তোর সহিত কথা কহিলেও পাপ—অতি রুক্ষস্বরে এই কথা বলিয়া অবলা নিজ পথে অগ্রসর হইল।

ভিখারিণী তখন রাগে জ্বলিয়া উঠিল; এলো চুলে দুচক্ষু লাল করিয়া, একখানা চকচকে ছুরি লইয়া ভীমা মূর্ত্তিতে দ্রুত

অবলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভ্রু দুটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া রুক্ষস্বরে গর্জ্জন করিল "বলি হ্যালো হারামজাদি! এখন তোর কোন বাবা রাখে? যদি মেরে ফেলি তো কি হয়?

অবলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। অবলা ভাবিল "আমি মরিলে এ ছবির দশা কি হবে'। ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদিনীবৎ রোদন করিতে লাগিল। অবলা ছবিখানিকে দৃঢ়রূপে ধরিল। রাক্ষসী আবার বলিল "আমার সঙ্গে যদি ভাল চাস তো আয়, নহিলে খুন করে রেখে যাব"।

অবলা কোন উত্তর করিলনা। সেই ছবিখানিকে বক্ষে স্পর্শ করিয়া—একবার আকুল প্রেমে ছবির মুখের দিকে চাহিল, সেই ছবির মুখে কত ভাব কত ভাষা লুকান ছিল, অবলাকে সেই ভাব সেই ভাষা বলিল 'আমার জন্য মরিতে ভয় কি? যেন বারুদে আগুণ পড়িল—কোমল মেঘে বিদ্যুৎ চক্‌মক্‌ করিল। অবলা আকাশের পানে তেজস্বিনী দৃষ্টিতে চাহিল আকাশে সেইভাব—সেই ভাষা—স্বামীর জন্য মরিতে ভয় কি? অবলার মাথার উপরে আকাশে সেই ভাব সেই ভাষা—অবলার নীচে মাটীতে সেই ভাব সেই ভাষা। তখন চারিদিকের প্রকৃতি স্পর্শে অবলা নির্ভয়প্রাণে আপনার বুকে ছবি জড়াইয়া প্রেম ঘোরে আচ্ছন্ন হইল, অবলা উপস্থিত বিপদ ভুলিয়া দুচক্ষু মুদিয়া আপনার অন্তরে প্রবেশ করিল—সেখানে এক নবীন জগৎ দেখিল—সে জগতে অসীম আকাশ, আকাশের কুল নাই—সে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র—নীল পীত সবুজ অসংখ্য নক্ষত্র এবং আকাশের মধ্যে পুর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদ—আর সেই চাঁদের মধ্যদেশে—অবলার স্বামী মূর্ত্তি জীবন্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে—

দেখিবামাত্র অবলার শরীর ভক্তিপ্রেমে কাঁপিতে লাগিল—দুচক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অবলার শরীর কাষ্ঠের ন্যায় হইল—অবলা স্বামী মূর্ত্তি দর্শনে বাহ্য চৈতন্য হারা হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তির সহিত সেই মূর্ত্তি সম্ভোগে বিভোর থাকিল।

রাক্ষসী অবলাকে স্পর্শ করিল—অবলার দেহ অসাড় কাষ্ঠবৎ অবলার আলিঙ্গন হইতে সেই ছবি রাক্ষসী কাড়িবার প্রয়াস পাইল—কিন্তু পারিল না—হাত না কাটিয়া ফেলিলে সে ছবি বাহির করা অসাধ্য। মাঠের মধ্যে সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে জীবিত মনুষ্যের কাষ্ঠবৎ অবস্থা দেখিয়া রাক্ষসী বড় ভয় পাইল; ভূতগ্রস্ত ভাবিয়া "রাম" "রাম" বলিতে বলিতে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অবলার স্বামীধ্যান ভাঙ্গিল। তখন ভোর। গাছে গাছে পাখীর শব্দ হইতেছে। একটা পাপিয়া সমস্ত রাত্রি গান গাহিয়া তখনও ক্লান্ত হয় নাই—তার কালিদাসী গান তখনও আকাশে মধু বর্ষণ করিতেছে। আকাশে কাক উড়িতেছে।

অবলা ভাব ভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমোন্মাদিনী মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল :—একলা কলিকাতায় যাইব—স্বামীকে খুঁজিব। যাঁর ছবিতে এত সুখ, এত আনন্দ, না জানি তাঁর প্রকৃত মূর্ত্তি কত মধুর। পোড়া কপালীর সে সুখ নাই তা জানি ; তথাপি প্রাণ থাকিতে দেখিব, অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব। আমি স্ত্রীলোক, ছেলে মানুষ, কলিকাতা কেমন জানিনা। তাতে কি ? পথেপথে জিজ্ঞাসা করিব, বাড়িতে বাড়িতে খুঁজিব। সমস্ত জীবন ধরিয়া খুঁজিব। খুঁজিয়া না পাই খুঁজিতে খুঁজিতে মরিব। লজ্জা ? কিসের লজ্জা ? যাঁর জন্য লজ্জা তাঁরে যদি লজ্জা দিয়া পাই তো সে লজ্জা বিসর্জ্জন দেবনা কেন ? আমার লজ্জা আগে না স্বামী আগে ? মান ? স্বামী যেখানে মান আমার সেখানে—মান দিয়া যদি স্বামী পাই তো মান বাড়িবে কমিবেনা। তাঁর জন্য লজ্জার অধিক যাহামানের অধিক যাহা তাহাও বিসর্জ্জন দিব। অবলা আপনার সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিল :—স্ত্রীলোকের রূপ নানা বিপদের কারণ। স্বামী হারাইয়াছি—

ইহা অপেক্ষা আমার অধিক বিপদ আর কি আছে? পুরুষের অত্যাচার? অবলার মুখ চোখ লাল হইল—শিরায় রক্ত প্রবাহ খরতর বহিল; আকাশের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল—যদি খুঁজিয়া দিবার কেহ থাকিত তো আমার এদুর্দ্দশা ঘটিতনা; তাহা হইলে এবয়সে সংসার সাগরে ভাসিতে হইত না। যখন ভাসিয়াছি তখন দেখিব সাগরে রত্ন পাই কিনা।" অবলার সাহস জ্বলিয়া উঠিল। অবলা ভাবের তেজে ফুলিতে ফুলিতে মনে মনে বলিল, "আমার ধর্ম্ম যেদিন নষ্ট হবে সে দিন ধর্ম্মকে নরকে পচিতে হবে।"

অবলা মাঠ অতিক্রম করিয়া, কলিকাতার বড় পথে উঠিল। অবলা নিম্নদৃষ্টিতে একমনে স্বামী চিন্তা করিতে করিতে চলিল। পথে কত লোক সে মূর্ত্তি দেখিল। কেহ চমকিত কেহ বা চিন্তিত হইল। সে মূর্ত্তির প্রভাব দেখিয়া পথিক পাশ ছাড়িয়া সতীকে পথ দিল—যে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল সে হঠাৎ চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অবলা সালিখায় পঁহুছিল। একটী বড় পুষ্করিণী দেখিয়া সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য উপ-স্থিত হইল। পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিল। পুষ্করিণীটী প্রকাণ্ড। দুই ধারে দুই ঘাট। একটী পুরুষদের, একটী স্ত্রীলোকদিগের। অবলা স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে গিয়া বসিল। বসিয়া অবনত মুখে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল।

ঘাটের যত স্ত্রীলোক সব সেই দিকে চাহিল। কেহ কেহ জল হইতে ভিজা কাপড়ে অর্দ্ধস্নানেই উঠিয়া আসিল। যুবতী বালিকা বালক সকল অবলাকে বেষ্টন করিল। একজন বৃদ্ধা

মাথা মুছিতে মুছিতে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসিল, "তুমি—কাদের মেয়ে বাছা।"

অবলা কিছু বলিল না। কি বলিয়া পরিচয় দিবে তাহা ভাবিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা আবার বলিল "ছেলে মানুষ, রূপের কাঁদি দেখছি;—সঙ্গে কি আর কেউ আছে?" অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না"। অনেকে চমকিত হইল।

একজন স্ত্রীলোক কলসী-কক্ষে তুলিয়া ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল "এবয়সে একলা—ভাল কথা তো নয়"।

অবলা নানা লোকের নানাবিধ প্রশ্ন ও নানাবিধ মন্তব্য শুনিতে শুনিতে আপনার হতভাগ্যতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আকুল প্রাণে অত্যন্ত ক্রন্দনে নিমগ্ন থাকিয়া মাঝে মাঝে "না" "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিতে থাকিল। দেখিতে দেখিতে ঘাটে স্ত্রীলোকের গাঁদি লাগিল। এমন সময়ে অবলার পশ্চাতে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল। সে অবলার সম্মুখে আসিয়া বসিল। সেই স্ত্রীলোক বসিয়া অবলার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবলার সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যপূর্ণ মুখ—সেই গোলাপী ঠোঁট—গালে সেই একটী সুন্দর তিল;—দেখিবা মাত্র স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত চমকিত ভাবে, "ওমা! আমাদের অবলা নাকি?" অবলা অমনি সেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে সতৃষ্ণ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। অবলার চক্ষে জল ধারা বাড়িল—অবলা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া "কায়েত খুড়ি" বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্ত্রীলোকের গলা জড়াইয়া ধরিল। তার পর বুকে মুখ গুঁজিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে থাকিল। তখন ঘাটের স্ত্রীলোকদের ভিতরে একটা কৌতূহল জন্মিল।

সেই খুড়িমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করিল। খুড়িমা অবলার পরিচয় দিল। অনেকে শুনিতে শুনিতে কাঁদিতে লাগিল। একবৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অবলাকেও খুড়িমাকে আপনাদের বাটীতে লইয়া গেল।

তারপর কায়েত খুড়ির সঙ্গে তার খুড়ার বাড়িতে গেল। পথে যাইতে যাইতে কায়েত খুড়ি অবলার দুঃখের কথা শুনিয়া নিজের দুঃখের কথা বলিল :—মা! তুই ডাক্তর ডাকিতে গেলে সেই সর্ব্বনেশে দাঁত কাটা বাড়িতে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মৃতদেহের কাছে গিয়া বসিলাম। পিশাচ বিকট শব্দে আসিয়া তাঁহ দেহ স্পর্শ করিল। আমি ভয়ে ঝাঁটা লইয়া বঁটি লইয়া মারিতে গেলাম। যমদূত আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। আমি দাওয়া হইতে উঠানে পড়িয়া মুর্চ্ছিতা হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মুর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখিলাম, সে মূর্ত্তিও নাই মৃতদেহও নাই। আমি তখন দশদিক শূন্য দেখিতে দেখিতে উন্মাদিনীর মত বাটীর বাহির হইলাম রাস্তায় নামিয়া দেখিলাম, পিশাচ মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পলাই-তেছে। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। পিশাচ দেহ লইয়া মাঠে গিয়া পড়িল; দ্রুতবেগে অসুরের মত চলিল; আমিও পশ্চাতে চলিলাম। রাত্রি হইল। কত কাঁদিলাম, কাকুতি করিলাম, পিশাচ একবার ফিরিয়া চাহিলনা। পরিশেষে অনেক রাত্রে আকাশে ভয়ানক মেঘ হইল—মুসল ধারে বৃষ্টি আসিল। সেই দুর্য্যোগে পিশাচ মৃতদেহ লইয়া কোথায় গেল কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। একটা গাছের তলায় অচেতন প্রায় পড়িয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে

কাঁদিতে কাঁদিতে সেনপুরের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া কলিকাতায় আসিলাম।

খুড়ার বাটী কলিকাতার আহিরি টোলা। খুড়ার বাটীর বাহিরে কাপড়ের দোকান। অবলা খুড়ির সহিত কাপড়ের দোকানের সম্মুখ দিয়া খুড়ার বাটীতে প্রবেশ করিল।

অবলা ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে গেল। তেমন রূপ তাহারা কখনও দেখে নাই। বাড়ীর ভিতরে এক বৃদ্ধা ছিল, সে কি কাজ করিতে ছিল। দেখিবামাত্র একটু সরিয়া আসিয়া বলিল 'ওমা এযে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী'। অবলাকে বসিতে জায়গা দিল। অবলা বসিল। বাড়ির সকল স্ত্রীলোক অবলাকে ঘেরিয়া বসিল। সকলেই প্রথমে অবলাকে খাবার খাইতে বলিল। অবলা খাবার খাইল না, তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। অবলার মাতৃশোক, পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, স্বামীশোক সব একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই খানে একটী তিন বৎসরের ছোট ছেলে ছিল। সে মাতৃহীন। অবলার রূপ দেখিয়াই সে মনে করিয়াছে, এই তাহার মা। অবলার কান্না দেখিয়া সেই বালক কাঁদিতে কাদিতে অবলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে উদ্যত হইল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বালকের সেই ভাব দর্শনে উচ্চাহাস্যের রোল তুলিল। অবলা সেই বালককে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে আপনার শোকবেগ একটু সম্বরণ করিল। নিজের খাবারের অর্দ্ধাংশ সেই বালককে সস্নেহে খাওয়াইতে লাগিল। অবলার খাবার কিছু খাওয়া হইল না দেখিয়া বৃদ্ধা দোকান হইতে খাবার আনাইয়া অবলাকে খাইতে দিল। অবলা অনিচ্ছায় যৎকিঞ্চিত আহার করিল মাত্র, অবশিষ্ট সেই

বালকের হাতে ধরিয়া দিল। অমনি খাবারের রেকাবটী মাথায় তুলিয়া 'মা খাবা দেছে মা খাবা দেছে' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অবলা ভাবিতেছে যদি ইহারা এই ছেলেটীকে দেয় তো লইয়া মানুষ করি। স্ত্রীলোকের স্নেহ এমনি স্বর্গীয় পদার্থই বটে!

পরে সকলে অবলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কখন স্থির ভাবে কখন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার পরিচয় অবলা প্রদান করিল। অবলার সেই সব দুঃখের, বিপদের, সাহসের কথা আগা গোড়া শুনিয়া সকলেই কাঁদ কাঁদ হইল। অবলাও শেষে কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া, সেই বালকটী আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া অবলার গলা জড়াইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল কাঁদিস কেন ওমা কাঁদিস কেন? অবলা বালকের সেই অবস্থা দেখিয়া আরও শোকপীড়িতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। অবলা সেই কায়স্থের কন্যার ঘরে গিয়া বসিল। কন্যার নাম শশীমুখী। শশীমুখীর সহিত অবলার বেশ আলাপ হইল। বালকটী বরাবর অবলার কাছে আছে, সে অবলার কাছ ছাড়িতে চাহে না কেন না সে স্থির বুঝিয়াছে এই তাহার মা।

শশীমুখীর সহিত অবলার অনেক কথা হইতেছে এমন সময়ে বৃদ্ধা আসিয়া বলিল 'মা! তুমি ছেলে মানুষ এ বয়সে এখানে একা কেন এলে?

অ। আমি খুঁজিতে আসিয়াছি।

বৃ। কাকে?

শশীমুখী ইতিপূর্ব্বে সব শুনিয়াছিল সুতরাং ঠাকুরমাকে আগা গোড়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিল। বৃদ্ধা শুনিয়া কাঁদ্ কাঁদ্ হইল। বলিল 'মা! তোমার স্বামী বেঁচে আছেন, আর তোমার এই দশা? হা ভগবান!

শ। মুখে আগুণ ভগবানের।

বৃ। তা মা তুমি একলা কি সাহসে এলে? আর কখনও এসেছিলে'?

অ। না।

বৃ। ধন্য সাহস। তা তুমি কি ক'রে খুঁজে বাহির ক'রবে?

অ। তা কি আর ক'রবো!

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রুপ্লাবিত লোচনে অবলা এই কথা বলিল।

বৃ। মা! একলা আসতে একটু ভয় হ'ল না?

অবলা কাঁদিতে লাগিল। বালকটীও কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে অবলার চখের জল মুছিতে লাগিল। বৃদ্ধা আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল।

শশিমুখীর সহিত আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ। ভাই তোমার এখন বয়স কত?

অ। প্রায় ১৫ বৎসর হবে।

শ। স্বামীর বয়স কত?

অ। এখন বোধ হয় ২৩।২৪ বৎসর হবে।

শ। কত দিন দেখ নাই।

অ। ৮।৯ বৎসর হবে।

শ। চেহারা মনে পড়ে?

অ। সে চেহারা যদি না পাইতাম, তো এতদিন মাটিতে মিশিতাম।

শ। চেহারা কোথা পাইলে?

'এই দেখ' বলিয়া অবলা পেট কাপড় হইতে সেই ছবি দেখাইল।

সে ছবি যেন দরিদ্রের মাণিক তাই অবলা ভয়ে ভয়ে দেখাইতেছে।

শ। ভাই কি চমৎকার চেহারা।

অবলা এই কথা শুনিয়া আনন্দে উন্মাদিনী হইয়া শশীর গলায় সুন্দর হাতখানি রাখিল। শশীর মুখের দিকে চাহিয়া অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। অবলার এ বড় সুখের কান্না। সেই ছেলেটী 'আমি অবি দেখি' বলিয়া দুই হাতে ধরিয়া 'মা মা অবি মা মা অবি' এই কথা বলিতে বলিতে ছবিখানি মাথায় লইয়া নাচিতে নাচিতে অবলার হাতে দিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

অবলা কায়স্থদিগের বাটীতে ৪ দিন স্থিরভাবে থাকিল। বাহিরে স্থিরতা বটে কিন্তু প্রাণের ভিতরে শোকের আগুণ জ্বলিতেছে। ৫ম দিনে বৃদ্ধাকে বলিল 'আমি আর এখানে থাকিব না—যে কাজে আসিয়াছি সেই কাজে যাই।

বৃ। কি কাজ মা।

অ। আমার স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিব।

বৃ। সে কি মা! তুই যে দুধের ছেলে।

অ। না আমি তাঁকে খুঁজিব।

বৃ। এযে বড় সহর মা! কোথায় আছেন ঠিকানাটা যদি বলিতে পার তো আমারা খোজ তল্লাস করাই।

অ। ঠিকানা জানি না।

বৃ। আচ্ছা রোস। আমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি যদি খুঁজিতে পারে।

বৃদ্ধা ছেলেকে ডাকিল 'ও হরি'!

কেন?

একবার শুনে যাও।

যাই।

হরি আসিলে, বৃদ্ধা বলিল, ওই বামুনের মেয়েটীর বি-- তো সব শুনেছ।

হাঁ শুনেছি।

উনি এখন ওঁর স্বামীকে নিজে খুঁজতে যাবেন। উনি ছেলে মানুষ কি হবে?

তাঁর নামটী কি, বাড়ি কোথায়, চেহারা কেমন জেনে এস; খবরের কাগজে ছাবায়ে দি। যদি ওঁর অদৃষ্টে থাকে তো দেখা হবে।

হরি খবরের কাগজে চেহারা দেখিয়া চেহারা ছাপিয়া দিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিল। কিন্তু কেহই আসিল না তখন হরি বলিল, মা! কলিকাতায় তিনি নাই, তাহা হইলে তিনি কাগজ দেখিয়া আমার বাড়িতে আসিয়া নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রীর অন্বেষণ করিতেন।

অবলা শুনিয়া পাগলিনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবলার প্রাণ স্বামীর জন্য এত ব্যাকুল যে কথা কহিতে পারে না, ক্রমে মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল।

সেই ছেলেটীর নাম হাবুল। হাবুল অবলার সে অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অবলা উঠিয়া বসিল। হাবুল অবলার গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ দিয়া বলিল 'মা তুমি অমন ক'র না মা'। অবলা হাবুলকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিল। অবলা হাবুলকে বড় ভাল বাসিতে লাগিল। হাবুল ও অবলাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

অবলা যখন নির্জ্জনে স্বামীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিত হাবুল অবলার চখের জল মুছিত।

একদিন অবলা ছাদে উঠিল। একলা বসিয়া স্বামীর জন্য বড় আকুল হইল। প্রাণে আর কিছুই ভাল লাগে না।

সব যেন বিষের আগুণ। যে দিকে চায় সে দিকটা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। জগতের শোভা জগৎ ছাড়িয়া সেই ছবি খানিতে প্রবেশ করিয়াছে। অবলা সর্ব্বদাই নির্জ্জনে ছবি খানিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে। দেখে আর কাঁদে। কাঁদে আর মূর্চ্ছিতা হয়। আগে ছবি দেখিতে দেখিতে অবলা আনন্দে উন্মত্তা হইত, এখন ছবি দেখিতে দেখিতে স্বামীর জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুলা হয়। ব্যাকুলা হইয়া ছবি খানিকে বুকে করে, চুম্বন করে, আর পাগলিনীর মত ছবির সহিত কথা কয়। কথা কহিতে কহিতে আপনি ছবিতে হারা হয়। অবলার প্রেম উন্মত্ত। সে প্রেম স্বামীকে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে, সমুদ্রের তলে তলে, আকাশের তারায় তারায় খুঁজিয়া পায় তো বাহির করে। সে প্রেম চাঁদের কিরণ, রামধনুর সৌন্দর্য্য. সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, আকাশের গভীরতাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্বামীকে খুঁজিতে ব্যগ্র। সে প্রেম দরিদ্রতার কশাঘাৎ—মরুভূমির প্রচণ্ডতা, বজ্রের ভীষণতাকে বক্ষে ধরিয়া, স্বামীকে খুঁজিবার জন্য অস্থির। সে প্রেম, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ, ভূমি কম্পের প্রক্ষেপ, এবং ভূ বিপ্লবের সংহারক মূর্ত্তিকে আপনার ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বামীকে বক্ষে ধরিবার জন্য উন্মত্ত।

অবলা সে প্রেমের তেজ কি প্রকারে ধরিয়াছে তা ভগবানই জানেন। সে প্রেম দেখিলে, বোধ হয়, যেন অনন্তকে অতিক্রম করিয়া অনন্তের মস্তকে সিংহাসন রাখিয়া, সেই সিংহাসনে স্বামীকে বসাইয়া, আকাশের তারা ছিঁড়িয়া স্বামীর পদতলে অর্পণ করিতে পারিলে আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করে। অবলার দেহ প্রেমের এই প্রকার তেজ-প্রকাশ সহ্য

করিতে না পারিয়া একদিন ছাদের উপরে ঢলিয়া পতিত হইল। অবলার বাহ্য জ্ঞান নাই।

অবলা বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া মৃতার ন্যায় ছাদে পড়িয়া আছে। হাবুল চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। হাবুলের কান্না শুনিয়া বাড়ির অপরাপর স্ত্রীলোকেরা ছাদে আসিল। আসিয়া দেখিল অবলা মৃতবৎ পতিতা। বৃদ্ধা, শশী, শশীর মা, কায়েত খুড়ি মুখে চোখে জল দিতে লাগিল, বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে অবলার সংজ্ঞা হইল।

অবলাকে আস্তে আস্তে ধরিয়া নিম্নে লইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা একটু সুস্থির হইলে, বৃদ্ধা বলিল 'মা! চল কাল আমরা সব তারকেশ্বর যাই।' বৃদ্ধা ভাবিয়াছে একটু স্থানান্তর করিলে অবলার মনটা ভাল হইবে। অবলা কিছুই বলিল না। শশী, শশীর মা তারকেশ্বর যাইবার কথায় বড় আনন্দিত হইয়া স্থির করিল কালই তারকেশ্বরে যাইবে।

অবলাকে সঙ্গে লইয়া সকলে তারকেশ্বর যাত্রা করিল। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা, কায়েতখুড়ি একে একে পূজা করিয়া অবলাকে পূজা করিতে বলিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই অবলা উন্মাদিনীর মত তারকেশ্বরের দিকে, ফুল চন্দন বিল্বপত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে কাঁদিতেছিল—অবলা ভাবিতেছিল হতভাগিনী এমনি করিয়া স্বামীকে কবে পূজা করিবে? "বাবা তারকেশ্বর! যদি সত্য হও, তো, আমার এ আশা পূর্ণ করিও"। অবলাকে পূজা করিতে বলিলে অবলা পূজা করিতে বসিল—অবলা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—দুচক্ষু বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতেছে—অবলা ফুল চন্দন লইতে

গিয়া ভীষণ দুঃখে অস্তিত্ব মুচড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "ভগবান! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—এখনও একদিনও স্বামীর পাদপদ্ম পূজা করিতে পারি নাই—স্বামীর পূজা না করায় আমার দেহ মন মহা পাপে মলিন রহিয়াছে সে মলিন মনে আপনার পূজা করিয়া আপনার শ্রীচরণে কলঙ্কারোপণ করিব না। ঠাকুর! স্বামীকে আগে পূজা না করিয়া আপনার পূজা আমি করিতে পারিলাম না সেজন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ভগবান! আশীর্ব্বাদ করুন আপনাকে যেমন ভক্তির সহিত লোকে পূজা করে আমার প্রাণেশ্বরকে যেন তেমনি ভক্তির সহিত পূজা করিতে পারি। কাঁদিতে কাঁদিতে এই প্রকারে আত্ম নিবেদন করিতেছে এমন সময়ে অবলার ভিতরে ভাব ঘন হইয়া আসিল—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির হইল—অবলা শক্ত হইয়া পড়িয়া গেল।

তখন মন্দিরের ভিতরে "কি ভক্তি! কি ভক্তি"! বলিয়া একটা গোলমাল হইল। অবলাকে কায়েতখুড়ি কোলে করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া বসিল। মেয়ে পুরুষের একটী প্রাচীর মুর্চ্ছিতা সতীকে বেষ্টন করিল। কত রমণী অবলাকে প্রণাম করিতে লাগিল। অবলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। অবলার তখন নূতন রূপ নূতন মূর্ত্তি—দেখিলে মনে হয় সতীত্ব ও সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া এক নূতন মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা উন্মত্ত ধুমকেতুর ন্যায় কলিকাতায় স্বামীকে খুঁজিতে বাহির হইল। কলিকাতার যে দিকে চায় অট্টালিকার সমুদ্র—অট্টালিকার অরণ্য। তাঁহার হারাণ মাণিক সাগর ছেঁচিয়া বাহির করিবে।—জঙ্গল খুঁজিয়া অঞ্চলে বাঁধিবে। লোক লজ্জা? তাহা অবলা জলাঞ্জলি দিল—বিপদ সম্ভাবনা? দেহে একবিন্দু শ্বাস থাকিতে কার সাধ্য অবলাকে কলঙ্কিত করে;—অবলা বিপদের ঝটিকা, বিপদের সমুদ্র মনে মনে ভাবিল আবার মনে মনে নিজ বলে তাহা উড়াইয়া দিল—যে, স্বামীর জন্য মৃত্যুর অধিক সহিতে পারে অনন্ত নরক বহিতে পারে তার আবার বিপদের ভয়? অবলা ভিখারিণীর বেশে এবাড়ি হইতে ওবাড়ি খুঁজিতে লাগিল। অবলা রাস্তা দিয়া যায় কত লোকেসেই সতী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠে, ভক্তিতে পূর্ণ হয়——ভীষণ পাষণ্ডও সে মূর্ত্তি দেখিয়া মন্দভাব ভুলিয়া যায়। অবলা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে তার পর ফিরিয়া কায়েত খুড়ির কাছে আসে।

এক দিন অবগাহে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিল। সমস্ত দিন কিছু খায় নাই তাহার উপর রাস্তা হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল, গাড়ি ঘোড়ার যাতা-য়াত, কমিয়া সহর ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইল। ঘড়িতে টং টং করিয়া ১২টা বাজিল। অবলা জোড়াসাঁকোর রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া

নিদ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে একটী বাটীর দ্বারের কাছে বসিয়া অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল। অবলা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া, গভীর নিদ্রায় অচেতন প্রায় পড়িয়া থাকিল। অবলা দ্বারের কাছে ঘুমাইতেছে, কাছে একটী কুকুর শুইয়া আছে—এমন সময়ে বাড়ির দ্বার খুলিয়া একটী স্ত্রীলোক বাহির হইল। বাহির হইয়াই দেখিল, দেখিবামাত্র চিনিল, আবার বাড়ির ভিতরে গিয়া একটী পুরুষকে ডাকিল। পুরুষ দেখিয়া বলিল—'সেই বুঝি'?

স্ত্রীলোক বলিল 'এমন সুবিধা আর হয় না'।

পুরুষ বলিল "সেই ঔষধটী আন, শুঁকাইয়া অজ্ঞান করিয়া বাড়ির ভিতরে তুলিয়া লইয়া যাই।"

স্ত্রীলোক সেই ঔষধ আনিল—অবলার নাকের কাছে ধরিল। তার পর বলিল 'নাওনা, বুকে ক'রে ল'য়ে চল'—

পুরুষটী কাঁপিতে কাঁপিতে অবলাকে স্পর্শ করিতে গিয়া পারিল না—সে বলিল, না আমি পারিব না—তুমি লয়ে চল।

স্ত্রীলোক অবলাকে বক্ষে ধরিয়া দ্বিতলের উপরে লইয়া গেল। সুন্দর শয্যায় শয়ন করাইল। অবলার চারিদিকে ফুল ছড়াইল—আতর গোলাপ ছড়াইল। পুরুষকে বলিল আর একটী ঔষধ শুঁকাইয়া দাও নতুবা মরিয়া যাইবে। ঔষধ শুঁকাইয়া দিল, কিন্তু অবলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

স্ত্রীলোক বলিল 'এইবার আমি ঘরে শিকল দিয়া ও ঘরে যাই তুমি তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ কর।'

পুরুষ বলিল, 'সাদা চক্ষে পারিব না ভাল করে মদ খাই।'

স্ত্রীলোক চক্ষু ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল, "ওরে মদ টদ সবই আছে আমি যাই—দেখ যেন সব না কেঁসে যায়।"

পুরুষটী মদ খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে খুব নেশা হইল। উন্মত্ত হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে অবলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে আর ভয়ে বুক দুড় দুড় করিতেছে। দুর্বৃত্ত পা তুলিতে বড় কষ্ট বোধ করিতেছে, সমুদয় শরীর থর থর কাঁপিতেছে—অবলার দিকে চাহিতেছে—আর ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। স্বপ্নে যেমন মানুষ চলিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু পা আর অগ্রসর হয় না; দুর্দ্দান্তের সেই দশা উপস্থিত। অনেক কষ্টে বিছানার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি সহসা কি স্বপ্ন দেখিয়া অবলা জাগ্রত হইল। অবলা স্বপ্ন দেখিল, যেন কে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত। অবলা জাগ্রত হইয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল "পাপিষ্ঠ! ধর্ম্ম কি নাই—ধর্ম্ম কি নাই" সেই চীৎকারে অন্য ঘটনা সংযুক্ত হওয়ায় পাপিষ্ঠ কম্পিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সহসা ঘরের দেয়াল, জানালা, চৌকী সব কাঁপিয়া উঠিল। সিন্দুকের উপর হইতে গেলাস আর্সি সব ভূতলে পড়িল, দেয়ালের গা হইতে ১খানা ছবি খসিল। চারিদিকে শাঁখ ঘণ্টা বাজিল। এ কি! হঠাৎ ভূমিকম্প যে। 'পাপিষ্ঠ আরও ভীত হইয়া উঠিল। অবলা, ঈশ্বর তাহার সহায় ভাবিয়া উন্মত্তভাবে বিছানা হইতে আসিয়া দ্বার খুলিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু দ্বার বন্ধ। সেইভূমিকম্পের সময় সেই স্ত্রীলোক—সেই দুষ্টা ভিখারিণী দ্বারের শিকল খুলিল। অবলা অমনি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

অবলা সেই রজনীতেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। স্বামীকে কলিকাতার বাহিরে খুঁজিয়া বাহির করিবে। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে তা জানে না; বরাবর একমনে উন্মত্তভাবে চলিয়াছে। অবলা এক মাঠে গিয়া পড়িল। রাত্রি শেষ হইল। মাঠে গিয়া একটী বড় রাস্তা পাইল, সেই রাস্তায় উঠিয়া বসিল। বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে! সেই রাস্তার দুধারে বাব্‌লা গাছ, খেজুর গাছ। দুই একখানা ঘোড়ার গাড়ী, দুই একজন লোক ক্রমশঃ চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে আবার একটী ভিখারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

এ সে দুষ্টা ভিখারিণী নয়। ইহার চক্ষু দেখিলে সদ্ভাবের উদয় হয়। মলিন বসন পরিধান। চুল আলুলায়িত—রুক্ষ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে একটী বাড়ি। বয়স ৪০ বৎসর হইবে। সে আসিয়াই অবলার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল, তুই তোর স্বামীকে খুজিতেছিস? বলিয়াই একদৃষ্টে অবলার মুখের উপরে চাহিয়া থাকিল।

অবলা কখনও তাহাকে দেখে নাই, অথচ সে কি প্রকারে অবলার মনের কথা বলিল। অবলা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, দেখিয়া ভিখারিণী বলিল "তোর মুখ চোখ দেখে তোকে বড় ভাল বলে বোধ হয়। তুই স্বামীকে খুঁজে তো পাবি না। তোর স্বামী নিজেই দেখা দেবে।"

অবলা কম্পিতস্বরে বলিল "আপনি কে? আপনি আমার

সব কথা কি প্রকারে জানিলেন ?”

ভি। সে কথা জেনে তোর কি হবে ? ছেলেবেলায় তোর মা বাপ মারা গেছে নয় ?”

অবলা পিতৃমাতৃ শোকে অধীরা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভিখারিণীর দুই পা জড়াইয়া বলিল “আমি আপনার কাছে থাকিব—আমার আর কেহ নাই। আমি স্বামীকে কি প্রকারে পাইব বলিয়া দেন”।

ভি। তোমার সাধ্য নাই স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির কর। যদি খুঁজিতে যাও তো হারাইবে, আর যদি পাইবার আশায় স্থির মনে থাক তো নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাইবে।

কথা শুনিতে শুনিতে অবলার দুঃখের আঁধার যেন কাটিতেছে সুখের আলো দেখা দিতেছে। অবলা উল্লাষিত প্রাণে বলিল তিনি ভাল আছেন।

ভিখারিণী একটু হাসিয়া বলিল ‘তা আমি কি জানি ? আমি তো তাঁকে দেখি নাই।’

অ। আপনি তবে অত কথা কি প্রকারে জানিলেন ?

ভি। আমরা যোগবলে সব জানিতে পারি।

অ। আপনি যোগিনী ?

ভি। হাঁ আমি যোগিনী।

অ। আমার স্বামীর নাম কি বলিতে পারেন ?

ভিখারিণী চক্ষু মুদিয়া ভাবিয়া বলিল ‘পারি’।

অ। কি বলুন ?

ভি। ‘আমায় পরীক্ষা করিতেছিস্’ ?

অ। না। যোগের বল বুঝিতেছি।

ভি। তোমার স্বামীর নাম 'যোগেন্দ্র'।

অবলার শরীর কণ্টকিত হইল। দু চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িল।

অ। তিনি কেমন আছেন?

ভিখারিণী চক্ষু মুদিল। দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইল। অনেকক্ষণ মৃতের ন্যায় বসিয়া থাকিল। পরে চক্ষু খুলিয়া বলিল 'তিনি ভাল আছেন, কিন্তু তোমায় তিনি একবারে ভুলিয়াছেন'।

শেষোক্ত কথাটী শুনিবামাত্র অবলা "মাগো" বলিয়া মূৰ্চ্ছিতা হইয়া যোগিনীর পদতলে পতিতা হইল। যোগিনী অনেক যত্নে মূৰ্চ্ছা ভঙ্গ করিল।

অবলা মূৰ্চ্ছা হইতে উঠিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিল।

যোগিনী বলিল, অমন করে থেক না, তাঁর সহিত তোমার দেখা হবে।

অ। কবে দেখা হবে?

ভি। ৮ বৎসর পরে।

অ। তিনি আমায় লবেন তো?

ভি। তোমার অদৃষ্ট বড় ভাল—কিন্তু বড় খারাপ।

অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ভি। তুমি সতী সাবিত্রী, কিন্তু স্বামী তোমায় গ্রাহ্য করিবেন না। তোমার অদৃষ্টের আরও অনেক কথা আছে কিন্তু আমি বলিব না—কখনই বলিব না। কিন্তু তুমি স্বর্গ লাভ

করিবে—ভগবান তোমার সতীত্বে মুগ্ধ হইতেছেন এবং আরও হইবেন।

এই বলিয়া ভিখারিণী চলিয়া যায়, অবলা অমনি দ্রুতভাবে গিয়া আঁচল ধরিল। ভিখারিণী বলিল 'মা আমার সঙ্গে তুমি কি যাবে'?

অবলা বলিল যাব—আমি আপনাকে ছাড়িব না যা বলিবেন তাই শুনিব।

ভিখারিণী বলিল 'তবে আমার মত ঝুলি কাঁদে কর, একগাছা ছড়ি হাতে লও, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দাও, আর গেরুয়া বসন পরিধান কর'।

অবলা বলিল "আমার কাছে ও সব তো কিছুই নাই"।

ভিখারিণী আপনার একটী পুঁটুলি হইতে একখানা গেরুয়া বসন বাহির করিয়া দিল। অবলা তাহা পরিধান করিল। পরে ভিখারিণী একটী ছোট ঝুলি অবলার কাঁদে দিল।

এই জীবন চক্রের গতি কখন কোন্ দিকে যায় কে বলিতে পারে? আজ মানুষ রাজা, কাল পথের ভিখারী।

সোণার লক্ষ্মী ভিখারিণীর বেশ ধরিয়া জীবন চক্রে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইল। সোণার প্রতিমা যখন গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া স্কন্ধে ঝুলি ঝুলাইয়াছিল, তখন বার কয়েক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু কাঁদিয়াছিল; কিন্তু সে বড় সুখের দীর্ঘশ্বাস, বড় সুখের কান্না। কারণ সে সব স্বামীকে পাইবার জন্য।

অবলা ভিখারিণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা ভিখারিণীর সহিত ভিক্ষা করিতে করিতে কয়দিন কাটাইল। একদিন ঘটনাক্রমে রাইপুর গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইল। অবলা ২ বৎসর বয়সের সময় মার সহিত সেই গ্রামে মামার বাড়িতে একবার গিয়াছিল বটে। সে অনেক দিনের কথা। অবলার সে সব মনে নাই।

প্রথমেই একটী বাড়িতে দুই জনে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই বলিল 'জয় রাধাকৃষ্ণ—'। বাটীর দ্বারের নিকটে দুইজনে দাঁড়াইয়া আছে; ভিতরে একটী স্ত্রীলোক রৌদ্রে মাথা শুকাইতেছে; 'জয় রাধাকৃষ্ণ' এই শব্দ শুনিবামাত্র তাহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল। 'আহা! কি সুন্দর রূপ' বলিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাদিগের নিকটে গেল। অবলাকে দেখিবামাত্র একটু কেমন স্নেহ জন্মিল। কে যেন পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিল 'ও তোর আপনার লোক।'

স্ত্রীলোকটী সেই ভিখারিণীকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল 'হাঁগা এটী বুঝি তোমার মেয়ে'?

ভি। না মা আমার মেয়ে নয়।

স্ত্রী। তবে উটী কে?

ভি। কেউ নয়—তবে কুড়িয়ে পেয়েছি;—মেয়ের মতনই ওকে ভাবি।

কুড়িয়ে পেয়েছি, এই কথাটী শুনিবামাত্র স্ত্রীলোকের গা শিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছ'?

অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটী তখন অবলাকে বলিল 'হা মা তুমি কাঁদ কেন' ?

অবলা চুপ করিয়া থাকিল। ভিখারিণী বলিল 'মা ও মেয়েটীর, পরিচয় জেনে আর কি হবে? ও আমার সহিত ভিক্ষা করে। দুটী ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা হয় দাও, আমরা চলিয়া যাই।'

স্ত্রীলোকটী বলিল, পরিচয় দিতে বাধা কি মা! আমার মেয়েটীকে দেখে প্রাণটা কেমন ক'রে উঠছে।

ভিখারিণী বলিল 'মা ওর বড় দুরদৃষ্ট—! ভগবান যে কেন ও রূপের সৃষ্টি ক'রেছিলেন তাহা জানি না। ওর ছেলে বেলাতেই মা বাপ মরেছিল। বিবাহ হয়েছে—স্বামীও আছে,—কিন্তু সে না থাকাই।

অবলা আপনার পরিচয়ের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় হেঁট্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটীর অত্যন্ত দয়া হইল—অবলার কান্না দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্ত্রীলোকটী অবলার হাত ধরিয়া কাছে আনিয়া অবলার চিবুক ধরিয়া বলিল 'মা তোমার নাম কি' ? বলিয়াই অবলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল।

অবলা মৃদুস্বরে বলিল 'অবলা বালা'।

স্ত্রীলোকের শরীর কণ্টকিত হইল, লোচনদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

তোমার পিতার নাম ?

হরিনাথ।

সেই—স্ত্রীলোকটীর বুক গুর গুর করিয়া উঠিল।

তোমাদের বাড়ী ?

সেনপুর।

স্ত্রীলোক পাগলিনীর ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অবলাকে বক্ষে ধরিয়া বলিল 'মা অবলা! তুই কি এখনও বেঁচে আছিস! আমি যে তোর মামী—। মা! তোর এবেশ কেন মা! আমরা বেঁচে থাক্‌তে তোর এ দশা কেন মা'!

স্নেহের বেগে বিনোদিনী অবলাকে বুকে ধরিয়া বসিয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে গৃহ মধ্যস্থ স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল 'ওগো একবার বের'য়ে এস গো আমাদের অবলাকে একবার দেখে যাও'।

রামদাস তীর বেগে ঘরের বাহিরে আসিয়া সেই ঘটনা দেখিল। বলিল 'কি? কই অবলা? অবলা যে নাই অবলাকে যে অনেক খুঁজে পাই নাই।

কামিনী বলিল 'এই আমার কোলে অবলা'।

রাম বলিল 'ওর যে ভিখারিণীর বেশ'।

বিনোদিনী বলিল ওগো না—এই আমার অবলা— 'পরিচয় জিজ্ঞাসা করনা'।

রামদাস এতক্ষণ ভাল করিয়া দেখে নাই। এখন ভাল করিয়া দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'মা! অবলা! তুই কি আমার সেই অবলা'? বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবলার হাত ধরিল।

এই অবসরে সুবিধা পাইয়া যোগিনী পলায়ন করিল। যোগবলে সে সব বুঝিয়াছিল—বুঝিতে পারিয়াই সে সেই বাটীতে অবলাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

বিনোদিনী অবলাকে ঘরে লইয়া সে সব কাপড় ছাড়াইয়া ভাল কাপড় পরিতে দিল। যোগীনীকে খুঁজিয়া কেহ আর পাইল না।

অনেক দিনের পর ভাগিনীকে পাইয়া মামা মামী আনন্দের সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহাদেরও আর কেহ নাই—ভাগিনী অবলাই তাহাদের একমাত্র সামগ্রী।

ভাগিনীর মুখে দুরবস্থার বৃত্তান্ত আগা গোড়া শুনিতে শুনিতে রামদাস ও বিনোদিনী কখন অশ্রুবিসর্জ্জন, কখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মামার বাড়িতে অবলা খুব যত্নে রহিল। অবলাকে পাইয়া তাহারাও যেন প্রাণ পাইল। রামদাস অবলার স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। অনেক অন্বেষণ করায় জানিতে পারিল, অবলার কপাল জন্মের মত পুড়িয়াছে।

শুনিয়া অবধি রামদাসের মাথা ঘুরিয়া গেল। অমন রূপের প্রতিমাকে বৈধব্য দশা ভুগিতে হইবে—থান কাপড় পরিতে হইবে—একসন্ধ্যা আহার করিতে হইবে, এইসব ভাবিতে ভাবিতে মামার প্রাণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। অবলাকে দিন

কস্তক জানিতে দিল না। বিনোদিনীকে চুপে চুপে বলিয়াছিল মাত্র। অবলা এসব কিছুই জানে না।

সতী অবলা স্বামী বই আর কিছুই জানে না। স্বামীই তাহার ঈশ্বর। অন্যান্য লোকেরা কত দেবতার পূজা করে, অবলা কেবল স্বামীরই পূজা করিয়াই থাকে।

অবলা মামার বাড়িতে একটী আলাদা ঘর পাইয়াছিল। সে ঘরে কেহ যাইত না। অবলা একলা সেই ঘরে বসিয়া স্বামীর ধ্যান করিত।

একদিন বিনোদিনী দেখিল, অবলা ঘরের খিল বন্ধ করিয়াছে। ভিতরে মেজেতে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া কি নাম জপ করিতেছে। ভক্ত যেরূপ ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে পাগল হয়, বাহ্যজ্ঞান হারায়, অবলাও সেইরূপ পাগলিনীর মত চক্ষু মুদিয়া কি নাম জপ করিতেছে।

সে ঘরের কপাটের খিল্‌টা কিরূপ আল্‌গা ছিল, একটু জোরে ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। অবলা কিছুই জানিতে পারিল না। বিনোদিনী দেখিল বালার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে এবং শরীর মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছে। হাতের মালা হাতে স্থির ভাবেই আছে কিন্তু মুখে বিড় বিড় করিয়া শব্দ হইতেছে 'যোগেন্দ্র—যোগেন্দ্র—যোগেন্দ্র'।

অবলা স্বামীর নাম জপিতে জপিতে বাহ্যজ্ঞান হারা। সতী অন্তরের মধ্যে স্বামীর রূপ সাগরে আপনার আত্মাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। স্বর্গ হইতে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, বেহুলা অবলার এই স্বামী ধ্যান দর্শনে বিমোহিত হইয়া অবলার আত্মাকে

আলিঙ্গন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইতেছে। আদ্যাশক্তি ভগবতী সে মাধুরী দর্শনে প্রেমে পাগলিনী হইয়া অবলার মুখ চুম্বন করিতেছেন। সমুদ্র সতীর সেই নয়নাশ্রু বিন্দুকে মুক্তারূপে আপনার বক্ষে ধরিবার জন্ত কল কল স্বরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছে।

বিনোদিনী অবলার সেই অনুপমা বাহ্যরূপের ভিতরে স্বর্গের অত্যুজ্জল প্রাণারাম রূপের প্রকাশ দেখিয়া ভাবিল, মা অবলা আমার বোধ হয় ভগবতী, নহিলে এমন রূপের ভিতরে এমন রূপ কোথা হইতে আসিতেছে? বিনোদিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'ভগবান! এমন মেয়েকেও কি বিধবা করিতে হয়'! এই কথা বলিয়াই মনে মনে ভীত হইয়া বলিল "তাই তো কি করিলাম, তিনি যে বারণ করেছেন"।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মামার বাড়িতে গিয়া অবলা একটী বন্ধু পাইয়াছিল; তাহার নাম নলিনী। নলিনীর রং কাল। যে কালতে মানুষ চটিয়া যায় এ সে কাল নহে। কালতে শ্রীছিল, বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল। একটা ঢল ঢলে লাবণ্য লালিত্য সে কালর উপরে এমনি ভাবে মাথান যে তাহা দেখিলে অনেকের গৌর বর্ণের উপর, সোণার রঙের উপর বিরক্তি জন্মিত। নলিনীর মুখের এমনি একটা মাধুরি এবং সুগঠন যে তাহা দেখিলে অনেকের হৃদয় যেন একটা সৌন্দর্য্য নেশায় মাতিয়া উঠিত—প্রাণটা কেমন এলাইয়া পড়িত, হৃদয়ে কুভাব আদতে উঠিতনা। ভাল—গান শুনিলে যেমন প্রাণ গলিয়া যায় নলিনীর সেই মুখ দেখিলে অনেকের প্রাণ মন গলিয়া যাইত;—অনেকের স্মৃতিতে তাহা গম্ভীর রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। যে মুখ ঘোমটায় লুকাইয়া রাখিবার উপযুক্ত, অধিক খোলা থাকিলে পৃথিবীর দাগ পড়িবার সম্ভাবনা, নলিনীর এ সেই মুখ। সেই মুখের দীপ্তিতে, চাহনিতে, হাসিতে একটা বন্য সরলতা, বন্য সতীত্ব স্পষ্ট প্রকাশিত হইত। অবলা সে মুখ দেখিয়াই নলিনীকে চিনিয়াছিল, আপনার প্রাণের মধ্যে নলিনীকে পুরিয়া রাখিয়াছিল। নলিনীর নম্রতা, স্বামী ভক্তি, গুরুসেবা অবলার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সময়ে সময়ে নির্জ্জনে নলিনীর সহিত অবলার প্রাণের কথা হইত। সতীতে সতীতে কথা।

একদিন বৈকালে অবলা আপনার ঘরে বসিয়া নামের মালা লইয়া স্বামীর নাম জপ করিতেছে। চক্ষু দিয়া পবিত্রতা ও প্রেমের কীরণ ফুটিতেছে। অবলা কখনও কখনও অনুরাগে বিগলিত হইয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতেছে। এমন সময়ে নলিনী ঘরের দ্বারে আঘাত করিল। দ্বার ভেজান ছিল খুলিয়া গেল। নলিনী গিয়া অবলার কাছে বসিল।

নলিনী বসিবার অল্পক্ষণ পরেই অবলা নামের মালাটী ঘরের দেয়ালের প্রেকে ভক্তির সহিত তুলিয়া রাখিল। মনের ভিতরে সে মালার প্রাণ লইয়া নলিনীর কাছে বসিল। বসিয়া মাঝে মাঝে প্রেকের মালার দিকে তাকাইতে থাকিল;—সে মালার আকর্ষণে মুগ্ধ প্রাণ হইয়া নলিনীর নিকটে স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে থাকিল।

নলিনী ধীরে ধীরে নোলকটী ঈষৎ নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ভাই! একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা ক'রব ভাবি তা আমার বড় ভয় করে।"

অ। আমি কি ভাই বাঘ যে খেয়ে ফেলবো! ভয় করে, এমন কি কথা ভাই!

ন। তোকে আমি ভাই মনে মনে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করি, এজন্য সব কথা ব'লতে সাহস হয়না।

অ। আমরণ! ভক্তি করবার লোক বুঝি আর খুঁজে পেলিনা। আমার সব চুল পেকেছে, দাঁতসব পড়েছে, থুথুরে বুড়ি হ'য়েছি, আমায় ভক্তি শ্রদ্ধা না ক'রলে চ'লবে কেন! আমরণ তোমার! যিনি ভক্তির সামগ্রী তাঁকে ভক্তি করিস। এখন তোর কথাটা কি খুলে বল।

ন। ভাই তোর কাছে এলেই আমার স্বামী চিন্তা বাড়ে, স্বামি-ভক্তি যেন উথলে উঠে। কবে স্বামীকে কি ব'লে মনে কষ্ট দিয়াছি সে সব ভেবে মনে মনে বড় যন্ত্রণা পাই।

এই সময়ে নলিনী দেখিল অবলার মুখ বড় ভারি হইয়াছে—অবলার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইতেছে। দেখিয়াই নলিনী হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইল, তাই ব্যথিত স্বরে বলিল, "ওকি ভাই! তুমি আমার কথা শুনতে শুনতে অমন হ'য়ে গেলে কেন! তোমার চক্ষু ছল ছল করছে, লাল হয়েছে, মুখের রঙে রক্ত ফেটে প'ড়ছে, তোমার চোখে জল এসেছে! এই জন্যই তো আমার জিজ্ঞাসা ক'রতে ভয় হয়। না ভাই! আর জিজ্ঞাসা করিব না"। বলিয়াই নলিনী অবলার সেই প্রেমলীলাময়ী মুখ কান্তির দিকে চাহিতে চাহিতে কাঁদ কাঁদ হইল।

অবলা প্রেমবেগ সম্বরণ করিয়া গভীর স্নেহে নলিনীর চিবুকটী ধরিয়া বলিল, "তোদের স্বামীসেবা হয়—আমার হয় না;—বলিতে বলিতে অবলা কাঁপিতে থাকিল, প্রাণের ভিতরে একটা কোমলতার আবেশে কিয়ৎক্ষণ বদ্ধ কণ্ঠা হইয়া নলিনীর মুখের দিকে পাগলিনীর মত তাকাইয়া থাকিল। তার পর আবার ধীরে ধীরে বলিল, "নলিনি! আমি পাষাণী, সে সুখে বঞ্চিতা। বোন! এখন তোমার কি কথা সব বল। তোমার কথা শুনে আমার বড় সুখ হয়।" অবলার সেই স্বর্গীয় ভাবস্পর্শে নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল,—ভগ্ন-স্বরে বলিল," ভাই! রাত দিন যে জপমালা ল'য়ে স্বামী ধ্যান করে—এর চেয়ে স্বামী ভক্তি তো দেখি নাই। অবলা! ভগবান তোমায় সুদিন দেবেন। একদিন তুমি তোমার প্রাণের

দেবতাকে পাবে,—তোমার দুঃখ শীঘ্র যাবে। অবলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "ভাই কি জিজ্ঞাসা ক'রবে কর"?

ন। হাঁ ভাই! অনেকে বলে জপের মালায় তো মানুষে ভগবানের নাম জপে;—স্বামীর আবার নাম জপা কি? গুরু কানে যা মন্ত্র দেন তাই জপে—স্বামীর নাম জপা আবার কি? আমি ভাল বুঝি নাই তাই তাদেরও ভাল বুঝাতে পারি নাই।

অবলা তখন প্রাণের গভীরতম স্থানের রহস্য কথা নলিনীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল:—

নলিনি! জ্ঞান হইয়া অবধি আমি স্বামীকে দেখি নাই। অনেকে যেমন ঈশ্বর দেখে নাই। কিন্তু শুনেছে মাত্র—শুনে সেই ধনে পাবার জন্য লালায়িত হয়, আমিও জানিনা কেন আমার স্বামী ধনকে পাবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। সামান্য ভাবে তাঁর চিন্তা না ক'রে পবিত্র জপ-মালা লয়ে তাঁর নাম চিন্তা করি। স্বামী আমার ইষ্ট দেবতা;—আমি স্বামী ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা জানিনা। আমার স্বামীর কাছে আর সব দেবতা ছোট দেবতা;—তাঁরা অপরের পূজার জন্য—আর আমার স্বামী আমার পূজার জন্য। অন্যান্য দেবতাকে পূজা করিবার লোক অনেক; আমার স্বামীকে আমি পূজা না করিলে তাঁর পূজা বন্ধ থাকে—আমি তাহা সহিতে পারি না। স্ত্রী যদি স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা না করে তো স্বামী মানুষের নীচতায় পড়িয়া থাকে,—আমার তাহা আদতে সহ্য হয় না। আর স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে অপরের ধ্যান করা পূজা করা আমার কাছে মহা পাপ ব'লে মনে হয়। স্বামী নীচে থাকবেন এবং আর একজন দেবতা হ'য়ে তাঁর উপরে উঠবেন, এ আমার

সহ্য হয় না ;—তাতে আমার বড় হিংসা হয়। তাই! যিনি স্বামী তিনি তো আমার সব ; তাঁর উপরে আবার কে ? আমার হাড়, রক্ত, মাংস, মন, প্রাণ যখন তাঁর চরণে দিলাম তখন তাঁর চরণ হ'তে কেড়ে ল'য়ে আবার কাকে দেব? নলিনি! স্বামী অপেক্ষা আর কাঁকেও কাছে দেখিনা—বড় দেখিনা। স্বামী আমার আশা ভরসা, স্বামী আমার গর্ব্ব অহংকার, স্বামী আমার মান অপমান, স্বামী আমার জীবন মরণ, স্বামী আমার ইহকাল পরকাল, স্বামী আমার একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর, পৃথিবীর আর যত কিছু সব তাঁর নীচে। তাই স্বামীকে ইষ্টদেবতা ভেবে তাঁর নাম জপ করি।

অবলা যখন এইসব কথা বলিতেছিল তখন সে মূর্ত্তির ভিতর হইতে যেন মা ভগবতী অবলার জিহ্বার ভিতরে জিহ্বা রাখিয়া, কণ্ঠের ভিতরে কণ্ঠ রাখিয়া, রূপের ভিতরে রূপ ফুটাইয়া, সতীত্ব ধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশে সে স্থানের আকাশ ও নলিনীর প্রাণকে স্বর্গে পরিণত করিতেছিল। নলিনী ভাবে বিহ্বলা হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীর নাম উচ্চারণ করিবার সময় অত অভিভূত হও কেন" ?—আপনাকে ভুলিয়া যাও কেন ?

অ। উহা অপেক্ষা মিষ্ট নাম নাই। উহা অপেক্ষা মিষ্ট গান আর নাই। তোরা বলিস, কোকিলের স্বরে স্বামীর নাম জাগ্রত হয়, আমার কাছে ভাই স্বামীর নামে ককিল, পাপিয়ার গান যেন চারিদিকে বাজিয়া উঠে। ও নাম জপিতে জপিতে পৃথিবীর দিক সকল ও নামের মিষ্টতায় পূর্ণ হয় ; নামের গন্ধে জগৎ ভোরপুর হয় ; পৃথিবীর তিক্ততা, দুঃখ যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত

তখন আর দেখিতে পাই না। আমার হাড়ে যদি কেহ ও নাম খুদিয়া দেয় তো আমার হাড়ের দেবত্ব হয়। আমি কত ভাবি আকাশের গায়ে তারকার গায়ে চন্দ্র সূর্য্যের গায়ে, ও মধুর নাম যদি কেহ লিখিয়া রাখে তো আমার প্রাণের সাধ যেন কতকটা মিটে। শুধু জপে প্রাণের সাধ ঘুচেনা, প্রাণের পিপাসা যুড়ায়না। ও নামে ব্রহ্মাণ্ড ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। ভাই নলিনি! কেন অভিভূত হই এখন বুঝতে পারলি।

কথা শুনিতে শুনিতে নলিনী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-ছিল;—নলিনীর কণ্টকিত দেহ প্রেমের মধুর উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আর অবলা তখন স্বর্গে কি মর্ত্তে কি ভগবানের হৃদয়ের ভিতরে তাহা বুঝিতে পারিতে ছিল না;—অবলা তখন প্রেমরূপিনী ভগবতী।

আর এক দিবস নলিনী, একছড়া বকুলের মালা ও একটী বৃহৎ গোলাপ ফুল লইয়া অবলাকে উপহার দিল। দিয়া বলিল, 'ভাই! তোমার জন্য কেমন সুন্দর জিনিস আনিয়াছি লও'।

অবলা একটু হাসিয়া বলিল, "ভাই! এগুলি তোমার তাঁকে ডাকে পাঠয়ে দাও। আমার মালার বড় অভাব কি না। তাই সমস্ত দিন ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে ব'সে বকুলের মালা গেঁথে এনেছ। তোকে এত কষ্ট করিতে কে ব'লেছিল। ঘাড়ে কত ব্যথা হ'য়েছে, আঙুলে কত লেগেছে।

না।* হাতে আবার কেন লাগতে গেল। তুমি কাঠের মালা জপ কর তাই তোমার জপের জন্য ফুলের মালা এনেছি। এক দিন এই মালায় স্বামীর নাম জপ করিস ভাই।

অ। আমরণ ও বুঝি কেবল কাঠের মালা। আমি ওতে যে গন্ধ পাই তেমন গন্ধ কি তোমার বকুল ফুলে আছে। তুই হাট হতে একছড়া কাঠের মালা কিনে আনিয়ে যদি দিন কতক তোর "শরচ্চন্দ্রের" নাম জপ করিস তো বুঝিতে পারিস বকুলের মালার চেয়ে কাঠের মালার গন্ধে কত সুখ। নলিনী! প্রাণ যার পুড়ে আছে, হাড় যার ভেবে ভেবে চুন হয়েছে তার কি ওসব মাটির ফুল ভাল লাগে। স্বামীগন্ধে আকুল হবার জন্য যে রাত দিন স্বামী ধ্যান ক'রেও নিজের পাপ ক্ষয় ক'রতে পারছেনা, তার কি স্বামী গন্ধ ছাড়া অন্য গন্ধ ভাল লাগে! নলিনী! তোর স্বামী আছে, স্বামী-ভক্তি আছে; আচ্ছা আমার মাথাছুঁয়ে বল দেখি—ভেবে দেখ দেখি স্বামীর শ্রীচরণের শোভার কাছে";—বলিতে বলিতে অবলার ভাবভরে কণ্ঠ রোধ হইল;—অবলা প্রেম মদিরা পানে পাগলিনী হইয়া, নলিনীর গলা জড়াইল; বুকে মুখ গুঁজিয়া উষ্ণ নিঃশ্বাসে, উষ্ণ অশ্রুজলে কিয়ৎক্ষণ ডুবিয়া স্বামীর শ্রীচরণ দেখিবার জন্য হৃদয়ের ভিতরে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা একটু স্থির হইয়া বসিল। নলিনী ভাবভরে ব্যাকুল প্রাণে কহিল, "অবলা! তুমি দেবী। বাস্তবিক আজ হ'তে স্বামী শ্রীচরণের গৌরব অনুভব করিলাম। সে চরণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কিছু পবিত্র সুন্দর জিনিস জগতে নাই। আমি হতভাগী; তোমার সঙ্গে থেকেও বুঝতে পারলাম না।

অ। ভাই! আমার দিদিমা বড় সতী ছিলেন। তেমন সতী

আমাদের দেশে কখনও জন্মে নাই। তিনি ব'লতেন কি শুনবি :—

> চ'লতে স্থাথে পদ্ম ফোটে
> ঘামে স্থাথে মুক্ত।
> পতির কথায় পরাণ ফাটে
> সেইতো সতী শক্ত॥

ভাই আমাদের সতীগীরি আর দুতিগীরি দুই সমান। কেমন সতী দেখতে তো পাচ্ছিস। পতির সঙ্গে দেখাই নাই। আমার দিদিমা প্রত্যহ ঠাকুরদাদার পাদকজল খেতেন। মাথার চুল দিয়ে পা মুছয়ে দিতেন। নলিনী! "আমার বৃথা জন্ম! আমার মত পাপীয়সী আর নাই। আমার ধ্যানেও ধিক আমার জপেও ধিক। পূর্ব্বজন্মে কত নারীকে পতিহীনা ক'রে তার ফল ভোগ করছি"। অবলা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। নলিনী অবলাকে বার বার কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, ভাই তুমি কাঁদ কেন? আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে যদি কাঁদ তো আর তোমায় কাঁদাতে আসবো না।

অ। কাঁদি যখন তখন জানিবি অবলার বড় সুখ। এ কান্নায় যদি সমুদয় জীবন কাটিয়া যায় তো বাঁচি। তাঁকে ভাবিতে ভাবিতে যখন কাঁদি তখন মনে হয় যেন তাঁর কাছে বসিয়া কাঁদিতেছি এবং তিনি সমুদয় দেখিতেছেন। তবে দুঃখ এই চোখের জল বুকে শুকায়, মাটীতে পড়ে, তাঁর চরণে পড়ে না। যদি কখনও পড়ে, তো, অবলার সুখের আর সীমা থাকিবে না। আর যদি কিছু দুঃখ থাকে, সে তো তাঁর জন্য— এ সুখের দুঃখ। নলিনী কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া থাকিল,—

কিয়ংক্ষণ পরে বলিল, ভাই! আজ তাঁকে একখানা পত্র লিখবো, পত্রে ঐ ছড়াটী লিখে পাঠাব, ও ছড়াটী তুই আর একবার বল। তোর মুখেই ওসব শোভা পায়।

অবলা গম্ভীর ভাবে বলিল :—

চ'লতে স্থাখে পদ্ম ফোটে
ঘামে স্থাখে মুক্ত।
পতির কথায় পরাণ ফাটে
সেইতো সতী শক্ত॥

আরও শোন :—

পদ্ম গন্ধ বড় ভাল সর্ব্বলোকে কয়।
পতিগন্ধ সতীর কাছে সবার সেরা হয়॥

ন। তুই তো ওসব এত দিন বলিস নাই। তোর দিদিমার ছড়া শুনে তোর দিদিমাকে দেখতে ইচ্ছা ক'রছে। ভাই! সেই ম'রে বুঝি তুই হ'য়েছিস।

অ। তাঁর পোড়া কপাল আর কি?

ন। আর ছড়া জানিস তো বল ভাই।

অ। শোন :—

পতির চরণ ধূলি পেয়ে সোণায় করে হেলা।
এমন সতীর পা দুখানি পূজি দুটি বেলা॥

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলা যে দিন শুনিল তার কপাল ভাঙিয়াছে—সে দিন হইতে তার দেহে সৌন্দর্য্য শুকাইয়া গেল। অবলার মুখের ভাষা থামিল। অবলা নিম্ন দৃষ্টিতে যেন পৃথিবী ভাঙিয়া স্বামী দেখিবার প্রয়াস পাইল। কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া যেন স্বামীকে খুঁজিতে থাকিল। জগতে যে খাইতে হয় তাহা ভুলিল। আপনার ঘরে ভূমিতলে শুইয়া থাকিল। স্বামী চিন্তায় জগৎ হারাইল—ঈশ্বরের সৃষ্টি ছাড়িয়া যেন নিজে এক স্বামী চিন্তাময় জগৎ সৃষ্টি করিতে থাকিল। সে জগতে আর কেহ থাকিল না—থাকিল অবলা এবং তার স্বামী। সে জগতের আকাশ, মাটী, জল, আগুন, সবই তার স্বামী, আর অবলা সেই জগতের—সেই মন্দিরের সেবা দাসী। অবলা কাহারও কথা শুনিল না—কাহাকেও কিছু বলিল না। কত লোক অবলাকে কত ডাকিল সাধিল—অবলা কোন উত্তর করিল না—মড়ার মত পড়িয়া থাকিল। রাত্রি আসিল। অবলা স্বপ্ন দেখিল। "সেন পুরের সেই বাটী"। সেখানে কেহ নাই। অবলার মা আসিয়া অবলাকে বলিল "অবলা একবার আকাশে দেখ"। অবলা দেখিল আকাশে রাত্রি হইয়াছে—আকাশে অন্ধকার সেই অন্ধকারে তারকা সকল জ্বলিতেছে—চাঁদ উড়িয়া যাইতেছে;—আর ভূতলে সূর্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে ভূতলের সূর্য্য নিবিয়া গেল—আকাশের চন্দ্র

নিবিয়া গেল—তারকা সকল নিবিয়া গেল;—তখন আকাশে ভূতলে ভীষণ অন্ধকার—অন্ধকারে আকাশ পৃথিবী বিলীন হইয়াছে। অবলার মা বলিল ঐ অন্ধকারে কে দাঁড়াইয়া দেখ। অবলা দেখিল সেই আঁধার হইতে এক মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। স্ত্রীলোক—পরিধান থান ধূতি। হাত উলঙ্গ। মাথার চুল আলুলাইত। সিঁথায় সিঁদুর নাই। মাথার চুল অন্ধকারে বিলীন। সেই মূর্ত্তি দণ্ডায়মাণ হইল—করজোড়ে উর্দ্ধদিকে চাহিল। চক্ষে অমনি আগুণ জলিল—অন্ধকারে আলো প্রকাশ পাইল—দুই চক্ষু দুই বড় বড় তারকার ন্যায় জলিতে লাগিল। আঙুলের দশ নখে আলো ফুটিল—পার দশ নখে আলো ফুটিল—মুখের ভিতর হইতে আলো ফুটিল—সিঁথার সিন্দুর স্থল হইতে জ্যোতি বাহির হইল। মাথার উপরে আলোর অক্ষরে কে লিখিল "হিন্দুর বিধবা"!

সেই মূর্ত্তি অবলাকে ডাকিল। অবলাকে কোলে করিল। অবলাকে অন্ধকারের ভিতর দিয়া কোথায় লইয়া গেল। এক দুর্গা মন্দিরে লইয়া গেল। অবলাকে মন্দিরে দাঁড়করাইয়া বলিল। "মা! একবার দাঁড়াও তোমায় পদ্ম ফুলে পূজা করি"। কথা শুনিয়া অবলা ভয় পাইল। সে মূর্ত্তি বলিল "মা! তুমি সাক্ষাৎ সতী ভগবতী। তোমায় বিধবা করে কার সাধ্য। আমি তোমায় পূজা ক'রে পর জন্মে যেন স্বামীর কোলে যেতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর"। তারপর অবলা দাঁড়াইল। সেই মূর্ত্তি অবলাকে পূজা করিল। পূজা করিতে করিতে অবলার ভিতর হইতে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি বাহির হইল। মূর্ত্তি আবার অবলার মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দির মধ্যে শব্দ হইল "অবলা—

তোমার স্বামী আছেন—তুমি হাতের লোহা খুলিও না—মাথার সিঁদুর মুছিও না। তোমার স্বামীর অমঙ্গল হইবে"। হঠাৎ অবলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অবলা চাহিয়া দেখিল অবলার স্বামী হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে।

অবলা কাহারও কথায় বিশ্বাস করিল না—সেই স্বপ্ন দেখিবার পর অবলার দেহে সৌন্দর্য্য ফিরিল। যেমন অবলা তেমনি হইল। লোকে আশ্চর্য্য হইল—অবলার সিঁথার সিন্দুরের উজ্জ্বলতা সে দিন হইতে বাড়িতে থাকিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।
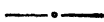
রামদাস একদিন কলিকাতায় যাইল। অনেক বৎসরের পর কলিকাতায় যাওয়ায় রামদাসের বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে একটু দেরি করিয়া চিনিতে লাগিল।

পুরান বন্ধু মতি বাবুর সহিত দেখা হইল। মতি বাবু ভারত উদ্ধারের দলের একজন প্রধান নেতা।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন "Child is the father of man অর্থাৎ সন্তান মানুষের বাপ। মতির ছেলে বেলার সেই সব

ভাবি theory of evolution এর (ক্রমবিকাশে নিয়মানুসারে খুব উন্নত হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, মতির দেহটী বাঙ্গালীর, আত্মা, প্রাণ, মন, কথাবার্ত্তা, চলা, খাওয়া, শোওয়া, স্বপন দেখা, প্রণয় করা সবই সাহেবের।

মতি বাবুর বৈঠকখানায় রামদাস বাবু মতি সাহেবের সহিত কথা কহিতেছেন:—

ম। রামডাস। এটডিন পাড়া গাঁয়ে ছেলে কি করে ভাই বোলটো ?

রা। পাড়াগাঁ তো ভাল।

ম। ড্যাম ন্যাসটী প্লেস। আচ্ছা ভারট উড্ডারের কি করিলে।

রা। তুমি কি করিলে ?

ম। টর্ম্মের ডারা হইবে না।

রা কিসে হইবে ?

ম। ডেশের স্ত্রীলোকেরা উন্নট না হইলে কিছু হইটে পারে না।

রা। তার যোগাড় করুন।

ম। বাঙ্গালীর ঘর হইটে সব স্ত্রীকে টাড়াইটে হইবে— টাহাদের স্থলে বিবি ডিগকে আনাইয়া বসাইটে হইবে।

রা। মা—খুড়ি—জেটাই—ভগিনী—স্ত্রী সকলকে তাড়াইতে হইবে ? এ আপনার কেমন কথা ?

ম। স্বার্থ ট্যাগ না করিলে কিছুই হইবে না।

সেইখানে একজন বৃদ্ধ বসিয়া সব শুনিতেছিল। সে রাগিয়া বলিল, 'আচ্ছা বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে, সেই পদে একজন

সাহেবকে বসালে তো হয়'।

মতি বাবু রাগিয়া বলিলেন 'সমাজ বিজ্ঞান পড় নাই গাচা ভুর হও'।

বৃদ্ধ পলায়ন করিল।

আবার দুজনে কথা চলিতে লাগিল।

ম। বিঢবা বিবাহটা বড় ডরকার হয়েছে।

রা। ও বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত। আমার একটী ভাগিনী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। তার বিবাহ আমি দিতে ইচ্ছা করি। মতি বাবু অমনি রামদাসের হস্ত মর্দ্দন করিয়া বলিলেন 'একে বলে মরাল কারেজ্‌।' আজই বিবাহ দেওয়া উচিট্‌।

রা। আমার দেখাদেখি আর কেউ যদি অগ্রসর হয় তো খুব সাহস হয়।

ম। আমি আমার খুড়ির আবার বিবাহ ডেব।

রা। বয়স কত?

ম। ৩৫ বট্‌সর হইবে। ২টী পুত্র আছে তাহারা এ বিষয়ে খুব অগ্রসর।

রা। ওটা আমার ভাল লাগে না।

ম। টুমি স্বাধীনটার মর্ম্ম বুঝ নাই।

রা পরলোকের বিষয় ভেবে চিন্তে কাজ কর্‌তে হয়।

ম। পরলোক টুমি মান! কি ভ্রম টোমার!!

রা। আপনি কি মানেন না?

ম। এখন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি। বিজ্ঞানের তেজে গড্‌ পর্য্যন্ত ভয়ে পলাইটেছেন। এখন ডুরবিক্ষণ ডারা কট ডুরের

জিনিস ভ্যাখা যাইটেছে। যডি পরলোক থাকিট টৌ ডুরবীক্ষণ নিশ্চয়ই দেখিট। ডুরবীক্ষণ আসিয়া পরলোকের ভ্রম টাড়াই-য়াছে। টুমি বি, এ পাশ করে এসব মান! ছ্যা ছ্যা। বি, এ এম, এ, পাশ করে যে পরলোক মানে—গড্ মানে, সে মূর্খ সে ইংরাজি শিক্ষার অপমান করে, সে ইউনিভার্সিটির উপাটির উপযুক্ত নহে।

রা। যাহা হউক আমার ভাগিনীর বিবাহ নিশ্চয়ই দেব। আপনি পাত্রের অনুসন্ধান করুন।

মতি বাবুর বড় আনন্দ। ইচ্ছা বাঙ্গালী না মেলে ফিরিঙ্গির সহিতই বিবাহ দিবেন।

তিন চারি দিন পরে পাত্রের সন্ধান হইল। পাত্রটী এম, এ। একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। ১০।১২ হাজার টাকার গহনা এবং পাত্রীর নামে সমুদয় বিষয় লেখা পড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত।

বিবাহের দিন স্থির করিয়া রামদাস বাড়ি চলিয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস বাবু বাড়িতে গিয়া স্ত্রীকে সব বলিল। স্ত্রী প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু বিষয়ের কথা শুনিয়া বলিল 'যদি শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের মত থাকে তবে তো ভালই। আর অবলার অদৃষ্টে যদি ভগবান সুখ লিখে থাকেন তো কে খণ্ডাবে।

অবলা লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিল—'স্বামী নাই' কিন্তু অবলা তাহাতে বিশ্বাস করে নাই। অবলার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যোগিণীর কথা মিথ্যা নয়। আমার স্বামী আছেন—নিশ্চয়ই আছেন।

ক্রমে অবলা মামীর কাছে সব শুনিল যে, তাহার বিবাহ-শ্রাদ্ধ হইবে। শুনিয়া অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'মামী তুমি আমায় অমন ঠাট্টা কর তো বিষ খাব'।

মামী বলিল 'না লো তাতে কোন দোষ নাই। বিদ্যা-সাগরের মতে কত বিধবার বিয়ে হ'য়েছে এখনও হচ্ছে'।

অবলা তামাসা মনে করিয়া চুপ করিল।

কিন্তু অবলা দেখিতেছে বাড়িতে বিবাহের বাস্তবিক যোগাড় হইতেছে। পাড়াতেও একটী গোল উঠিয়াছে যে 'ওদের অবলার আবার বিয়ে হবে'।

অবলা মামার বাড়িটীকে নরকের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। সে সব কথা শুনিয়া অবধি অবলা আর কিছু খায়

না কাহারও সহিত কথা কহে না। কেবল নির্জ্জনে বসিয়া সেই ছবিখানিকে দেখে আর কাঁদে। অবলা মনে মনে স্থির করিল, এবাটীতে আর থাকিব না, পূর্ব্বের মত ভিক্ষা করিতে করিতে দেশে দেশে তাঁকে খুঁজিব।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে বালা কাঁদিতে থাকিত। একদিন সন্ধ্যা আগত প্রায়। কলিকাতা হইতে পাল্কি করিয়া বর আসিল। ১০।১২ জন ভদ্রলোক ও রামদাস কলিকাতা হইতে উপস্থিত।

বিনোদিনী শাঁক বাজাইল।

অবলা সেই সব ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে। গভীর শোকাবহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে 'পৃথিবী! আমায় তোমার গর্ভে স্থান দাও। বাতাস! আমায় এখান হইতে উড়াইয়া লইয়া চল। মৃত্যু! আমায় পৃথিবী হইতে দূর কর'।

রাত্রি হইল। বিবাহের সমুদয় আয়োজন ঠিক্ হইল। রামদাস স্ত্রীকে বলিল, অবলাকে কাপড় পরায়ে কোলে করে ও ঘরে নিয়ে চল।

অবলা যে ইতিমধ্যেই সে বাড়ি কখন পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। বিনোদিনী ঘর খুঁজিল, অবলাকে পাইল না। ঘাটে গিয়া খুঁজিল, অবলাকে পাইল না। রামকে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল 'ওগো অবলা কোথা গেল। ঘাট থেকে আসি বলে যে গেল আর যে দেখতে পাই না। বোধ হয় বা সর্ব্বনাশ হল। রাম গ্রামের ঘরে ঘরে খুঁজিল কোথাও পাইল না। পরে ভাবিল 'সর্ব্বনাশ'।

বিনোদিনী বলিল 'যেমন বুদ্ধি তোমার! সে এসব দেখে ঘৃণায় হয় তো জলে ডুবেছে'। এই কথা বলিয়া বিনোদিনী 'মা অবলা গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামদাস স্তম্ভিত হইল। রামদাস থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এদিকে ভদ্র লোকদিগকে কি বলিবে স্থির করিতে পারিতেছে না; আবার সেই সোণার প্রতিমা অবলা কোথায় গেল ভাবিয়া আকুল হইতেছে।

রামদাস স্ত্রীকে ঘাটে লইয়া গেল। আরও দুই একজন লোক ডাকিয়া জল খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু জলে পাইল না।

সেই সময়ে গ্রামের ভয়ানক বনে একটী নেকড়ে বাঘ আসিয়াছিল। সকলে ভাবিল নিশ্চয়ই নেকড়ে বাঘে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। রামদাসের বাড়ির পেছনের বাগান খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল এক স্থলে ২টী আঙ্গুল পড়িয়া আছে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। রামদাস দেখিয়া মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; বিনোদিনী গভীর আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বর, বরযাত্রীগণ দেখিল রাত্রি প্রায় ১২টা বাজে। আর বাড়িতে সেই সব কান্না কাটনা। রামদাস কাঁদিতে কাঁদিতে ভদ্রলোকদিগের কাছে গিয়া বলিল, সর্ব্বনাশ! আমার ভাগি-নীকে বাঘে খাইয়াছে'।

ভদ্রলোকগণ অবশেষে সে বাড়ি সেই রাত্রেই পরিত্যাগ করিল।
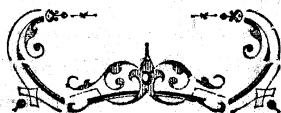
দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণিগঞ্জের ষ্টেসন হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে বিষমপুর নামে এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামের মধ্য দিয়া বড় রাস্তা চলিয়াছে। গ্রামের রাস্তার দুই ধারে দোকান।

একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্নে, সেই বাজারে একখানি ঘোড়ার গাড়ি আসিল। গাড়ির ভিতর হইতে একজন যুবা ও একটী যুবতী বাহির হইল। দুজনে দোকানে অনুসন্ধান করিয়া একটী ঘর ভাড়া লইল।

যুবার বয়স আনুমানিক ৩০ বৎসর হইবে। দেখিতে গৌরাঙ্গ। বুকের উপরে দাড়ি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত। দেখিলেই একজন বিদ্বান লোক বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতি গম্ভীর।

যুবতীর বয়স বোধ হয় ১৮।১৯ বৎসর হইবে। বিধাতার এও একটী অপূর্ব্ব গঠন। যেমনি ভাসা ভাসা চক্ষু, তেমনি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বদন, তেমনি নাক, কাণ, বক্ষ, কক্ষ, হাত, পা। যুবতী মন্থর গতিতে পা ফেলিতে ফেলিতে একটী গহনার বাক্স হাতে লইয়া যুবার সঙ্গে একটী ঘরে প্রবেশ করিল।

দোকানী একটী মাদুর ও একটী বালিস আনিয়া দিল।

একটু গ্রীষ্ম প্রভাবে যুবতীর ললাট দেশ হইতে মুক্তা ফলের ন্যায় ঘর্ম্ম বিন্দু পতিত হইতেছে দেখিয়া, রুমাল দিয়া যুবা যুবতীর মুখে বাতাস করিতে লাগিল।

যুবতী একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল 'এরকমে তো আর চলে না, এক যায়গায় স্থির হ'য়ে থাকা চাই।'

যুবা বলিল 'তা সে তোমার ইচ্ছা। হিন্দুশাস্ত্রের মতে বিবাহ তো হ'য়ে গেছে, এখন তো আর কোন ভয় নাই'।

যুবতী। দেশে কি প্রকারে যাওয়া যাবে?

যুবা। তুমি তোমার মাকে একখানা পত্র লেখ যে, আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এখন যদি তোমাদের মত হয় তো দেশে আবার যাই।

যুবতী। মা আমার জন্য ছট ফট্ ক'রছেন। কিন্তু বাবা খুব রেগেছেন।

যুবা। তোমার বাবা, যদি আমায় পান তো বোধ হয় কেটে ফেলেন।

যুবতী। তাঁর তো মত ছিল। আমি বেস জানি, আমি বিধবা হবার ৩।৪ দিন পরে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে আমার আবার বিবাহের জন্য গিয়াছিলেন।

যুবা। তা আমিও জানি। কেন, তিনি আমায় একদিন স্পষ্টই কোন বন্ধু দ্বারা বলাইয়াছিলেন, আমার বিধবা বিবাহে মত আছে কি না। যাই হ'ক ভয় নাই। আমি যখন এম, এ পাস করেছি, তখন আর ভয় নাই। এক রকমে চালাব।

যুবতী। সে যা হয় হবে, এখন খাওয়া দাওয়ার যোগাড় দেখ।

যুবা। কি খাবে?

যুবতী। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর না।

যুবা। খিচুড়িই তবে করা যাক্।

পরে দুজনে মহা আনন্দে খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইল। খাইয়া শয়ন করিয়া দুজনে কথোপকথন করিতেছে :—

যুবতী আচ্ছা, তোমার কি আর বিবাহ হয় নাই?

যুবা। ছেলে বেলায় হয়েছিল।

যুবতী। সে স্ত্রী তোমার কোথা?

যুবা। আমি তো কিছুই জানি না। আমার বয়স যখন ১০ বৎসর, আর আমার সে স্ত্রীর বয়স যখন ৩ বৎসর, তখন বিবাহ হয়। মেয়েটী খুব সুন্দরী ছিল। আমার শ্বশুরদের তো আর কেউ নাই। তাদের দেশে মাঝে বড় মড়ক হয়েছিল, সেই মড়কেই সব মারা গেছে।

যুবতী। বিবাহের পর তুমি আর গেছলে?

যুবা। না, যাই নাই।

যুবতী। ম'রে যদি না গিয়ে থাকে।

যুবা। তা হ'লে তোমার একটী সতীন আছে।

যুবতী। ওতে তোমাকে বিশ্বাস নাই।

যুবা। কেন?

যুবতী। স্ত্রীর খবর যে লয় না তাকে আবার কিসের বিশ্বাস। আমাকেও তো তুমি ওই রকম ভুলে যেতে পার?

যুবা। তা নয়। তুমি এক—আর সে এক। কবে ছেলে বেলায় মা বাপ ধরে বে দিয়েছিল, সে কি আর বিবাহ?

এই বিবাহই বিবাহ। এই বলিয়া স্ত্রীকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

দোকানের ঘরে জানালা নাই। কবাট বন্ধ করিলেই ঘরটী একটী প্রকাণ্ড সিন্দুক প্রায়। ঘরের ভিতরে দুজনের অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় দুজনে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া শয়ন করিল।

যুবতী বলিল 'ভয় কিছু নাই, আমি মা বাপের সবে একটী মেয়ে। বিষয় সবই আমার।'

যুবা। তুমিতো তাঁদের ঘরে ফেলে আমার সঙ্গে চ'লে এসেছ। দেশের সকলেই খারাপ ভাবে আমাদিগকে লয়েছে। তোমার বাপ জেনেছেন, মেয়ে আমার কুলে কালি দিয়েছে। এ অবস্থায় তোমার বাপ কি আর তোমার প্রত্যাশায় বিষয় রাখবেন? হয় তিনি পোষ্য পুত্র লবেন, না হয় আর কাকেও বিষয় দেবেন।

যুবতী। তিনি যাই করুন, তুমি বেঁচে থাক আমার ভাবনা কি?

এইরূপে কথা কহিতে কহিতে দুজনে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। বাজারে কুকুর গুলা মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করিতেছে। বাজারের রাস্তা দিয়া দুই এক খানা গোরুর গাড়ি কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছে। দুই এক জন গাড়োয়ান অশ্লীল গান গাহিতে গাহিতে গোরুর লেজ মলিতেছে। এমন সময়ে যুবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যুবার গায়ে হাত দিতে গেল—হাত ভূমের উপরে পড়িল। কই যুবা কোথায় গেল? যুবতী উঠিয়া

এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল, কই যুবা তো নাই! যুবতীর প্রাণ চমকিত হইল। প্রথমে ভাবিল বোধ হয় বাহে গিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া একটু অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। চারিদিকে কাক কোকিল ডাকিল। আকাশে সূর্য্য উঠিল। দোকানদারেরা দোকান খুলিল। সূর্য্যের আলোক ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু যুবার তথাপি দেখা নাই। যুবতীর মাথায় বাজ পড়িল! ভাবিল একি! কোথায় গেল। দোকানদারকে সে কথা বলিল। দোকানদার বলিল, তাইতো কোথায় গেলেন। দোকানদার একবার এদিক ওদিক খুঁজিল, কিন্তু দেখা পাইল না। যুবতী গহনার বাক্সটী লইয়া বিপদে পড়িল। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া যুবতী কাঁদিতে লাগিল। দুই একজন দুষ্টলোক যুবতীর কাছে মন্দভাবে যাতায়াত করিতেছে দেখিয়া, যুবতীর আরও ভয় হইল। যুবতী ঘরের ভিতরে গিয়া বসিল। ঘরের একটী ধারে পাগলিনীর মত বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে এমন সময়ে একটী অসামান্য-রূপ লাবণ্য-সম্পন্না রমণী একটী ঝাঁটা হস্তে সেই ঘরের কাছে উপস্থিত হইল।

এই রমণী প্রাতঃকালে সমুদয় বাজারের দোকান ঘর ঝাঁট দিয়া থাকে। প্রত্যেক দোকানী ঐ স্ত্রীলোকটীকে ঝাঁট দেবার দরুণ মাসিক চারি আনা করিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে স্ত্রীলোকটীর মাসে প্রায় ৫।৬ টাকা উপার্জ্জন হয়। ঐ ৫।৬ টাকা লইয়া রমণী পেটে খায় না, গরিব দুঃখিদিগকে দান করে। রমণীর পেট চলিবার জন্য বন্দোবস্ত ভগবান করিয়া দিয়াছেন। সেই গ্রামের একপার্শ্বে রমণীর একটী কুঁড়ে আছে। সেই

কুঁড়ে ঘরে, রমণী স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। গ্রামে যে একজন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য আছেন, তিনি প্রত্যহ একটী করিয়া সিদা পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই রমণীর জীবন রক্ষা হয়। বাজারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রমণীকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করে। গ্রামের মধ্যে যে ঘোরতর দুশ্চরিত্র সেও ঐ রমণীকে আপনার সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

রমণীর একখানি সামান্য পাড়ওলা ধুতী পরিধান। মাথায় দীর্ঘ সিঁদুরের রেখা। হাতে শাঁখা। দেখিলেই বোধ হয় স্বর্গের সমুদয় সৌন্দর্য্য—সমুদয় পুণ্য, সেই মূর্ত্তির ভিতরে জ্বলন্ত আগুণের ন্যায় জ্বলিতেছে। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির তলে বসিয়া কত দুশ্চরিত্র সচ্চরিত্রতা লাভ করিয়াছে—কত কুল-ত্যাগিনী যুবতী সেই সতীত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া কুলে ফিরিয়াছে।

রমণীর বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর হইবে। রমণী ঝাঁটা হস্তে সেই ঘরের কাছে দাঁড়াইবা মাত্র, ভিতরের যুবতীর মন যেন সবল হইল। যুবতী আপনার চক্ষের জল মুছিয়া রমণীর দিকে চাহিয়া থাকিল।

রমণী ঝাঁটাটী দ্বারের কাছে রাখিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া স্নেহমাখান স্বরে বলিল 'কেন দিদি অমন ক'রে বসে রয়েছ' ?

যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল দেখিয়া রমণীর হৃদয় একটু স্নেহ-বিগলিত হইল। স্নেহার্দ্র স্বরে রমণী যুবতীর হাত ধরিয়া বলিল 'আমি তোমার বড় ভগিনী। তোমার কিছু ভয় নাই। 'কি হয়েছে আমায় বল'।

যুবতী কান্নার বেগ একটু সম্বরণ করিয়া বলিল 'আমার স্বামী কোথায় গেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না।'

র। কখন গেছেন?

যু। রাত্রে দুজনে বাহিরে শুয়ে ছিলাম। ঘুম থেকে উঠে আর দেখ্‌তে পাই নাই। মনে ক'রলাম বুঝি বাহিরে গিয়া থাক্‌বেন; কিন্তু কই! এত বেলা হ'ল এখনত দেখা নাই। বলিয়াই যুবতী প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

রমণী যুবতীর উপস্থিত বিপদ অনুভব করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল 'কি ক'রবে দিদি, ভয় নাই স্বামী আপনি আসবেন'।

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'আমি একলা কোথায় যাব? আমার দশা কি হবে? আর তাঁর দশাই বা কি হ'ল। হয়তো ডাকাতে তাঁকে ধরে লয়ে গেছে'। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—বুঝতে পারছি না।

রমণী বলিল 'কিছু ভয় নাই। তুমি আমার কাছে থাক্‌বে চল। আমি তোমায় ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিব। তারপর পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে। দিদি! তুমি একটু চুপ ক'রে বস আমি আমার কাজ সেরে লই'।

রমণী দোকানের কাজ শেষ করিল। শেষ করিয়া যুবতীর কাছে আসিয়া বলিল 'বোন! বেলা অনেক হয়েছে এখন আমার ওখানে চল। আমি দোকানদারকে বলে যাই বরং, যদি তোমার স্বামী আসেন তো যেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন। এ হতভাগিনীকে এখানে সকলেই চেনে, সকলেই আদর করে, তোমার কোন ভয় নাই'।

যুবতী অবশেষে গহনার বাক্সটী লইয়া মনের দুঃখে ধীরে ধীরে রমণীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিল।

যাইবার সময় রমণী দোকানীকে বলিয়া গেল, যদি এঁর স্বামী আসেন তো আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। ইনি আমার ওখানে চল্লেন।

দোকানী বলিল 'আচ্ছা মা তাই ক'র্‌ব'।

যুবতী রমণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রমণী যুবতীকে নানা কথা বলিয়া মনে প্রবোধ দিতেছিল।

গ্রামের এক পার্শ্বে মাঠের ধারে মাটীর একটী সামান্য ঘর। ঘরের চারিদিকে আমের বাগান। দুই পার্শ্বে আবার বাঁশ বন।

গৃহের ভিতরে চারিটী দেয়াল কাহার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। লাল, সাদা প্রভৃতি রঙে চিত্রিত কাহার চেহারা। সেই সব চিত্রিত চেহারার মধ্যদেশে একটী ফ্রেমে একখানি কাহার ফটোগ্রাফ ঝুলিতেছে। যুবতী ফটোগ্রাফ দেখিয়া অনেকক্ষণ পরে চিনিল এ তার স্বামীর ছেলে বেলার চেহারা। বিশেষতঃ মুখের গঠন হাত পা সমুদয়ই সেইরূপ। দেখিয়া যুবতী চমকিয়া উঠিল—রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছা হইতেছে'।

রমণী বলিল 'কি কথা দিদি'?

যুবতী। আপনার মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহা দেখিতেছি, আপনার স্বামী কোথায়?

রমণী। সে সব অনেক কথা। সে সব কথা দিদি তোমার শুনে কাজ নাই। তাহাতে তোমার কষ্ট হ'বে।

যুবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'যাগ তবে, ব'লে কাজ নাই আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না—তিনি কোথায় গেলেন?' এই বলিয়া যুবতী কাঁদ্‌ কাঁদ্‌ হইল।

রমণী রান্নার যোগাড় করিতে করিতে যুবতীর সহিত কথা কহিতে লাগিল।

অ। হাঁ দিদি তোমার নাম কি?

যু। সুশীলা।

অ। তোমরা ব্রাহ্মণ?

যু। হাঁ আমরা ব্রাহ্মণ।

অ। তোমাদের ঘর কোথা?

সুশীলা চুপ করিয়া রহিল, আর পরিচয় দিতে সাহস করিলনা।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল:—তোমার নাম?

অ। অবলা বালা।

সু। তোমার বাটী?

অ। সেনপুর।

সু। তোমার স্বামী আছেন?

অ। আছেন, নহিলে হাতে লোহা থাকে—মাথায় সিঁদুর থাকে।

সেই সময়ে অবলার মুখে চোখে একটা গম্ভীর [illegible] রং ফুটিয়া উঠিল।

সু। তিনি কোথায়?

সে সব বিষয় কি শুনিবে? যদি শুন তো আমি সব আগাগোড়া বলি। কিন্তু সে সব অনেক কথা। তোমার এ দুঃখের সময় কি সে সব ভাল লাগবে?

সু। আর কি করি, মনটা অন্যদিকে তবু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভাল।

অবলা রাঁধিতে রাঁধিতে তখন আগা গোড়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

সমুদয় শুনিয়া সুশীলা বেশ বুঝিতে পারিল এ আমার সতীন—নিশ্চয়ই সতীন। আর ঐ সব চেহারা তাঁর। কিন্তু এর যে রকম স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেখ্ছি, যদি সে এসব টের পায় তো আমারই সর্ব্বনাশ। আর এর যে প্রকার রূপ দেখ্ছি, সে দেখে নিশ্চয়ই টল্বে।

আবার ভাবিল, আমি কি ভাবছি, তার দশা কি হ'ল তা কিছুই বুঝ্তে পারছি না। হা ভগবান! শেষে কি আমার এই হল! ভাবিতে ভাবিতে সুশীলা কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর দুই জনে আহারাদি শেষ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে, চন্দ্রমা অসংখ্য নক্ষত্র সমভিব্যাহারে আকাশে উদিত হইলে, সতী আপনার কুটীরের বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিল। সন্ধ্যা-সমীরণ নানা ফুলের গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। দুই পাশে কিঞ্চিৎ দূরে বাঁশ বনের পাতা গুলি কম্পমান হইতেছে; বাঁশের উপরে বাঁশ ঘর্ষিত হওয়ায় ঈষৎ বাঁশি স্বরের মত শব্দ হইতেছে। দুই একটী বাদুড় হুস্ হুস্ শব্দে অবলার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

অবলা ভাবিতেছে:—এই চাঁদের কিরণে সমুদয় পৃথিবী ডুবিয়াছে; ইহাতে সকলেরই আনন্দ। আমার জীবনেশ্বর, আমার ভগবান, যেখানেই থাকুন, এই সন্ধ্যাকালে এই মধুর চন্দ্র করে নিশ্চয়ই প্লাবিত হইয়াছেন। হয় তো ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া আছেন। আহা, এই চাঁদের আলোতে তিনি যেমন ডুবে আছেন, আমিও তেমনি ডুবে আছি। একখানি কাপড়ের ভিতরে আমরা দুজনে আছি। ঐ যে চাঁদ—ও আমায় যেমন দেখিতেছে তাঁকেও তেমনি দেখিতেছে। আহা, ইচ্ছা করে চাঁদে গিয়া উঠি; উঠে তাঁকে দেখি। আহা! চাঁদটী যদি নেমে আসে তো আমার দুঃখের কথা চাঁদের বুকে লিখে দি—তিনি তা হ'লে সব প'ড়ে ফেলেন—প'ড়ে

আমার জন্ত পাগল হন। হা ভগবান! তাঁর কি আর আমার মনে আছে—তিনি জানেন আমি নাই। যা হ'ক চাঁদ! আমি তোকে প্রণাম করি। তুমি আমার জীবিত-নাথের দিব্য শরীরে যেমন কর বর্ষণ ক'রছ, আমার শরীরেও তেমনি কর ঢালছ। তুই কে চাঁদ! তোকে আমি বরাবরই ভালবাসি, কিন্তু আজ তোকে বুকে ক'র্‌তে ইচ্ছা করছে—তুই আমার প্রাণনাথের খবর ব'ল্‌তে পারিস? হা চাঁদ! তোর কথা নাই, যদি থাক্‌তো তো তোকে পরাণ দিয়ে আমার নাথের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতাম। আহা, তোর কথা বলবার ক্ষমতা থাক্‌লে পৃথিবীতে আর বিরহ জ্বালা, বিরহ ব্যথা থাক্‌তো না, স্বামী স্ত্রী পরস্পরে কোটী কোটী ক্রোশ দূরে থাক্‌লেও তোর সাহায্যে পরস্পর কথা ক'য়ে মহাসুখী হ'ত। চাঁদ! তোর কলঙ্কটা নাথকে দেখাস নি,—হয় তো তোর কলঙ্ক দেখে তাঁর মনে তত আনন্দ হচ্ছে না।

আহা! ঐ যে সাদা মেঘখানি চাঁদের কাছ দিয়ে চ'লে গেল, ওকে আমার জীবনেশ্বর বোধ হয় দেখ্‌তে পেয়েছেন। আহা! আমি যদি মেঘ হ'তাম তো প্রাণনাথকে দেখ্‌তাম—যদি চাঁদের কিরণ হ'তাম—তো নাথের পদদেশ আলোকিত ক'রে থাক্‌তাম।

আহা! কেমন ফুর্‌, ফুর্‌, ক'রে বাতাস বহিছে। এই বাতাস প্রাণনাথের শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে এসে—এখন আমার মাথার উপরে লাগ্‌ছে। বাতাস! তুই কি পবিত্র—তুই কি ভাগ্যবান। হায়! হায়! যদি ভগবান আমার বাতাস ক'রতেন তো সর্ব্বদাই স্বামীর কাছে থাক্‌তাম—গ্রীষ্মের সময়ে সুশীতল জলে শীতল হ'য়ে, নানা ফুলের গন্ধে

আমোদিত হ'য়ে নাথের অঙ্গে ব্যজন ক'রতাম। ভগবান যদি এখন আমার দেহকে বাতাসে পরিণত করেন তো আমা অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী আর কে আছে?

আর—এই পৃথিবীও বড় পবিত্র, কেননা আমার ঈশ্বর ইহাতে বাস করিতেছেন। এই পৃথিবী দেবমন্দির, আর আমার স্বামী এই মন্দিরের বিগ্রহ। সে বিগ্রহকে কে পূজা করিবে? আমি—আমি। আমি ভিন্ন সে দেবতাকে পূজা করিবার মন্ত্র কেহ জানে না। আহা, এমন কি আছে যাহা দিয়া আমার স্বামীর পূজা করিব? মানুষে, ফুল নৈবিদ্য দিয়া ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সে তো তুচ্ছ পদার্থ, তাহাতে পূজা করিয়া মন আদতে তৃপ্ত হয় না। আমার এই যে জীবন,—এই তাঁর পূজার ফুল, এ ফুল তো তাঁকে দিয়াছি; আমার এই অস্থি মজ্জা—এসব তো তাঁকে অনেক দিন দিয়াছি কিন্তু কবে তিনি আসিয়া গ্রহণ করিবেন? আহা! হতভাগিনীর সে সব ক'বে হবে, যে হাসিতে হাসিতে শাণিত তরবারে আপনার মাথা আপনি কাটিয়া তাঁর পদতলে প্রদান করিব। তিনি আমার এজীবন যে প্রকারে চাহিবেন সেই প্রকারে দেব। 'যদি বলেন 'আগুনে পুড়িয়া মর আমি দেখি, তাহা হইলে আমি হাসিতে হাসিতে তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া জ্বলন্ত আগুনে দেহ বিসর্জ্জন করিব'।

হায় হতভাগিনী! তোর এসব দুরাশা কেন? যোগিনী বলিয়াছে, স্বামী আমায় গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি? যদি একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পাই তো আমার সুখের সীমা থাকিবে না। আহা, তাঁর পা দুখানি কেমন! সে পা

যদি একবার মাথায় ধরিতে পারি! হতভাগিনীর অদৃষ্টে তা কি হবে? মাথায় ধরা দূরে থাক, একটীবার যদি দেখ্‌তে পাই তো আমার জন্ম সার্থক হবে।

পৃথিবীতে যত জীব আছে সকলকেই আমার ভাল বাসিতে ইচ্ছা যায়, সকলেরই সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে, কেননা পৃথিবীতে আমার স্বামী বাস করিতেছেন। বিষধর! ব্যাঘ্র! ভল্লুক! আয় তোরা আমার কাছে একবার আয়! একবার তোদের ধরে দেখি, তোদের ধরে বুকে করি, জানিনা কেন, তোদের জন্য আমার হৃদয়ে স্নেহ জন্মে উঠ্‌লো। যে বায়ু আমার স্বামীকে স্পর্শ ক'রে আছে, সেই বায়ুতে তোরা মগ্ন, যে পৃথিবীতে আমার স্বামী, সেই পৃথিবীতে তোরা, যে আকাশের তলে আমার স্বামীর মস্তক, সেই আকাশের তলে তোদেরও মস্তক, বোধ হয় এই জন্য তোদের ধরে স্নেহ ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

অবলার হৃদয় সার্ব্বভৌমিক প্রেমে উন্মত্ত। অবলা এই প্রেমের হাতে পড়িয়া ঘৃণা বিদ্বেষ সব ভুলিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় প্রাণী আজ অবলার যেন প্রাণের সামগ্রী। পৃথিবীর চারিদিকে অবলার স্বামীর নাম যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় শব্দে যেন যোগেন্দ্র নামের প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সমুদয় জীবজন্তুর গাত্রে যেন সেই নাম লেখা রহিয়াছে। আকাশের তারকায়, তারকায়, বৃক্ষের পত্রে পত্রে, মেঘের স্তরে স্তরে, পৃথিবীর অণুতে অণুতে যেন কে যোগেন্দ্র নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। যোগেন্দ্রের রূপে জগত আজ যেন পরিপূর্ণ।

সতী প্রেমাবেগে পাগলিনীর মত উন্মত্ত হইয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া সেই ছবি খানি লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল। বসুন্ধরা জ্যোৎস্না পরিশোভিতা হইয়া হাসিতেছে; আর অবলা আপনার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে উন্মাদিনী হইতেছে। ক্রমে অবলা ধ্যানে বসিল। হৃদয়ের ভিতরে সেই স্বামী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইল। অবলা স্বামী ধ্যানে যোগিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র অবলার কুটীরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া সুশীলার মন তো আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিন্তু এদিকে দুঃখিনী অবলার দৃষ্টি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে নিপতিত হইল। অবলা পৃথিবীতে অনেক জিনিষ নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে। অবলা কাচস্বচ্ছ নীল জলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণচন্দ্র ও নক্ষত্র খচিত আকাশের শোভা দেখিয়াছে; অবলা বর্ষাকালীন মেঘের মধ্য দেশে ভুবনমোহন ইন্দ্রধনুর অনুপম শোভা দেখিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়াছে; অবলা অন্ধকারময়ী রজনীর আকাশে কাল মেঘের ভিতরে বিদ্যুতের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়াছে; অবলা বসন্তকালের নবীন পত্র শোভিতা লতিকার

বায়ুভরে ঈষৎ কম্পন দেখিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে; কিন্তু এরূপ প্রাণারাম মূর্ত্তি, মনোমোহন প্রকৃতি, এ জীবনে কথনও দর্শন করে নাই। যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শোভা একত্রীকৃত হইয়া সেই মূর্ত্তির ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে।

অবলার হৃদয় প্রাণের সমুদয় সুখের তার একবারে বাজিয়া উঠিল। অবলার শুষ্ক আশাবৃক্ষ সহসা সরস হইয়া মুঞ্জরিত হইল। একটা কি স্বর্গের পাথী সেই গাছে বসিয়া যেন অবলার সুখের গান গাহিতে লাগিল।

অবলার হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হৃদয় প্রাণ নীরবে মধুর স্বরে বলিল, অবলা! আর তুমি কাঁদিও না, তোমার দুঃখের অমানিশা এত দিন পরে প্রভাত হইল—ঐ দেথ সুখের কোকিল ডাকিতেছে।

অবলার দুই চক্ষু স্থির। যদি সহস্র চক্ষু থাকিত তো অবলা প্রাণ ভরিয়া সে মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইত। অবলার সমুদয় প্রকৃতি স্থির, যেন অবলা আনন্দে—প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রস্তরময়ী হইয়া গিয়াছে। অবলার দুটী চক্ষু দিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে—অবলার শরীর পুলকে কণ্টকিত।

চারিদিকের বাতাস যেন বলিতেছে, অবলা! আর তোমার শোকের দীর্ঘশ্বাস আমার অঙ্গে ফেলিতে হইবে না; তোমার স্বামীকে ভাল করিয়া দেখ।

মাথার উপরে নক্ষত্রসকল যেন বলিতেছে "ও অবলা! তোমার প্রাণের দেবতাকে ভাল ক'রে ধর।"

চারিদিকের বন ফুল সকল যেন অবলার আনন্দে আনন্দিত হইয়া বায়ুভরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে অন্য দিন

অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিতেছে 'ও অবলা! আমাদিগকে ল'য়ে মালা গেঁথে স্বামীর গলে আজ পরাও, আমাদের অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ কর'।

স্বর্গের যত আনন্দ, যত শান্তি, সমুদয় আজ অবলার হৃদয়ে উপস্থিত। আর যেন পৃথিবীতে জ্বর জ্বালা থাকিবে না। আজ যেন পৃথিবী হইতে পাপ বহিষ্কৃত হইয়াছে। আজ যেন শোক দুঃখ ব্যাধি সব পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ যেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করিয়াছে। যেন সহস্র বসন্ত ঋতু অবলার চারিদিকে উপস্থিত। চন্দ্রের কিরণ যেন একটু গাঢ়তর এবং সুরভিময় হইয়াছে। আর যেন কাহা-কেও বিধবা হইতে হইবে না—পুত্র শোকে আকুল হইতে হইবে না। পৃথিবীর মলা, দুর্গন্ধ সব যেন অন্তর্হিত হইয়াছে।

সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যে পৃথিবীতে, সে পৃথিবী স্বর্গ। সে পৃথিবীতে কি আর দুঃখ শোকের লেশ মাত্র থাকিতে পারে?

অবলার কাছে পৃথিবী আজ সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাবে উপ-স্থিত। এবার যেন প্রতি রজনীতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উঠিবে। যেন সমুদায় নক্ষত্র ফুটিয়া পূর্ণচন্দ্রের আকার প্রাপ্ত হইবে। আর ফুলে কাঁটা, ফলে আটা থাকিবে না। আর বনে সাপের ভয়, বাঘ ভালুকের ভয় থাকিবে না। সাপ বাঘ মানুষ সব যেন প্রেমের ডোরে বদ্ধ হইবে। চুরি ডাকাতি আর থাকিবে না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা আর থাকিবে না।

সে মূর্ত্তি অবলা যে মুহূর্ত্তে দেখিল সেই মুহূর্ত্তেই যেন পৃথিবী নিরাপদ হইল, নির্ব্যাধি হইল, নিষ্পাপ হইয়া অনন্ত সুখ শান্তি পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অবলা নীরবে—নিস্তব্ধে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি স্থির দৃষ্টিতে আকুল প্রাণে দেখিতে দেখিতে যেন এক পা এক পা করিয়া স্বর্গের উপরে উঠিতেছে। অবলার অনেক বৎসরের ক্লান্ত শ্রান্ত পীড়িত হৃদয় প্রাণ আজ স্বর্গীয় সুধা-রসে প্লাবিত হইতেছে। অবলা আজ প্রেমের অনন্তকাল স্থায়ী সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর ভিতরে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যেন আপনি প্রেমের সুখ সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে।

অবলার হৃদয়ে ইচ্ছা আছে কি তা জানি না। যদি থাকে তো —ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে, লাবণ্যরূপে থাকিতে—ঐ দিব্য চরণতলে ধূলিকণা হইয়া থাকিতে—ঐ অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া এক হইতে।

যোগেন্দ্র সুশীলাকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল, যোগেন্দ্রের প্রাণ শীতল হইল।

যোগেন্দ্র একবার অবলার দিকে চাহিয়াছিল। অবলাকে দেখিবামাত্র সে রূপরাশি হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়া গিয়াছিল কিন্তু যোগেন্দ্র আর সেদিকে চাহিল না। সুশীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল খুব বিপদেই পড়েছিলাম।

অবলার সাক্ষাতে কথা কহিতে সুশীলার একটু লজ্জা হইতে-ছিল। যোগেন্দ্রেরও একটু বাধু বাধু ঠেকিতেছিল। অবলা তাহা বুঝিতে পারিয়া একটু সরিয়া আড়ালে গেল। কথা কহিতে স্বামীর কষ্ট হইতেছে অবলা তাহা সহ্য করিতে পারিল না।

অবলা একটু আড়ালে গেলে, যোগেন্দ্র চুপে চুপে বলিল, ভগবান রক্ষা করেছেন।

সুশীলা একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল 'আর দুদিন অপেক্ষা করিতাম, তারপর তোমায় দেখা না পাইলে হয় বিষ খাইতাম না হয় জলে ডুবিতাম বা গলায় দড়ি দিতাম। কাণ্ডটা কি'?

যো। রাত্রে স্বপ্ন দেখে বরাবর চ'লে গেছলাম। ছেলেবেলায় ঐ ব্যারাম ছিল ব'ট, তার পরে তো ভাল ছিলাম।

সু। তাতো আমি জানি না। কি রকম স্বপ্ন, নিশিতে ডাকা নাকি?

যো। তাই বটে। আমার মনে হ'ল যেন কে ডাক্‌ছে। তার ডাক্ শুনে উঠলাম। উঠে খানিকটা যেতেই যেন রাম বাবুকে দেখ্‌তে পেলাম। তার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বরাবর যাচ্ছি।

৮।৯ ক্রোশ যাবার পর রাত্রি প্রভাত হ'ল যখন, তখন ঘুমের ঘোর কেটে গেল, বেস জ্ঞান হ'ল। তখন দেখি না একটা মাঠে একটা জঙ্গলের ধারে গিয়ে উপস্থিত। তখন আমার ভয়ানক ভয় হ'ল। বুক দুড় দুড় ক'রে কাঁপিতে লাগিল। তোমার বিষয় যত মনে পড়ে তত প্রাণটা কাতর হ'তে লাগলো। মহা বিপদে পড়ে চুপ করে ব'সে থাক্‌লাম। বেলা যখন ৯টা বাজ্‌লো তখন একজন লোককে সেখানে দেখ্‌তে পেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করায় আমায় বল্লে মশাই! এ মাঠ হ'তে আপনি একলা কি ক'রে যাবেন? যদি আমায় ২৲ টাকা দেন তো কোম্পানির রাস্তা ধরিয়ে দিয়ে আসি। ভাগ্যে আমার পকেটে টাকা ছিল তাই রক্ষা, নহিলে যে কি হ'ত তা ব'লতে পারি না। সে আমার সঙ্গে

করে অপরাহ্ণ ৫টার সময় কোম্পানির রাস্তায় তুলে দিয়ে যায়। তার পর ক্রুত চ'লেই আসছি ; পরে রাত্রি ৮ টার সময় একখানা গাড়ি পেলাম। আজ খুব জ্যোৎস্নাটা আছে। তারপর দোকানে এসে . জিজ্ঞাসা করায়, যখন শুন্‌লাম তুমি এখানে আছ, তখন ধড়ে প্রাণ এল, মনটা একটু স্থির হ'ল। তার পরে এই আস্‌ছি আর কি।

অবলার কাণে এই সমুদয় কথা লাগিতেছিল। স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া অবলা আকুল প্রাণে কাঁদিতে-ছিল।

যোগেন্দ্র এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। সুশীলা বলিল, তাইতো কিসে ব'সবে ?

অবলা অমনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘর হইতে একখানি মাদুর বাহির করিয়া পাতিয়া দিল। মাদুর পাতিয়া দিবার সময় অবলা একটু কাঁদিয়াছিল, কেন না, স্বামীকে বসাইবার জন্য অপনার বক্ষ পাতিয়া দিতে পারিল না—আপনার মস্ত-কের চুল দিয়া স্বামীর পা মুছাইয়া দিবার সুবিধা হইল না—অবলা পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিণীর ন্যায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল ; কিন্তু সে মধুর যন্ত্রণাতে অবলার সুখ। মাদুর পাতিয়া দিয়া অবলা আবার আড়ালে সরিয়া গেল।

যোগেন্দ্র মাদুরে বসিল। সেই রমণীর দিকে চাহিয়া অবধিই যোগেন্দ্রর প্রাণটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সেই রমণী যেন যোগেন্দ্রর কেহ হয় ; যোগেন্দ্রর প্রাণটার ভিতরে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাব উঠিতে লাগিল। যোগেন্দ্র সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, এটী কে ?

অবলার প্রাণে এ কথাটী বাজিল—অবলার দুনয়ন বহিয়া অমনি জল ধারা পড়িতে লাগিল। একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস অবলার বক্ষকে কাঁপাইয়া আকাশের গায়ে পতিত হইল।

সুশীলা বলিল 'ভাল বামুনের মেয়ে এই জানিয়াছি।' সুশীলা সব ভাঙ্গিয়া বলিল না।

যোগেন্দ্র বলিল 'এখন খাওয়া দাওয়ার কি হবে'?

অবলা আর আড়ালে থাকিল না। আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল। যোগাড় করিতে করিতে ঘোমটার ভিতরে অবলা নীরবে এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল 'আমি দুঃখিনী, এ সামান্য জিনিস কি প্রকারে খাওয়াইব। অবলার ইচ্ছা পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট খাদ্য আছে তাহা আনিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। অবলা অল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় প্রস্তুত করিল। সুশীলা কিছুই সাহায্য করিল না। সে যোগেন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা বিষয়ের কথাতেই মগ্ন রহিল। প্রথমে একটু লজ্জা হইয়াছিল; ১০।১২ মিনিট পরে সুশীলার আর লজ্জা থাকিল না। অবাধে যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

সমুদয় প্রস্তুত হইল—অবলা স্বামীর খাবার আনিয়া দিল। স্বামীকে আহার করাইতে লাগিল। অবলা একটু দূরে বসিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে এক মনে স্বামীর খাওয়া দেখিতে দেখিতে স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিতেছে। স্বামীকে খাওয়াইয়া আজ অবলার প্রাণে যে কি আনন্দ, তাহা মনে ধারণা করা অসাধ্য।

পাঠিকা! বহু দিনের পর স্বামী যত্ন বিদেশ হইতে ঘরে আসিয়া যখন তোমার কাছে বসিয়া আহার করে, তখন তোমার যে আনন্দ হয় অবলার আনন্দ তদপেক্ষা লক্ষ গুণ অধিক।

আহারাদি শেষ হইলে অবলা ঘরের ভিতরে বিছানা করিয়া দিল। সুশীলাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল 'তোমরা ঘরে গিয়া শোও'।

সুশীলা বলিল 'তুমি কোথা শোবে'?

অবলা বলিল 'আমার যা হয় হবে এখন, তোমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে শোওগে'।

সুশীলা যোগেন্দ্রকে বলিল 'যাও ঘরে শোওগে'।

যোগেন্দ্র বলিল 'উনি কোথায় শোবেন'?

সুশীলা বলিল 'উনি কাদের বাড়িতে গিয়ে শোবেন'?

যোগেন্দ্র বলিল 'তাইতো বড় তো মুস্কিল, সেটা ভাল দেখায় না, আমি না হয় বাহিরের দাওয়াতে শুয়ে থাকি, তোমরা না হয় ঘরের ভিতরে গিয়ে শোওনা'।

সুশীলা বলিল 'না না উনি কাদের বাড়ি শোবেন ঠিক্ ক'রে এসেছেন, আমরা দুজনে ঘরের ভিতরেই শোবো এখন'।

যোগেন্দ্রর বড় ঘুম পাইতেছিল সুতরাং ঘরের ভিতরে গিয়া শয়ন করিল। সুশীলা যোগেন্দ্রর কাছে শয়ন করিল।

রাত্রি তখন প্রায় ১টা বাজিয়াছে। অবলা কোথায় শয়ন করিবে? পাঠক পাঠিকা। হতভাগিনী সতী সাবিত্রী অবলা সে গভীর রাত্রে কোথায় গিয়া শয়ন করিবে?

অবলা সে বিষয়ে কিছুই ভাবিল না। কুটীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী মহৎ বট বৃক্ষ তলে গিয়া বসিল। জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট্ করিতেছে, মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে। দুই একটী বাদুড় হুস্ হুস্ করিয়া বট গাছে আসিয়া বসিতেছে।

অবলা সেই বটতলে বসিয়া আপনার কুটীরের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কুটীর এতদিন পরে ধন্য হইয়াছে, পবিত্র হইয়াছে। দরিদ্র অনেক রত্ন পাইলে যেমন বাক্সে রাখিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সেই বাক্সের দিকে চাহিয়া থাকে, অবলাও আপনার অমূল্য রত্ন স্বামীকে অনেক যন্ত্রণার পর পাইয়া আপনার সুখে উন্মাদিনী হইয়া সেই ঘরের দিকে চাহিয়া আছে। সেই ঘরের ভিতরে 'কে আছে' অবলা যখন ইহা ভাবে, তখন অবলার প্রাণে স্বর্গের বাজনা বাজিতে থাকে—দুচক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হয়। অবলা ভাবাবেশে আত্মহারা হয়—সেই ঘরের ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

অবলা এক এক বার আস্তে আস্তে পাগলিনীর মত ঘরের কাছে আসে—আসিয়া দাঁড়ায়—দাঁড়াইয়া সুখের কান্না কাঁদে আবার ফিরিয়া যায়। অবলা এইরূপ আপনার প্রেমে আপনি উন্মাদিনী আছে, এমন সময়ে আকাশে কাল মেঘ উঠিল। চাঁদের আলো নিবিয়া গেল। নক্ষত্র সকল একে একে অদৃশ্য হইল। কাল মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড় ক্রমশঃ প্রবলতর হইল। মড় মড় করিয়া বড় গাছের দুটী ডাল ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমশঃ ঝড় থামিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবলার কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

জল ঝড় মাথার উপর দিয়া চলিতেছে, অবলা ভিজিয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, গায়ে কত কাদা লাগিয়াছে, আকাশ কড়্ কড়্ করিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে ভীষণ শব্দে একটী বাজ পড়িল। অবলা কিন্তু আদতে কাতরা হইল না। কাতরা হওয়া দূরে থাকুক, স্বামীর জন্য এসব সহ্য করিতে করিতে অবলার প্রাণের সুখ যেন আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আকাশ পরিষ্কার হইল, রজনীও প্রভাত হইল। অবলা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কুটীরে আসিল। তখন উহারা দুজনে উঠিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

অবলা সুশীলাকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা এইখানে থাক আমি শীঘ্র আমার দোকানের কাজগুলি সেরে আসছি।

অবলার প্রেম গভীর, উহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত করে না। অবলা একটী ঝাঁটা লইয়া দোকানে ঝাঁট দিতে চলিল।

অবলা খাংরাটী লইয়া চলিয়া গেলে, যোগেন্দ্র সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল 'খ্যাংরা ল'য়ে উনি গেলেন কোথা'?

সুশীলা বলিল 'উনি দোকানে ঝাঁট দিয়ে থাকেন, তাতে মাসে মাসে কিছু পান, সেই কাজে গেলেন'।

যোগেন্দ্র বলিল 'ওঁর মাথায় সিন্দুর দেখছি, হাতে লোহাও দেখ্ছি, ওঁর স্বামী কোথা'?

সুশীলা বলিল 'তা ঠিক্ জানি না—বোধ হয় ওঁর স্বামী ওঁকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে, নহিলে অমন দশা কেন'?

যোগেন্দ্র বলিল 'স্ত্রীলোকটী কিন্তু খুব ভাল'।

সুশীলা বলিল 'তা ভগবান জানেন। যাক্ এখন দেশে যাবার উপায় কি'?

যো। আমি একটা ফিকির ঠাউরেছি।

সু। কি প্রকার?

যো। আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে একবার তোমার বাপের ভাব গতিক দেখে আসি।

সু। যদি ধরা পড়?

যো। ধরবার যো নাই। এমন জটা টটা ক'রে গায়ে পাঁশ মেখে যাব, কেউ জান্‌তে পারবে না।

সু। পারলে ভাল।

যো। পার্‌লে আবার কি?—নিশ্চয়ই পার্‌বো।

সু। তা হ'লে "শুভস্য শীঘ্রং"।

যো। তা হ'লে খাওয়া দাওয়া ক'রে আজই কলিকাতা যাই। সেখানে জটা টটা কিনে বেস ক'রে সেজে চ'লে যাব। ২।৩ দিন লাগিবে। এখন তুমি এখানে থাক। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।

সু। তাই আজ খাওয়া দাওয়া ক'রে রাণিগঞ্জের ষ্টেসনে চ'লে যাও।

যো। তাই যাব।

এই প্রকার নানাবিধ কথা চলিতেছে, কথা কহিতে কহিতে সুশীলা ভাবিতেছে যদি ঘরের ছবি খানা দেখে, তো চিনে ফেল্‌বে। কিন্তু অবলার দুরাদৃষ্টবশতঃ যোগেন্দ্র ঘরের ছবির দিকে ভুলিয়াও চাহিল না। এমন সময়ে অবলা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর পাদকজল লইয়া খাইয়া আপনার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিল।

বাবুদের বাড়ি হইতে সিদা আসিয়াও পঁহুছিল।

অবলা তাড়াতাড়ি রন্ধনের যোগাড় করিল। ৭।৮টী তরকারী অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া ফেলিল।

যোগেন্দ্র আহার করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

অবলা সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল 'উনি কোথায় গেলেন'?

সুশীলা বলিল 'কলিকাতায় গেলেন ২।৩ দিন পরে কাজ শেষ করিয়া আবার আসিবেন'।

অবলা সুশীলাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে অবলা সুশীলাকে যোগেন্দ্রর বিষয় নানাভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সুশীলা ভাবিয়া চিন্তিয়া ২।১টী সত্য ২।১টী মিথ্যা করিয়া উত্তর দিল। সুশীলা অন্য কথা পাড়িতে চায়, কিন্তু অবলা খালি যোগেন্দ্রর কথা আনিয়া ফেলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় গিয়া জটা কিনিল, রুদ্রাক্ষের মালা কিনিল। পরে মাথায় জটা পরিল—গেরুয়া বসন পরিল—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়াইল—গায়ে ভস্ম মাখিল। যোগেন্দ্রকে আর চিনিবার যো নাই।

যোগেন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে সুশীলার বাপের দেশে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেই বাটীর কাছে গিয়া একটী গাছতলায় বসিয়া আছে। এমন সময় একটী বৃদ্ধা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোগেন্দ্র বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল 'হাগা মায়ি—একটা কোথা শুনে যাও'।

বৃদ্ধা এক মনে কোথায় যাইতেছিল চাহিয়া দেখে না সন্ন্যাসী, অমনি কাছে আসিয়া প্রণাম করিল।

কেন বাবা ডাক্‌লে?

যো। হাঁ মায়ি! এবাড়িটীর কর্ত্তা বাবু কোথা?

বু। আর বাবা! আজ ছ মাস হ'ল তিনি মারা গেছেন। আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন। আমায় বছরে ছুখানা ক'রে কাপড় দিতেন। বাবা! এমন লোক আর হবে না।

যো। বাড়িতে তবে কে আছেন?

বু। আর বাবা! তাঁর পরিবার আছে, আর আমার মেয়ে তাঁর কাছে থাকে, খোরাক পোষাক আর মাসে এক টাকা ক'রে

পায়। একটী মেয়ে ছিল আহা! যেন দুর্গা ঠাকুর! তা বাবা এমনি অদৃষ্ট—যোগিন ব'লে এক ছোড়া ছ্যাল, সে ছোড়ার সঙ্গে বের কথা হয়েছ্যাল; আঁড়ের বে, কি সাগরের মতে। তা বাবা বে হ'ল না দেখে সে মুখপোড়া সে মেয়েটীকে ল'য়ে পালয়ে গ্যাছে। বাবা! তুমি যেন কাকেও বলো না যে আমি বলেছি। বাবা! সেই একটী মেয়ে, সেই মেয়ের ঘেণ্যায় বাপ ম'রে গ্যাছে। মা মাগী খালি সেই মেয়ের জন্য কাঁদ্‌ছে। বাবা, অনেক দেশ তল্লাস ক'রে সে মেয়ে পাওয়া যায় না। তা বাবা! তোমরা সন্ন্যাসী, গুণে ব'ল্‌তে পার, সে মেয়ে কোথা; তা যদি পার তো মা ঠাকরুণ তোমায় খুসী ক'রবেন।

যো। হাঁ আমি ব'লতে পারি। তুমি বাড়িতে বলগে দেখি। তা তুমি বাবা! একটু এইখানে বোস আমি খপর দিয়ে আসি” বলিয়া তাড়াতাড়ি বুড়ি বাড়ীর ভিতরে গিয়া সব বলিল। সুশীলার মা বলিল 'যা এখনি সে সন্ন্যাসীকে ডেকে আন্‌গে এখনি যা এখনি যা'।

বুড়ি তাড়াতাড়ি আসিয়া সন্ন্যাসীকে বলিল 'ও বাবা! মা ঠাক্‌রুণ তোমায় ডাক্‌ছেন, একবার চল।'

সন্ন্যাসী বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলিল। প্রথমে গিয়াই বাহির বাটীতে বসিল। গৃহিণী বাহিরে আসিল।

সন্ন্যাসী কৃত্রিম স্বরে বলিল, মা তোমার বাঁ হাতটা দেখি। গৃহিণী হাত বাহির করিয়া দিল। সন্ন্যাসী হাত দেখিয়াই প্রথমত নাম বলিল। গৃহিণী চমকিত হইল। সন্ন্যাসী গৃহিণীর আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে আগেই সব জানিত এখন হাত দেখিতে দেখিতে সব বলিয়া দিতে লাগিল। গৃহিণী

শুনিতে শুনিতে অবাক্ হইতেছে—ভাবিতেছে এ বড় উচ্চ দরের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তার পর বলিল 'মা তোর একটী মেয়ে হয়েছিল আর হয়নি না' ?

গৃহিনী বলিল, বাবা তুমি যা যা বল্‌ছ সব সত্য। যা হ'ক আমার মেয়ে এখন কোথা ?

স। মেয়ে তোমার ঘরে নাই—তবে শীঘ্রই আসিবে।

গৃ। ভাল আছে তো ?

স। হাঁ ভাল আছে। সে মেয়েটী কি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল ?

গৃ। "হাঁ বাবা" বলিয়াই গৃহিণী কাঁদ কাঁদ হইল।

স। মায়ি! তোর মেয়ের আবার বিবাহ হয়েছে। সে ভালই হয়েছে। তাতে কোন দোষ নাই। আগে যদি বিবাহ দিতে তো এত কিছু বিপদ হ'ত না।

গৃ। বিধবা বিবাহ কি ভাল বাবা, তাতে তো কোন দোষ হবে না ?

স। কিছু দোষ নাই। শাস্ত্রে উহার মত আছে, ব্যবস্থা আছে। আর কিছুকাল পরে বিধবা বিবাহ চ'লে যাবে।

গৃ। বাবা মেয়ে আমার কবে আস্‌বে ঠিক্ ক'রে বল।

স। মায়ি! তোর মেয়ে জামাই দুজনেই আস্‌বে।

গৃ। কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে বাবা ?

স। যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে সে খুব ভাল লোক, খুব বিদ্বান। সেই এখান হ'তে লয়ে গেছে। তার নামের গোড়ায় 'ব' আছে। তা মায়ি! এক কাজ ক'র্‌বে—জামাই এলে খুব যত্ন ক'র্‌বে। আর তারা যে গেছে তা ভাল ভাবেই

গেছে, লোকে যে সব বদ কথা বল্‌ছে সে সব মিথ্যা। তাদের দুজনে খুব প্রণয় হয়েছিল, তার পর বিবাহের আশা পেয়েছিল তা যখন হলনা তখনই তারা পালিয়েছে।

গৃ। বাবা আমি বে দিতে চেয়েছিনু, তবে তিনি পাঁচ জনের ভয়ে সাহস ক'র্‌লেন না। তারা আবার এলে আমার যা কিছু বিষয় আছে সব আমার জামাইএর নামে লেখা পড়া ক'রে দেব। বাবা সেদিন কি হবে! সুশীকে কি আর দেখতে পাব? "বাবারে! হা ভগবান"! বলিতে বলিতে গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিল।

স। ভয় নাই, আজ হ'তে চার দিনের মধ্যে তোমার মেয়ে জামাই নিশ্চয়ই আস্‌বে।

গৃ। তাহলে আমি তোমায় ৫০০৲ দেব আর এখানে যদি থাক্‌তে চাও তো ঘর তৈয়ারি ক'রে দেব।

স। আমায় টাকা কড়ি দিতে হবে না, আমি কাহারও দান গ্রহণ করি না। তবে আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, চারি দিনের মধ্যে তোমার ঝি জামাই নিশ্চয়ই আসবে। একটা টাকা এনে দাও আমি সেটা প'ড়ে দি।

গৃহিণী একটা টাকা আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী মিছামিছি বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া টাকাটায় তিনবার ফুঁ দিল। তার পর গৃহিণীকে বলিল, মা! তোমার চুলের ডগায় টাকাটী বেঁধে রাখ, দেখ যেন না প'ড়ে যায়। তারা এলে টাকাটী কোন ব্রাহ্মণকে দান করিও।

গৃহিণী তাহাই করিল।

সন্ন্যাসী প্রস্থান দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী তার পর ৩।৪ ক্রোশ দূরে গিয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। সেই দিনই কলিকাতায় পঁহুছিল। পরদিন সকালের ট্রেনে রাণিগঞ্জ যাত্রা করিল। ষ্টেসনে নামিয়া গাড়ি করিয়া বিষমপুরে চলিল।

রাত্রি ৯টার সময় অবলার কুটীরে উপস্থিত হইল। অবলা স্বামীর চিন্তায় বিভোর ছিল, দূর হইতে জুতার শব্দ শুনিয়াই বুঝিল, তাহার জীবনের দেবতা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অবলা অমনি অতি-ব্যস্তে পা ধুইবার জল প্রদান করিল।

সুশীলা বলিল 'খবর ভাল তো'।

যোগেন্দ্র বলিল, "হাঁ, যে জন্য যাওয়া সে বিষয়ে মঙ্গল।"

সু। বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল।

যোগেন্দ্র শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদটা দিল না। বলিল 'হাঁ তিনি ভাল আছেন. তোমাকে দেখিবার জন্য তোমার মা বাপ দুজনে ব্যাকুল।

সু। আমাদের এসব কথা শুনেছেন?

যো। হাঁ, তাতে তাঁহাদের কোন অসুখ নাই। তবে আমরা শীঘ্র না গেলে তাঁরা আর অধিক দিন বাঁচিবেন না।

সু। মাকে দেখ্‌লে?

যো। তিনি তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে ভয়ানক শীর্ণ হয়েছেন।

সু। তবে আমরা কালই যাই চল।

যো। তা আর ব'ল্‌তে।

কাল যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবে শুনিবামাত্র অবলা যেন দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল। অবলা ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া ছিল অমনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! অবলার দুই চক্ষু প্রস্তরের ন্যায় স্থির হইল—শক্ত হইল। এই ভাবিতেছে স্বামীর পায়ে জড়ায়ে ধ'রে আমার পরিচয় দি, তারপর আবার ভাবিল, ভয় কি, উনি যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইব। এমন সময়ে সুশীলা ঘরের ভিতরে আসিল। অবলা হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া বলিল "হাঁ দিদি, কাল কি তোমরা যাবে? আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।"

সুশীলা বলিল "তাও কি হয়, তুমি কোথা যাবে, তোমার স্বামী কি মনে কর্‌বেন"?

অবলা চুপ করিয়া থাকিল, আর কোন কথা কহিল না। ভাবিল, আমি নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে যাব।

তারপর অবলা রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল।

রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া ঘরের ভিতরে সুশীলার সঙ্গে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে অবলা সুশীলাকে বলিল 'আমাকে সঙ্গে করে লয়ে যেতে দোষ কি দিদি'?

সুশীলা বলিল 'তোমার স্বামীর অমতে তুমি কি যেতে পার, তোমার যদি কেউ না থাক্‌তো, তো যা হয় হ'ত'।

অবলা আর কিছু বলিল না, দুই এক গ্রাস খাইয়া আর

খাইতে পারিল না। অবলার প্রাণ স্বামীর সঙ্গে যাইবার জন্ত ধড়্ ফড়্ করিতেছে।

সুশীলার খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে, যোগেন্দ্র বলিল, '১০ টাকা ওঁকে বাক্স হতে বার ক'রে দাও, কাল সকালেই আমরা যাব।'

সুশীলা ১০ টাকা বাহির করিয়া দিতে যাইল অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'যদি আমায় কষ্ট না দাও তো টাকা কয়টী বাক্সর ভিতরে রাখ। দিদি! তোমরা কাল যাবে আমি আর বাঁচবো না।'

যোগেন্দ্র বাহির হইতে এই কয়টী কথা শুনিবামাত্র দয়ার্দ্র হইল। সুশীলাকে ডাকিয়া বলিল 'উনি কি বলেন।'

সুশীলা বলিল 'উনি আমাদের সঙ্গে যেতে চান, তা কেমন ক'রে হবে। ওঁর স্বামীর অমতে তুমি কি লয়ে যেতে পার?'

যোগেন্দ্র বলিল 'ওঁর যে প্রকার অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে স্বামী থাকায় না থাকায় সমান। ওঁকে যখন বাজারের দোকান ঝাঁট দিয়ে খেতে হয়, তখন সে স্বামী থাকাও যা আর না থাকাও তা। তা না হয় চলুন না। আমাদের সংসারে লোকেরও ত দরকার। তাই কাল আমাদের সঙ্গে যাবেন এখন'।

সুশীলার আদতে ইচ্ছা নাই যে, সতীনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। সুশীলা ঘাড় নাড়িয়া চুপে চুপে বলিল 'তা কখনই হবে না, কখনই হবে না—তা হ'লে আমি যাব না'।

যোগেন্দ্র বলিল 'তোমার যদি অমত হয় তো থাক'। অবলা ঘর হইতে শুনিল। মাথায় যেন সহস্রটা বজ্র পড়িল; পৃথিবী যেন ভীষণ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল!

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স হইতে যে ৪টী টাকা ছিল বাহির করিয়া পেট কাপড়ে রাখিল। পরে স্বামীর বিছানা করিয়া দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

সুশীলা বলিল 'রাত হয়েছে শোবে চল'।

যোগেন্দ্র বলিল 'উনি বুঝি সেই থানে গেলেন'।

সুশীলা বলিল 'হাঁ'! চল শুইগে চল।

যোগেন্দ্র বলিল 'আহা, স্ত্রীলোকটী বড় ভাল—আমাদের যে উপকার করেছে, এ ঋণ শোধা যেতে পারে না। সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাই চল'।

সুশীলা একটু কুপিত ভাবে বলিল 'রূপ দেখে মন ভুলে গেছে নাকি? ও কি, লোকে যে নিন্দা ক'র্‌বে। ওর স্বামী আছে তা জান?

যোগেন্দ্র বলিল। 'তা চল চল শোবে চল'।

দুইজনে গিয়া শয়ন করিল।

অবলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে আবার সেই বট বৃক্ষ তলে গিয়া উপবেশন করিল। অবলার প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। অবলা ভাবিতেছে 'স্বামীকে যখন পাইয়াছি, তখন প্রাণ গেলেও ছাড়িব না। সঙ্গে সঙ্গে যাইব। সুশীলা ঘৃণা করে, সহিব—মারে মার খাইব। স্বামী আমায় চিনিতে পারেন নাই। স্বামী যদি একবার বুঝিতে পারেন, আমি ওঁর স্ত্রী, তা হলে আর আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। পরিচয় কি দেব? না—পরিচয় দিয়া লাভ কি। আমার সুখ ওঁকে দেখিয়া—ওঁর সেবা করিয়া, ওঁর পায় ধুলা মাথায় ধরিয়া। আমি ওঁদের বাড়িতে

না হয় দাসী হইয়া থাকিব। যখন সৌভাগ্যবশতঃ পাই-য়াছি তখন আর ছাড়িব না। এতদিন দেখি নাই, ওঁর মূর্ত্তি পাইয়া এক প্রকার ভুলে ছিলাম। এখন তো আর তা পার্‌বো না। যদি আমায় উনি পরিত্যাগ করেন—গ্রহণ না করেন তো ওঁরই সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। ওঁর সম্মুখে মরিতে পারিলে আমার বড় সুখ হইবে—আমার মহা আনন্দ হইবে। আর যদি উনি অনুমতি করেন, এই অবস্থাতেই তুমি থাক; আমি মনের আনন্দে এই ভাবে জীবন কাটাইব—তাহাতে আমার সুখ বই অসুখ হইবে না।

কাল উনি রাণিগঞ্জের ষ্টেসনে যাবেন। আমি না হয় এই বেলা ষ্টেসনে গিয়া থাকিগে। আমাকে ল'য়ে যেতে ওঁর একান্ত ইচ্ছা আছে, তবে সতীন আমায় সঙ্গে ল'য়ে যেতে চান না কেন? আমি তো ওঁর সুখের পথে কাঁটা দেব না। আমি ওঁরও না হয় সেবা শুশ্রূষা করিব।

অবলা আবার ভাবিতেছে 'এই রাত্রেই ষ্টেসনে যাই। গিয়া বসিয়া থাকিগে। সেখানে আমায় দেখ্‌লে ওঁদের নিশ্চয়ই দয়া হবে; আর আমায় ফেলে যেতে পারবেন না। একান্ত সঙ্গে না লন, নিজে টিকিট্ কিনিয়া উহাদের গাড়িতে কলিকাতায় যাইব। আর স্বামী যদি বিরক্ত হন তো তখন ওঁর দুটী পায়ে জড়ায়ে ধ'রে আমার পরিচয় দেব। তখন নিশ্চয়ই ওঁর দয়া হবে। পরিচয় পেয়েও যদি অগ্রাহ্য করেন তো ওঁরই সাক্ষাতে এ পাপ জীবন পরিত্যাগ করিব। আর এ-জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁর জীবন তিনি যদি না লন তো,

আমার ইহাতে আর প্রয়োজন কি? এ জীবন রাখিয়া সুখ কি'?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে, অবলা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কাছে একবার আসিল। কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে রাণিগঞ্জ যাইবে বলিয়া যাত্রা করিল। খানিক দূর গিয়া আর পা উঠে না। পা আবার সেই ঘরের দিকে আসিতে চায়। সে ঘরে অবলার সর্ব্বস্ব ধন রহিয়াছে—সে ঘর ফেলিয়া কি করিয়া অবলা যাইবে?—কিছু দূর গিয়া সে ঘর যে আর দেখিতে পাইবে না। অবলা ফিরিয়া ঘরের কাছে আসিল। আবার অবলা ভাবিল 'না রাণিগঞ্জেই যাই' এই ভাবিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ঘরের দিকে চাহিতে চাহিতে কয় পা অগ্রসর হইল। কিছু দূরে গিয়া আর ঘর দেখিতে পায় না—অবলার প্রাণ ছট্ ফট্ করে—অবলার দুটী চক্ষু চ'খের জলে ভাসিয়া যায়। অবলা আর যাইতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের কাছে আবার ফিরিয়া আসিল। আসিয়া ঘরের দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

দুঃখিনী অবলা নির্জ্জনে নীরবে কাঁদিতেছে। আকাশে নক্ষত্র সকল ঝিক্ মিক্ করিতে করিতে অবলার দুঃখের অশ্রু-বিন্দু গুণিতেছে। চাঁদ আকাশের একপ্রান্ত হইতে অবলাকে দেখিতেছে। রজনী অবলার দুঃখে একটু একটু আর্দ্র হই-তেছে। অবলার কাতরতা দেখিয়া বনের ফুল গুলি ভাল করিয়া ফুটিতে পারিতেছে না।—তারা আর ফুটিতেও চায় না। অবলার দুঃখে কাতর হইয়া ফুলও ফুটিতে চায় না, আকাশে নক্ষত্রও আর জ্বলিতে চায় না—চাঁদও আর

থাকিতে চায় না—পাখীরাও আর সুস্বর গান গাহিতে চায় না—পবনও আর মন্দ মন্দ বহিতে চায় না।

আকাশের চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল। নক্ষত্র সকল একে একে অদৃশ্য হইল। বিহঙ্গ সকল কলরব করিয়া উঠিল। অবলা পাগলিনীর মত ঘরের দেয়াল ধরিয়াই দাঁড়াইয়া আছে।

সুশীলা উঠিয়া ঘরের কপাট খুলিল। অবলা আস্তে আস্তে সুশীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুশীলার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলা বলিল 'কাঁদ্‌ছ কেন' ?

অবলা বলিল 'আমায় সঙ্গে ক'রে লয়ে চল'।

সু। গিয়া তোমার লাভ কি ?

অ। "নহিলে মরিব—বাঁচিব না"। বলিয়া অবলা আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অবলার কান্না, অবলার কথা, ঘরের ভিতর হইতে শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিতে শুনিতে কাতর হইয়া ঘরের ভিতর হইতে বলিল 'তাই হবে—আমাদের সঙ্গেই যাবেন।'

অবলার অন্ধকারময় হৃদয়ে আবার আশার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

সুশীলা ভিতরে গিয়া স্বামীর কানে কানে বলিল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি—তা হবে না। সুন্দরী দেখে কি মন ভুলে গেছে নাকি'।

যোগেন্দ্র কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুশীলার উপর মনে মনে একটু কুপিত হইল।

উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া বাজারে গাড়ি ঠিক্ করিতে গেল।

অবলা পাষাণময়ী মূর্ত্তির ন্যায় এক পার্শ্বে বসিয়া আপনার দুঃখের অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলে ডুবিতে লাগিল।

সুশীলা এদিকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে।

যোগেন্দ্র গাড়ি ঠিক্ করিয়া আসিল। অবলা পাগলিনীর মত অনাবৃত মুখে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। অবলার এখন আর ঘোমটা নাই—লজ্জা নাই, ভয় নাই। যোগেন্দ্র গহনার বাক্সটী হাতে লইল। ইচ্ছা অবলাকে সঙ্গে লইয়া যায়—কিন্তু সুশীলার ভয়ে কিছুই করিতে পারিতেছে না। সুশীলা অবলার কাছে গিয়া বলিল 'দিদি! তবে আমরা আসি।' অবলা কি ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, চাহিয়াই আছে; হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইল!

যোগেন্দ্র 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিয়া কাছে আসিয়া বসিল।

সুশীলা এসব দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছে।

অনিচ্ছায় সুশীলা জল আনিয়া মুখে চ'খে দিতে লাগিল। যোগেন্দ্র পাখা লইয়া বাতাস করিতে থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা চক্ষু চাহিল। দেখিল সম্মুখে যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র বাতাস করিতেছে, কাছে বসিয়া আছে। বাতাস করিতে হয়তো স্বামীর কষ্ট হইতেছে, এই ভাবিয়া অবলা উঠিয়া বসিল। পরে পাগলিনীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর দুটী পা জড়াইয়া পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া

অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল। উক্ত অশ্রুজল যোগেন্দ্রর পা ভাসিয়া যাইতেছে, যোগেন্দ্রর হৃদয়টা কেমন গুর গুর করিয়া উঠিল। আগেকার স্ত্রীর কথা মনে পড়ি—ভাবিল সেইতো হবে না—ইহারও নাম অবলা। আবা ভাবিল না তাও কি হ'তে পারে—সেকি আর বেঁচে আছে যাই হ'ক সঙ্গে ক'রে, ল'য়ে যাব।

অবলার সে অবস্থা দেখিয়া যোগেন্দ্রর প্রাণ ব্যাকুল হইল। যোগেন্দ্রর চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল বিগলিত হইল।

অবলা যে সময়ে স্বামীর পদতল জড়াইয়া ধরিল, সে সময়ে সেই দুঃখের মধ্যে যেন প্রাণে একটু সুখের রেখা দেখা দিল। অবলার প্রাণে যেন তৃপ্তি, শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইচ্ছা অনন্ত কাল ঐরূপে পা জড়াইয়া অশ্রুজলে ধৌত করে। সে পদস্পর্শে অবলা আত্মহারা হইল—উপস্থিত বিপদ দুঃখ শোক সব যেন বিলুপ্ত হইল। অবলা স্বর্গে, কি পৃথিবীতে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। অবলা যেন স্বর্গ জড়াইয়া আছে। সে পদস্পর্শে যেন অবলার সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—যেন অবলার পরিত্রাণ হইল।

সে ভাব দেখিয়া যোগেন্দ্রের হৃদয়ে এক মহা ভাবের ঝড় উঠিয়াছে। যোগেন্দ্র ভাবিতেছে 'এ মানবী না স্বর্গের দেবী? ভগবান! এ যদি আমার সেই অবলা হয় তো আমার সমুদয় শক্তি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিব। ইহাকে সঙ্গে লইয়া গভীর বনে প্রবেশ করিয়া তোমার ধ্যানে জীবনপাত করিব।'

আবার ভাবিতেছে 'কেন আমি আর সে সব ভাবি।

আমি অতি পাষণ্ড। সে কি আর বেঁচে আছে! যাই হ'ক সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাই, যা হয় পরে হবে।

পরে সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিল 'তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমি এঁকে সঙ্গে ক'রে-ল'য়ে যাব'।

সুশীলা কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অবলা আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইল।

যোগেন্দ্র বলিল 'আপনি উঠুন—আমাদের সঙ্গে চলুন'।

এই কথা শুনিতে শুনিতে অবলার বোধ হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। অবলা উঠিয়া বসিল।

যোগেন্দ্র বলিল 'আপনার সব ঠিক্ করুন'।

অবলা পূর্ব্ব দিনেই বাজারে ঝাঁট দেবার কাজে জবাব দিয়া আসিয়াছে। বাবুদের বাটীতে বলিয়া আসিয়াছে আর আমার সিদা পাঠাইবেন না—আমি কাল এখান হইতে যাইব।

অবলা ঘরের ভিতরে গিয়া সেই ছবিখানি, চারিখানি কাপড় ও চারিটি টাকা লইয়া একটী পুঁটুলি বাঁধিল, পুঁটুলি লইয়া বাহিরে আসিয়া ঘরে তালা দিল। চাবিটী একটী স্ত্রীলোকের দ্বারা বাবুদের বাড়ি পাঠাইয়া দিল।

অবলা যোগেন্দ্রের সঙ্গে চলিল। যে একথা শুনিল সেই কাঁদিল। বিষমপুরের দেবী বিষমপুরকে কাঁদাইয়া চলিল।

তিন জনে গাড়িতে গিয়া উঠিল। সুশীলা বড়ই রাগিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিন জনে সুশীলার বাপের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামে যাইবা মাত্র একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের গাড়ির পিছনে পিছনে কয়েকজন বালক বালিকা ছুটিতে লাগিল। সুশীলার মা শুনিবামাত্র আনন্দে উন্মত্তা হইল। আনন্দের মধ্যে আবার শোকের তুফান উঠিল। কেন না, সুশীলার বাপ নাই—কে আর সুশীলাকে আদর করিবে—কে জামাইএর যত্ন করিবে। সুশীলার মা আপন স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সুশীলা 'বাবা গো কোথায় গেলি গো' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর ভিতরে গেল। অবলাও নিরবে কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র মা আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলারও কান্না বাড়িল। বাটির ঝিও কাঁদিতে লাগিল। ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের কান্না থামাইতে গেল। সেই বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরের কান্নায় যোগেন্দ্রও বাহির বাটীতে একটু নিরবে কাঁদিল।

মা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া সুশীলার গলা ধরিয়া বলিল, 'মা গো তোর শোকেই তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন,—আমি নিতান্ত পাষাণী তাই এখনও বেঁচে আছি'।

এই কথা শুনিয়া সুশীলা প্রাণ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া 'বাবা গো, ও গো বাবা গো' বলিয়া মাকে আরও ব্যাকুলা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের সকাতর ক্রন্দন দেখিয়া অবলাও নিরবে কাঁদিতে থাকিল। সেই বৃদ্ধা ও বৃদ্ধার কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের চক্ষের জল মুছাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকের বেগ কমিল। কান্না থামিল। কেবল মাঝে মাঝে এক একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস আপনি উঠিতে লাগিল!

সুশীলার মা একটু স্থির হইয়া বলিল 'জামাইকে বাটীর ভিতর ডেকে আন—তেতালার ঘরে বিছানা করে দাও'। যোগেন্দ্র ঝির সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। আবার একবার কান্নার রোল উঠিয়াই নিবৃত্ত হইল।

যোগেন্দ্র তেতালার ঘরে গিয়া বসিল। সুশীলার মা প্রথমে জামাইকে জল খাবার দিয়া পরে সুশীলা ও অবলাকে জল খাবার দিল।

মা জিজ্ঞাসা করিল 'সুশী! এ মেয়েটী কে'?

সুশী বলিল 'বামুনের মেয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছে'।

এদিকে গ্রামে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, বিশেষত: স্ত্রী মহলে যত, পুরুষ মহলে ততটা নহে। কোন মহিলা ঘাটে গালে হাত দিয়া বলিতেছেন 'ওমা সে বেহায়া আবার এসেছে, —অবাক্ কর্‌লে মা'।

কোন মহিলা স্বামীকে বলিতেছেন 'শুন্‌ছ'?

কি?

ওপাড়ার বামুনদের বড়ির সেই কলঙ্কিনী যে এসেছে!

এইবার একঘরে ভাল ক'রে ক'র্তে হবে। সেই যোগে ছোঁড়াও এসেছে। শুন্‌ছি নাকি বে হ'য়ে গেছে।

বিধবা বিয়ে?

বিধবার আবার বিয়ে—কলিকালের পায়ে গড়।

বিদ্যাসাগরের মত।

মুখে আগুণ সে মুখপোড়ার।

আবার শুন্‌ছি নাকি মাগি জামাইএর নামে সব বিষয় লেখাপড়া ক'রে দেবে।

ভালই তো।

তা মাগিও তো বিধবা হয়েছে—ও একটা বিয়ে করুক না কেন?

এইরূপে নানা স্থানে নানা কথা উঠিতেছে।

সুশীলার মা জামাইকে খুব যত্ন করিতে লাগিল। অবলা বাড়ীতে ঘরের মেয়ের মতই থাকিল। অবলার কত আনন্দ, কত সুখ হইল। অবলা রাত্রে সুশীলার মার কাছেই শুইয়া থাকে।

কিছুদিন পরে সুশীলার মা জামাইয়ের নামে সমুদয় বিষয় লেখা পড়া করিয়া দিল।

সপ্তম অঙ্ক।

হঠাৎ সুশীর মার ভয়ানক জ্বর হইল। জ্বরের উপর বিকার। কবিরাজ বলিল 'আর বাঁচিবেন না, এই বেলা গঙ্গা যাত্রা করাও।

যতদিন সুশীলার মা জীবিতা ছিল, তত দিন অবলার বড় কষ্ট হয় নাই। এখন সুশীলা ঘরের গৃহিনী হইলে পর অবলার বড়ই কষ্ট আরম্ভ হইল।

অবলা রাধিত;—তাহাতে কষ্ট নাই; কিন্তু সুশীলা পরিবেশন করিত। সুশীলা অবলাকে আধপেটা খাওয়াইতে থাকিল। অবলা ভাত পায়তো তরকারী পায় না; নুন জোটে তো তরকারী জোটে না। এক এক দিন রাত্রে অবলার আদতে খাওয়া হয় না।

খাইতে না পাইয়া অবলা দিন দিন শীর্ণ হইতেছে; কিন্তু অবলার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। স্বামীকে পাইয়াছে, স্বামীকে দেখিতেছে; ইহাতেই অবলার অনন্ত সুখ অনন্ত তৃপ্তি। এ আনন্দ না থাকিলে অনাহার ক্লেশে অবলা এতদিনে মরিত।

দুষ্টা সুশীলা অবলাকে আধপেটা খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইল না। ক্রমে আর হাঁড়ির ভাত দেয় না; আপনার পাতের ভাত দিতে লাগিল। সুশীলার পাতে যে ভাত থাকিত, যে তরকারী

থাকিত, সে সব আগে সুশীলা কুকুর বিড়ালকে দিত। এখন তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সে সব অবলাকে খাইতে দেয়।

অবলা একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে। একখানি কাপড়েই দিন রাত্রি কাটায়। তাহাতেই স্নান করে। স্নান করিয়া সেই ভিজা কাপড়েই থাকে। সেই ভিজা কাপড় অবলার গায়ে শুকায়। অবলা শীতে অনেক কষ্টে সেই কাপড়েই শীত নিবারণ করে, লজ্জা নিবারণ করে। ইহাতেই অবলার কষ্টের শেষ হয় নাই। এসবের উপর আরও অনেক কষ্টের অলঙ্কার ছিল।

অবলা সুশীলার পাতের ভাত কিছু দিন পরে আর পায় না। বিধাতা তাহাও মাপিতে ভুলিলেন। কোন কোন দিন সুশীলার বিড়াল সব ভাত খাইয়া ফেলিত। অবলার সে দিন আর আদতে জুটিত না। অবলা ক্ষুধার জ্বালায় ভাতের ফ্যান খাইতে বাধ্য হইত। অবলা একদিন ফ্যান খাইল, দেখিয়া সুশীলার বড় আনন্দ। সুবিধা দেখিয়া সুশীলা মাঝে মাঝে অবলার জন্য কেবল ফ্যান রাখিত। অবলা সৌভাগ্য বশতঃ ৪।৫ দিন ভাল ফ্যানই পাইয়াছিল; কিন্তু এক দিন খোরায় ফ্যান খাইতে গিয়া দেখিল, কে সে ফ্যানে খানিকান কাল গোলা মিশাইয়াছে। অবলা তাহা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিল। সুশীলাকে সে কথা না বলিয়া, তাহাকে লুকাইয়া সেই ফেনের খোরা লইয়া খিড়কী পুষ্করিণীতে চলিল। ঘাটে গিয়া পুকুরের জলে ফেন ঢালিয়া ফেলিল। সুশীলা হঠাৎ পা টিপিতে টিপিতে ঘাটে গিয়া যখন দেখিল অবলা জলে ফেন ঢালিতেছে, অমনি বাঘিনীর মত অবলাকে আক্রমণ করিল।

সুশীলা দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটু সরু সুরে বলিল, "বলি হ্যালো! পোড়ার মুখী! (সুশীলা অবলাকে প্রথম প্রথম "অবলা" বলিয়া ডাকিত, তারপর ঘনিষ্টতা বাড়িলে, "পোড়ারমুখী" বলিয়া ডাকিত)। অবলা যেন বাঘিনীর ডাকে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল,—ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

সু। তোমার মুখে কি কেন রোচে না! এত বড় মানুষ হয়েছ! আমরণ! যদি খাবিনা তো নষ্ট করা কেন্‌লো! বাড়িতে একটা কুকুর আছে তার কি খবর রাখিস না! কুকুরের উপর হিংসা ক'রে কেন ফেললি! আচ্ছা থাক তুই! আজ শুধু পেটেই থাকতে হবে। মনে ক'রেছ হাঁড়িতে মুড়ি আছে—এসে হাঁস হাঁস ক'রে খাবেন।

অবলা ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি। ফেনে কে ঘর নিকান গোলা ফেলে ছিল তাই খেতে পারি নাই। আমি আজ আর কিছু খাবনা।

সু। আমরণ! ঘর নিকান গোলা আবার কি লো! একটা না একটা বদনাম আমার নামে রটাতে পারলেই তুই বাঁচিস নয়? যানা কোন চুলোয় যায়গা আছে যানা। ঘর নিকানো গোলাই তোর কপালে এখন জুটলে হয়। অবলা চুপ করিয়া রহিল। ম্লান মুখে খোরা মাজিতে মাজিতে, আপনার দুঃখের চাপে আপনার পাঁজরার হাড় যেন ভাঙিতে থাকিল। সুশীলা রাগে ফুলিতে ফুলিতে থর থর করিয়া চলিয়া গেল। এরূপ তিরস্কার ব্যতীত সুশীলা অবলাকে সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিল, চাপড়, ঠোনা, লাথি এসব তো অবলার নিত্য

আহার ছিল। এ ছাড়া কখন কখন গরম হাতার ছাঁকা পর্য্যন্ত অবলার অদৃষ্টে জুটিত।

বিড়ালে হাঁড়ির মাছ, কড়ার দুধ খাইলে; কুকুরে হাঁড়ির ভাত খাইলে; সুশীলা পাড়ার স্ত্রীলোক দিগের কাছে পথে ঘাটে অবলার নামে দোষ দিত। যারা সুশীলার কোন ধার ধারিত না তাহারা সুশীলার উপর মনে মনে চটিত; কখন বা দুকথা গরম গরম শুনাইয়া দিত। তাহাতে সুশীলার রাগটা অবলার উপরেই অধিকতর জ্বলিয়া উঠিত। আর যাহারা সুশীলার নিকটে নুনটুকু, তেলটুকু, মসলাটুকু চাহিবামাত্র পাইত তাহারা বাধ্য হইয়া অবলাকে গালি দিতে থাকিত। কুকুর বিড়ালের সৌভাগ্য ছিল, অবলার তাহা ছিল না। এ জগতে যাহারা প্রেমের পথে যায় তাহারা অবলার মত কুকুর বিড়ালের দশা খাইয়া থাকে।

একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ একটা কুকুর আসিয়া, রান্নাঘরের মাছ ভাত খাইয়া পলায়। অবলা তখন সুশীলার বিছানা ভাল করিয়া ঝাড়িতে ছিল; আর সুশীলা তখন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পাড়ার নিস্তারিণীর কাছে তেজাল ভাষায় অবলার নিন্দা করিতে ছিল।

সুশীলা ভাত খাইবার জন্য, রান্নাঘরে গিয়া যখন দেখিল, হাঁড়ি উল্টান, ভাত ছড়ান, মাছ ছড়ান; তখন সুশীলার আপাদ মস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে রাগ অবলাকে আগুনে পুড়াইতে অথবা বঁটীতে কাটিতে সুশীলাকে তাড়া দিতে থাকিল। সেই রাগ তখন উন্মত্ত হইয়া সুশীলার চক্ষু দুটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে চীৎকার করিয়া অবলাকে ডাকিল "বলি ছ্যাবো

পোড়ারমুখি। খান কি। এখন তুই বাড়ি হ'তে বেরো! এখনি বেরো! এখনি বেরো! তোর যোগীন বাবাকে বড় ভয় করি কি না! সে কার খায় তা জানিস? তার আবার জোর করিস কি?

রাগ আরও চড়িয়া উঠিল। তখন সুশীলা এক গাছা খাংরা লইয়া, "বেরো বলছি এখনি বেরো," বলিতে বলিতে অবলার সুন্দর ম্লান মুখে, ছপ্ ছপ্ করিয়া আঘাত করিল। অবলার মুখ ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। অবলা তাহাতেও নড়েনা দেখিয়া অবশেষে ঝাঁটা দূরে ফেলিয়া ভূয়ে চাপিয়া বসিল; তার পর দুই হাত মাটীতে রাখিয়া হাতের আঙুল মুচড়াইতে মুচড়াইতে এলো চুলে, শরীর দুলাইয়া, দাঁত খিঁচাইয়া, থুঁতকুড়ি ছড়াইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিল, "বাড়ি থেকে না বেরোবি তো তোর যোগীন বাবার মাথা খাবি" মাথা খাবি;—তার মরা মুখ দেখবি তার মরা মুখ দেখবি। অবলা তখন ধীরে ধীরে ম্লান মুখে বাটীর বাহিরে গেল। সুশীলা অমনি বাটীর দ্বার বন্ধ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবলা মলিন মুখে বাটীর বাহিরে গেল। কোটার দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। "কোথায় যাব? সময়ে সময়ে একটু আধটু জ্বালা যন্ত্রণা আসে; তা বলিয়া, স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইব! পিতা মাতা নারায়ণ সমক্ষে যাঁর চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁরে ছাড়িয়া কোথায় যাইব! স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে ঐ শ্রীচরণ ব্যতীত আমার যে আর কোন আশ্রয় নাই;—আমি সে শ্রীচরণ ছাড়িয়া কোথায় যাইব! যদি তাঁর শ্রীচরণের ছায়ায় পীপিলিকার থাকিবার মত একটুকু মাটী পাই তাহাই আমার অনন্ত স্বর্গ;—আমি সে স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইব। সে স্থানে দাঁড়াইয়া যদি বজ্রাঘাতে মরি, আগুণে পুড়ি তাহাতে আমার যে সুখ যে তৃপ্তি, স্বর্ণ অট্টালিকায় সহস্র দাস দাসী সেবায় থাকিলে সে সুখ সে তৃপ্তি আমার হবে না। ভগবান আমায় যে মাটীতে গড়িয়াছেন তাহাতে ওসব জিনিসে সুখ হবে না—তা বলিয়া কি করিব—আমার সবই বিপরীত। স্বামীর স্থল যাহা, তাহাই আমার ইহকাল পরকাল;—সে স্থলের বাহিরে যাহা সেখানে আমার অধিকার কি যে সেখানে গিয়া হাঁপ ছাড়ি। আমি তাঁকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই দেহ তাঁর চরণে পাত করিব—ইহাতে আমার কিছু অধিকার নাই।" অবলা নীরবে এই সব ভাবিতেছে;—যেন হৃদয় সাগরে তুফান উঠিতেছে। অবলার পাশে ফুল বাগান—যোগেন্দ্রের বিশ্রাম—

অবলার মাথার উপরে নক্ষত্র পূর্ণ আকাশ—তাহাতে রাত্রি ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছে এবং সেই গাঢ়তার চাপে বনে ফুল ফুটিতেছে জলে গাম্ভীর্য্য বাড়িতেছে আর প্রাণী জগৎ ক্রমশঃ অচৈতন্যে মিশিয়া যাইতেছে। অবলার চারিদিকে শ্যামলা প্রকৃতি খদ্যোৎপূর্ণ হইয়া চক্‌মক্ করিতেছে। সেই আঁধার মিশ্রিত তরু সকলের মাথায় জ্যোৎস্না হাসিতেছে—ঝোপের ভিতরে জ্যোৎস্না কণা বায়ুভরে নাচিতেছে—গাছের তলায় মাটীতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—তাহাতে ক্লান্ত—শাখা—পত্র সম্বলিত বৃক্ষের ছায়া পড়ায়, যেন সোনালি রঙে, কাল রঙের বৃক্ষ-ছবি চিত্রিত হইয়াছে। ঈষৎ বায়ু প্রবাহে আলোকের সহিত সেই সব বৃক্ষ ছায়া নড়িতেছে। অবলা একটী গাছের ছায়ায় বসিল,—অবলার বস্ত্রাচ্ছন্ন দেহের উপরে—পিঠে পায়ে মাথায় বৃক্ষ শাখার ছায়া সকল পড়িয়া অবলাকে চিত্রিতের ন্যায় দেখাইল। সেই সুন্দর চন্দ্রালোকে গাছ পালার ছায়া দেখিবামাত্র অবলার শোকপূর্ণ প্রেম-সাগরে ভাবের তুফান উঠিল:—"এই জ্যোৎস্নায় যেমন ছায়া, তেমনি আমার স্বামীতে আমি। আলো যতক্ষণ ছায়াও ততক্ষণ। আলো যায় সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও যায়। ছায়া আলোর স্ত্রী। ছায়ার মত সতী কে আছে? আলো আপনার বুকে করিয়া ছায়াকে নাচাইতে নাচাইতে যেই বিলীন হয় ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে যায়;—ছায়ার মত সতী কে আছে? আমার কপালে কি তা হবে? আমি কি স্বামীর আলোকে থাকিয়া স্বামীর সঙ্গে মিশিতে পারিব!" ভাবিতে ভাবিতে অবলা উঠিল। ফুল বাগানে প্রবেশ করিল। আজ প্রবেশ করিয়াই আপনার হৃদয়ে গাছ পালা লতা পাতা

ফল ফুল সমুদয় আচ্ছন্ন করিল---কেননা সে সবই তার স্বামীর ;—অবলার হৃদয় ভিন্ন তাহাদের আশ্রয় আর কোথায়? স্বামী কত বার দিনে রেতে সেই বাগানে বেড়াইয়াছেন বিশ্রাম করিয়াছেন। অবলা বাগানে জ্যোস্নালোকে অস্ফুট ভাবে যেন স্বামীকে দেখিতে লাগিল। ঐ একস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; ঐ বসিয়া আকাশের চাঁদ দেখিতেছেন। ঐ কামিনী গাছের তলায়, ঐ ঘাস বনে গাছের আলোক মিশ্রিত ছায়ায় যেন স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ গাছের ঝোঁপের মধ্যে কুসুম গুচ্ছ নিপতিত চন্দ্রালোকের শোভা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। হঠাৎ মন্দ মন্দ বায়ু বহিল ; অমনি গাছের শাখা পল্লব পাতা ফুল সমুদয় যেন জীবন সঞ্চারে যুগপৎ নড়িয়া উঠিল ;—এখানে ওখানে দুই একটা ফুল পাতা টুপ টাপ করিয়া খসিয়া পড়িল। আর প্রকৃতির আনন্দোচ্ছ্বাসবৎ সেই আকস্মিক বায়ু সঞ্চারণে, যেন, স্বামী অমৃতস্পর্শ সুখে অভিভূত হইয়া থাকিল। অবলা এইরূপে প্রেম কল্পনার তুলিকা সঞ্চারে সেই জ্যোৎস্নাপূর্ণ শ্যামলা প্রকৃতির অঙ্গে স্বামীর সুমধুর মূর্ত্তি কতভাবে চিত্রিত করিতে করিতে আপন হারা হইতে লাগিল।

যোগেন্দ্র একদিন সেই কামিনী তরু তলে বিশ্রাম করিতে ছিল, আর অবলা সেই বাগানের পুষ্করিণী হইতে কলসী কক্ষে জল আনিবার সময় সে রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়াছিল। আজ সে কথা মনে পড়িল। অমনি মনের সেই প্রতিবিম্ব বাহিরে ফুটিয়া উঠিল ;—অবলার সমস্ত প্রকৃতিতে অমৃত সঞ্চারের অনুভূতি প্রবল হইল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কামিনী তলে গিয়া কল্পিত স্বামী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। তারপর

কাঁদিতে কাঁদিতে মুদিত নয়নে সেইখানে বসিয়া পড়িল। অবলা সেই কামিনী তরুর কাছে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিল। অনেক সময়ে মানুষ অভাবে গাছের কাছেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাতনার লাঘব হয়। গভীর দুঃখে মানুষ, অনেক সময়ে, আপনার জন ছাড়িয়া, গাছের গলা জড়াইয়া ধরে। অবলার আজ সেই দশা। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রার্থনা করিল "প্রভু! মরিয়া যেন কামিনী-ফুলের গাছ হই; আর রাত্রে হউক দিনে হউক, এক দিনের জন্য কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তোমাকে আমার তলে পাই; এবং যেন এমনি করিয়া আমার রাশি রাশি ফুল তোমার অঙ্গে মৃদু মৃদু ঢালিয়া সুগন্ধ দানে তোমার মনোতৃপ্তি করিতে পারি। তাহাতে আমার সুখ আমার অনুভব না হউক তোমার তো হবে। নারী জীবনে তো তোমার সুখে আসিলামনা প্রভু! যদি কাষ্ঠ জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আসি তাহাই আমার সৌভাগ্যের শেষ সীমা। আমার আর কোনও ইচ্ছা নাই। তুমি তো একবার স্পর্শ করিবে, আমার ফুলে তো আঘ্রাণ করিবে, আমার ছায়ায় তো বসিবে, আমার শাখাস্থ পাখীর গানে তো তৃপ্তি পাইবে,— ইহাই আমার চরম বাসনা। ভগবান অবলার এ বাসনা কি কোন জন্মেও পূর্ণ করিবে না!"

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সুশীলা অবলাকে বিদায় করিবার পর উদরের জ্বালা নিবারণ করিয়া বিছানায় শুইয়া ভাবিল। "তাড়াইয়া ভাল করি নাই। অত সস্তায় দাসী পাওয়া যায় না। কাজ কর্ম্মগুলাও গতর দিয়ে করে। যদি কাল আসে;—আসিবে না তো অবার যাবে কোন চুলায়? কতবার তাড়ালাম কতবার এলো এইযে! তা কাল আগে যদি তাড়াবনা। দুএকটা না হয় ভাল কথাই বলিব। তা এমন কিই বলেছি! কার ঘরে এমন না হয়? আমি তাই অনেক সহ্য করিয়া আছি; অন্য কেহ হইলে তার মুখ দর্শন করিত না"।

পর দিন প্রাতে অবলা খিড়কির দরজার কাছে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া কি ভাবিতেছিল; সুশীলা—হড়াৎ করিয়া খিড়কির দ্বার খুলিল। বাহিরে অবলাকে দেখিয়া মনে মনে বড় খুশী। সুশীলা তখন একটু বাঁকা নরম স্বরে "তা দাড়িয়ে কেন? যাওনা ঘরে যাওনা। অবাক করেছে বাবা! সমস্ত রাত যে একবারে দেখাই নাই! আমি তাই এত চেপে চুপে ঘর কন্না করি বাবা! অন্য কেউ হ'লে ঢাকে কাটি দিত; আমার মুখ টোই না হয় একটু খারাপ, এক ঘা না হয় মেরেছিই কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে টান আছে তা তো আর পাড়ার লোকেরা বোঝেনা! যা যা শীঘ্র দুটো ভাত চড়াগে যা। কাল থেকে দুজনেই অনাহারে আছি।"

অবলা গুড় গুড় করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

কয়দিন পরে অবলার আকার মড়ার মত হইল। নানা ব্যাধি অবলাকে আক্রমণ করিল। একদিন সুশীলার পীড়নে তিনবার পচা খিড়কী পুকুরের জলে স্নান করায় মড়ার দেহে ভীষণ জ্বর দেখা দিল। তিন দিন পরে, অবলার বিকার হইল; চোখে ঘোলা পড়িল; অবলা শয্যা শায়িতা হইয়া নানাবিধ খেয়াল দেখিতে লাগিল। যে দিন বিকারের বড় বৃদ্ধি, সে দিন অবলা দেখিল, যেন সে সেনপুরের বাটীতে, তার কাছে মা, বাপ, ভাই সব বসিয়া রহিয়াছে। অবলা তাহাদের কাছে আপনার দুঃখ-কাহিনী বলিতেছে। হঠাৎ যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অবলা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল, ঘরের ভিতরে লুকাইল, অবলার বাপ মার জামাই দেখিয়া বড় আনন্দ। দেখিতে দেখিতে অবলার সে সব ভ্রম পরিবর্ত্তিত হইল। অবলা দেখিল যোগেন্দ্র নাই, বাপ মা ভাই কেহ নাই। সেনপুর জনশূন্য। অবলা অন্ধকার রাত্রে এক ভীষণ জঙ্গলের মাঝখানে বসিয়া কাঁদিতেছে। অবলা তখন বাস্তবিক বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালিস আর্দ্র করিতেছিল।

অবলার কাছে একটী যুবতী বসিয়া অবলার গায়ে হাত বুলাইতেছিল, মাঝে মাঝে মাথায় বরফের জল দিতে ছিল; এবং বিকার প্রলাপ শুনিতে শুনিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। যুবতী অবলাকে কাঁদিতে দেখিয়া, কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,

"দিদি! ও দিদি"! অবলা শাড়া দিল না। যুবতী অবলার মাথা ঠেলিয়া আবার জোরে ডাকিল, "দিদি! ও দিদি!" অবলা যুবতীর দিকে চাহিল, চুপ করিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ চাহিয়াই থাকিল। অবলার মনে হইল যেন যোগেন্দ্র কাছে বসিয়া আছে; সেই জঙ্গলের একটা গাছের ছায়ায় যোগেন্দ্র বসিয়া আছে। অবলা যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "তা এতক্ষণ আমায় জঙ্গলে ফেলে কোথায় ছিলে? বাপ মা মরা ব'লে কি তোমার দয়া হয় না"? বলিয়াই অবলা কাঁদিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া আবার নীরব হইল। চুপ করিয়া যুবতীর মুখের দিকে পাগলিনীর মত তাকাইয়া র'হল; তার পর বিছানায় কি হাতড়াইতে লাগিল। অবলা বিছানাটাকে একটা ফুল বাগান মনে করিয়া যেন পুষ্পচয়ন করিতে লাগিল;—বিছানায় সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি হইতে থাকিল। ফুল লইয়া আবার মালা গাঁথিতে লাগিল;—ঠিক তদ্রূপ হস্ত-ভঙ্গি হইতে থাকিল। অবলা মুচকিয়া হাসিল,—হাসিতে হাসিতে বিড় বিড় করিয়া বলিল; আমার মাথা খাস, এমালা যেন কেউ বাপু ছুঁওনা; এ তাঁর গলায় পরয়ে দেব। নলিনি আমায় বকুল ফুলের মালা দিয়েছিল। আমি তা লই নাই। নলিনী তাতে কেঁদেছিল। আহা! নলিনী কোথায় গেলি! মাগো! আর তাকে কাঁদাবনা। সেই মালা গাছটাকে কাঁদাবনা মাগো! কেউ ছুঁওনা কেউ ছুঁওনা; আমার মাথা খাস বাপু! তোরা কেউ ছুসনি! কি আপদ! আমি যত বলি তত ছুঁতে যাচ্ছিস কেন লো!

ন। কে ছুঁতে যাচ্ছে?

অ। ওই কে এক ছুঁড়ি, নিবি না খিরি বুঝি !! বলিয়াই আবার চুপ করিল। তুলা পিঁজিবার মত আঙুলের ভঙ্গিমা করিতে লাগিল। আবার যেন আকস্মিক উদ্বেগে উত্তেজিত হইয়া বলিল "নলিনী শ্বশুর বাড়ি যাবে তার মালা তাকে দেব"। পাশের যুবতী বার বার "নলিনী" নাম ও ফুলের মালার কথা শুনিতে শুনিতে একটা অস্থিভেদী যাতনায় অস্থির হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল;—কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল, "হরি যদি বাঁচান তবেই সব সার্থক হবে"।

অবলা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। বালিস হইতে বার বার মাথা তুলিতে লাগিল। বসিবার প্রয়াস পাইল। যুবতী অবলাকে বিছানায় স্থির রাখিবার জন্য অবলাকে জোরের সহিত ধরিয়া রাখিল;—অবলা প্রবল বেগে উঠিবার জন্য যুবতীকে ঠেলিতে লাগিল। যুবতী বিকারের সে বলে হারিয়া গেল। অবলা মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বসিয়া জোরে যুবতীকে ধাক্কা মারিল। যুবতী পড়িল না, ধাক্কা সামলাইল। অবলা তখন পাগলিনীর বেশে এলো থেলো চুলে রুক্ষ মূর্ত্তিতে কড়ি কাটের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; কাঁদিতে কাঁদিতে আবার নলিনীর দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যাকুলস্বরে কহিল; "যোগেন্দ্র বাবুর বড় ব্যারাম; তোদের তো বাপু একটু হুঁস নাই; আমি সিঁদুরের কৌটা লয়ে, হাতে চার গাছা লোহা পরে, এখনি যমের বাড়ি যাব; সেখানে যম মুখ পোড়ার বাড়ির দ্বারে চাবি দিয়ে আসব। তার পর কালি ঘাটে মা কালীর কাছে বুক চিরে রক্ত দিয়ে আসবো; তবে না আমার স্বামী বাঁচবেলো আবাগীর ঝি! বলিয়াই উন্মাদিনীর মত

বিছানা হইতে উঠিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেছে; যুবতী অবলার দুহাত জোরে ধরিয়া আছে। অবলা হাত ছাড়াইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে লাগিল, যুবতী অবলার হাঙ্গামায় বিছানায় পড়িয়া গেল। অবলা তখন উঠিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল; ঘুরিয়া পড়িল; দেওয়ালে বড় আঘাত লাগিল; কপাল ছেচিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। যুবতী একলা বড় ভয় পাইয়া সুশীলাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। সুশীলা শুনিয়াও শুনিল না; মনে মনে চটিল। একবার বিকৃত মূর্ত্তিতে ঘরে প্রবেশ করিল। ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল, তোমার যেমন কাণ্ড বাছা! কাজ নাই কর্ম্ম নাই রাত দিন ওর কাছে ব'সে আছ! ওর অনেক দুষ্টামি আছে! তা কিছু বুঝেছ! সাধে আমি ওর কাছে ঘেসি না"। বলিয়াই সুশীলা ঠর ঠর করিয়া চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল। ঠিক ঐ সময়ে ডাক্তারের সহিত বাড়িতে প্রবেশ করিল। ডাক্তরকে অল্প-ক্ষণ সদরে রাখিয়া; ঘরের ভিতরে গিয়া অবলার সেই সব কাণ্ড দেখিয়া বড় ভয় পাইল। ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে আনিল। ডাক্তর অবলার হাত দেখিল, সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ঔষধের বন্দবস্ত করিল। অবলার মাথায় বুকে বেলেস্তারা দিল।

অনেক দিন এইরূপে যাইল। একচল্লিশ দিনের দিন অবলার একটু জ্ঞান হইল। অবলা যেন একটী গভীর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল। ৪০ দিনের দিন অবলা একটু প্রকৃতিস্থা হইল বটে কিন্তু দুর্ব্বলতা যৎপরোনাস্তি। অবলা তখন উঠিয়া বসিতে পারে না।

এক দিন ডাক্তার রোগীর অবস্থা বুঝিয়া সেই ঘরে যোগেন্দ্রকে বলিল "ব্যারামটা বাড়ির দোষেই হয়েছিল; পেটভরে বোধ হয় খাওয়া হত না। এখন পথ্যের বন্দবস্ত হ'লেই সব আরাম হবে"।

ডাক্তার ও যোগেন্দ্র চলিয়া গেল। অবলা চক্ষু মুদিল। মুদিয়া হৃদয়পটে যোগেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভাবিল "ডাক্তারের কথা যদি সত্য হয়; যদি বাঁচি তো আরো দেখিয়া সুখী হব";—অমনি মুদিত চক্ষু দিয়া জল ধারা ঝরিল।

পাশের যুবতীটী তাহা দেখিয়া, অবলার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "ওদিদি! দিদি!"

অবলা যুবতীর মুখের দিকে চাহিল। যুবতী আবার বলিল, "তুমিতো ভাল হয়েছ দিদি! আবার কাঁদ কেন"?

অবলার চোখের ধারা বাড়িল। যুবতী আঁচলে চক্ষু মুচাইয়া জিজ্ঞাসিল, "দিদি! আমায় চিনতে পার?

অবলা এতদিন যুবতীকে চিনিতে পারে নাই। এখন শেষ কথাটা শুনিয়াই যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবলা যুবতীকে চিনিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইতে থাকিল। "তাই তো কে? সেনপুরের হরি দাসির মত কে? না সে নয়,—তার তো চুল এত নয়"।

"বিষমপুরের জমিদারদের বাড়ির মুক্ত নাকি?

না—তার তো রং এর চেয়ে অনেক ফরসা"।

এইরূপে অনেক আলোচনা করিতে করিতে, অনেক স্ত্রীলোকের সহিত তুলনা করিতে করিতে পরিশেষে যুবতীর

চিবুকে একটী তিল দেখিবামাত্র যেন অনেকটা চিনিল;—আবার সামান্য সন্দেহ হইল;—তারপর হৃদয় চমকিয়া উঠিল, অবলার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হইল, অবলার দুচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল;—অবলা কাঁদিয়া ফেলিল; অবলার কণ্ঠরোধ হইল; অবলা কাঁপিতে কাঁপিতে যুবতীর গলা জড়াইল;—যুবতীর বুকে মুখ গুঁজিয়া উন্মাদিনীবৎ চীৎকার করিল "নলিনীরে তুই এত দিন কোথায় ছিলি?" অবলা আর কথা কহিতে পারিল না; দুর্ব্বল হইয়া যুবতীর কোলে মাথা রাখিয়া স্থির হইয়া থাকিল। তখন যুবতী দুঃখের উৎপীড়নে ব্যাকুলতায় আপনহারা হইয়া অবলাকে জড়াইয়া ধরিল। দেখিল ঘামে অবলার গা ভিজিয়া গিয়াছে—কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে। যুবতী অবলাকে পাখার বাতাস দিতে দিতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

অবলার দুঃখ বেগ বড়ই বাড়িয়া উঠিল। অবলা কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতীর ক্রোড় হইতে মাথা তুলিল। উঠিয়া বসিল। বসিয়া দুইহাতে নলিনীর গলা জড়াইল। নলিনীও অবলার সে ভাবে উন্মাদিনী প্রায় অবলাকে আলিঙ্গন করিল;—তখন দুজনের হৃদয় একত্রে স্পন্দিত, অশ্রুধারা সম্মিলিত, এবং ঘন ঘন উষ্ণশ্বাস বিমিশ্রিত হওয়ায় দুজনে যেন এক প্রাণে মিশিয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবের বন্যা কমিলে অবলা নলিনীর কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। উর্দ্ধদৃষ্টে নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বড় আরাম পাইল। নলিনি তখন ভাবে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসিল, "দিদি! মালা-জপা এতদিনে সার্থক হয়েছে"?

কথা শুনিবা মাত্র অবলার প্রকৃতি চমকিয়া উঠিল। সে প্রশ্নের ভিতরে যেন দূরাকাশ হইতে চাতকের শব্দের মত কি প্রাণারাম শব্দ অনুভূত হইল। অবলার দুচক্ষু দিয়া জল পড়িল। ভাবভরে অবলা কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া থাকিল।

"তারপর অবলা নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া উদ্ভ্রান্ত প্রেমে বলিল; "আর একটী সাধ আছে নলিনী"। বলিয়াই অবলা চক্ষু মুদিল;—সেই সাধের মায়ায় আচ্ছন্ন হইল;—মুদিত চক্ষু উপচাইয়া তখন জল-ধারা ঝরিতে থাকিল। নলিনী সজলনেত্রে অবলার চখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ভগবান তাহাও পূর্ণ করিবেন। কি সাধ?"

অবলা তখন যেন মৃত্যুর কণ্ঠক পূর্ণ শয্যায় পুষ্পশয্যা বিছাইয়া তাহাতে আরামে শুইয়া মুদিতনেত্রে জড়িত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল "এইরূপে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, এইরূপে মুখের দিকে চক্ষু স্থির করিয়া মরিবার সাধ নলিনী!"

অবলার এই কথা শুনিবামাত্র চারিদিকের প্রকৃতিতে যেন একটা চমক লাগিল;—নলিনী তখন দেখিল, তার প্রকৃতিতে কি একটা আবেশের ঘোর তাহাকে বিভোর করিতেছে আর যেন সমুদয় জগৎ সেই ঘোরে আচ্ছন্ন হইতেছে;—যেন সে কথার কুহকে জগতে প্রেমের ধাঁধাঁ লাগিতেছে। নলিনী সেই অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিল। তারপর, অবলার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "সে সাধও ভগবান পূর্ণ কর্‌বেন; আর কেঁদনা অসুখ বাড়বে।"

কিছুপরে, উভয়ের কোমলভাব কমিয়া আসিল। অবলা বালিসে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল,—নলিনীর গলায় একটী হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসিল, "আমার খবর কোথায় পেলি ?"

ন। আমার যে এখানে মামার বাড়ি। মামার বাড়িতে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলাম। মার সঙ্গে একদিন দেখতে এলাম; এসেই বুঝলাম আমারই সর্ব্বনাশ।

অ। আমার কপাল তবে বুঝি ফিরেছে ভাই! আমার মামার বাড়ির খবর কি ?

ন। সব ভাল। তোমার মামী তোমার জন্য কাঁদে। সকলের বিশ্বাস তোমায় বাঘে খেয়েছে।

অ। ওমা। ও আবার কি কথা ?

নলিনী অনেক কথা বলিল। অবলা বিবাহের রাত্রে পলাইয়া আসিবার পর যা যা ঘটিয়াছিল নলিনী সবিস্তার বর্ণনা করিল। তারপর নলিনী বলিল "আমার কর্ত্তা যে এখানে আছেন"।

শুনিবামাত্র অবলার মুখে চোখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। অবলা তারপর নলিনীর চিবুক ধরিয়া "আমাকে কবে দেখাবি ?" বলিয়াই অবলা আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিল।

ন। তিনি তোমায় কয়দিন ডাক্তার ও যোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে যে দেখে গেছেন। তিনি সিমলে গেছেন।

অ। বলিস কি ভাই! আমার কাপড় চোপড় ঠিক ছিল না। আমায় দেখে গেছেন। ভাই! আমার ম'লেই ভাল ছিল। আর এ মুখ দেখাতে হ'ত না"। বলিয়া অবলা কাঁদিতে লাগিল

ন। দিদি! আমি কি তখন মরেছিলাম। তোমার কাপড় আমি সর্ব্বদা ঠিক ক'রে রাখতাম। সে জন্য তুমি ভেবনা। আমার সে দিকে খুব হুঁস ছিল।

বলিয়া নলিনী অবলার চক্ষু মুছাইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

অবলার যে দিন হইতে বিকার হইল, সুশীলার সে দিন হইতে আনন্দ বাড়িল। অবলা সুশীলার পথে কণ্টক ছিল না; কিন্তু ভবিষ্যতে কণ্টক হইতে পরে এই আশঙ্কায় সুশীলা অবলাকে দেখিতে পারে না। অবলা আবার সুশীলা অপেক্ষা সুন্দরী। সেটা আরও আশঙ্কার কারণ। অবলার বিকারে সুশীলার তাই আনন্দ বড়িল। অবলা মরিলে সুশীলা নিষ্কৃতি পায়;—সুশীলার হাড়ে বাতাস লাগে। সুশীলা ঘুম হইতে উঠিয়াই সকালে বিকালে অবলার মৃত্যুর জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে। ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে প্রতিনিশ্বাসে অবলাকে যমালয়ে প্রেরণ করে। পুকুরে স্নান করিতে যাইবার সময় রাস্তায় দেব মন্দিরের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে দেবতাকে প্রণাম করিয়া মানস করে "অবলা মরিলে চিনির নৈবেদ্য

দিব"। গ্রামের কালীর কাছে সুশীলা মানস করে "অবলা মরিলে জোড়া পাঁটা দেব; সোণার খাঁড়া দেব"। কিন্তু অবলা মরে না।

একদিন পুকুরের সান বাঁধান ঘাটে; সুশীলা জলের ভিতরের একটী চাতালে পা রাখিয়া, উপরের একটী চাতালে পা দিয়া, ডান হাতে ঝামা লইয়া পার গোড়ালি মাজিতেছে। সুশীলার কাঁকাল পর্য্যন্ত কাপড় ভিজা; ভিজা কাপড় সুগোল নিতম্বে মাঝে মাঝে কুঁকড়াইয়া নিতম্বে জড়িত হইয়াছে; সেই ভিজা কাপড়ের ভিতর দিয়া নিতম্বের শোভা ফুটিয়া পড়িতেছে। পৃষ্ঠদেশের খানিকটা কাপড়ে ঢাকা, খানিকটা খোলা। বুকের উপরে কাপড় আলগা হওয়ায়, আলগা কাপড়ের দুপাশের ফাঁক দিয়া দুটা স্তনের অর্দ্ধ গোলকদ্বয় দেখা যাইতেছে;—যুবতী ঐরূপ ভাবে থাকিয়াই, আলতা পরা পার গোড়ালী ঝামা দিয়া মাজিতেছে। মাথার বেণী কাল-সাপের মত ঘাড়ের পাশ দিয়া ঝুলিতেছে। এমন সময়ে কোন বর্ষিয়সী ঘড়া কাঁকে লইয়া ঘুটের ছাইএ দাঁত মাজিতে মাজিতে ভ্যাঙাইতে ভ্যাঙাইতে ঘাটে আসিল। চাতালে ঘড়া নামাইয়া সুশীলাকে জিজ্ঞাসিল "ভাল এক আপদ এনে তোরা যে জ্বালাতন হ'লি লো"। সুশীলা তখন উপর চাতালের পা খানি জলে নামাইয়া উর্দ্ধমস্তকে দাঁড়াইয়া বর্ষিয়সীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল," খুড়ি মা! আমি আর কি বলব বল, আমাদের বাবুটী যত গোলের সর্দ্দার—এখন টের পাচ্ছেন।

ব। তা আপদ ম'লে যে তোরাও রেহাই পাশ, তারও হাড় জুড়োয়।

সু। হাঁ! মরবে! ওর আবার মরণ আছে—যমের অরুচি—আমার বাড়িতে পদার্পণ করেই তো মাকে আমার খেলে তত মড়কে মা, বাপ, ভাই, খুড়ো, খুড়ি সবার মাথা খেয়ে এখন বিকারে পড়ে মরেও মরছেনা। কাল ধাত ছেড়ে যাবার মত হয়েছিল—আবার ধাত ভাল হয়েছ। তাই না হয় ব্যারাম হয়েছে চুপ করে পড়ে থাক। ওমা! তা থাকবে—জ্বালয়ে পুড়য়ে সব খেয়ে তবে যমের বাড়ি যাবে।

ব। তা যা বলছিস সবই সত্যি—ওর দুষ্টামী আছে বইকি—তা ভগবান জানেন মা! হাঁগা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ;—তা আমি কাকেও ব'লবোনা।

সু। তা বোলনা—বোলতে দোষ কি?

বর্ষিয়সী তখন মুখখানা সুশীলার মুখের কাছে লইয়া গিয়া চুপে চুপে বলিল, "শুনতে পাই নাকি—কিছু মনে করিসনি মা আমার ও শোনা কথা।

সু। তা বলনা বলনা ; হক কথায় আর ভয় কি মা।—

ব। শুনতে পাই নাকি যোগীনের সঙ্গে আছে?

সু। ওমা! এই কথা? তা খুড়ি মা! এ আর নূতন কথা কি? কেবা না জানে? ও যে অনেক দিন থেকে। ও কথা কি চাপা থাকে? ধর্ম্মে ঢাকে কাটি দেয় যে মা! তাইতো আমি হারামজাদীকে দেখতে পারি না। পাড়ার লোক কি তা বোঝে আমাকেই দোষ দেয়। আবাগীদের কি চোখ আছে—চোখের মাথা যে খেয়ে বসেছে। খেতে পাচ্ছিলিনা—কেঁদে কেটে এলি ভালই—জেতের মেয়ে কাজকর্ম্ম কর, ঘরের মেয়ের মতন থাক—ওমা! তা নয়! হারাম-

জাদীর স্পর্দ্ধার কথা ব'লতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। মুখ-পুড়ি কিনা তাঁর সঙ্গে চোখ ঠেরা ঠেরি করে রাতদিন তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। আর যেয়াদা বলব না—গা কাঁপচে। মরে ভালই আর না মরে তো এবার ঝাঁটার চোটে গাঁ-ছাড়া ক'রবো।

দুজনের কথা হইতেছে এমন সময়ে এক বৃদ্ধা গামছা-পোরা একটী টুকনি ঘটি বাম হাতে ধরিয়া একটী ছড়িতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা কাল কুষ বাঁকা, উপর চাতালে আস্তে আস্তে ছড়িটী রাখিল তারপর দুহাতে ভর দিয়া চাতালে আস্তে আস্তে বসিল। তারপর নিতম্ব ও দুহাতের কব্জিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল। জলের কাছে গিয়া কুঞ্চিত সাদা ভ্রূ দুটী ঊর্দ্ধে আকর্ষিত করিয়া দৃঢ় দৃষ্টিতে সেই দুজনের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বিশেষ আগ্রহের সহিত অতি বৃদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসিল;—কেগা? নাত বউ নাকি?

বৃদ্ধার আন্দাজে ভুল হইয়াছিল, তাই দুজনে একটু হাসিল। সুশীলা জোরে বলিল "ঠাঁন দিদি! চোখের মাথা কি একবারে খেয়েছ"?

বৃ। ওমা তুই! আর দিদি! গেলেই হয়, তা আর কে?

সু। বলনা কে?

বৃদ্ধা তখন বর্ষিয়সীর মুখের কাছে মুখ খানা লইয়া গিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে একটু বিস্মিত ভাবে বলিল "ওমা! আমাদের দেবোর মা।" তার পর বৃদ্ধা একটু সরিয়া জলের উপরে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিল।

বসিয়া গামছা খানা ঘটি হইতে লইবার জন্য ডান হাতটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, হাতড়াতে হাতড়াতে গামছাও পায় না ঘটিও পায়না তখন একটু বিস্মিত ও বিকৃতভাবে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল "ও নাতনী। আমার ঘটি গামছা ভাই কোথা গেল?"

বর্ষিয়সী রহস্য করিয়া বলিল "আর দুর মাগি! ঘটি গামছা বাড়িতে ভুলে এসেছ।"

বৃ। জ্বালাসনি ভাই! লুকয়ে রেখেছিস—তুই ঘাটে এলেই জ্বালাতন করিস, দে ভাই দে। তোর সাত বেটা হ'ক অনেক বেলা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে বৃদ্ধার সম্পর্কীয়া এক ১২ বৎসরের নাত্নী আসিয়া বৃদ্ধার লাটিটী এক যায়গায় লুকাইয়া ঘটী ও গামছা জলে ডুবাইয়া তামাসা দেখিতেছিল—বৃদ্ধা সে বালিকাকে আদতে টের পায় নাই। বালিকার নাম বসন্ত। সে ঘাটে বুড়িদের সঙ্গে প্রায়ই রঙ্গভঙ্গ করে। কখনও কখনও উৎপাতও করে। বুড়িদের শুষ্ক কাপড়ে জল ঢালিয়া রাখে—কাসুন্দি মাখাইয়া দেয়—কখনও যো পাইলে ইট জড়াইয়া কাপড় জলে ফেলে। বৃদ্ধারা জল হইতে উঠিয়া কাপড় খুঁজিয়া পায় না।

বৃদ্ধা ঘটি খুঁজিয়া পাইতেছে না—বসন্ত মুখ মুচকিয়া হাসিতেছে, দেখিয়া বর্ষিয়সী এক ধমকানি দিল। ধমকানি খাইয়া বসন্ত বুড়ির ঘটী গামছা বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধা তখন তীব্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ভাল্‌রে ভাল! আমার সঙ্গে তোমার এত বোটকেরা!

আসুক তোর ভাতার—তোর নাক কাণ কাটয়ে তবে ছাড়বো।

বসন্ত বুড়ির দিকে মুখ ভাঙাইয়া—"আহা হা! পোড়ার মুখ তোমার পুড়বে কবে" ? বলিয়া ঘাট হইতে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা ভিজা গামছায় গা মুছিতে মুছিতে কত কি ভাবিবার পর সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁলো! তোঁদের অবলা কেমন আছে? সুশীলা বিরক্তির সহিত উত্তর করিল—"তোদেরও বলি ও আবার কেমন কথা ? আমাদের কোন পুরুষের কে ?

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিয়াই আবার কি ভাবিতেছিল সব কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই তাই বলিল "অ্যাঁ! কি বল্লি ভাল শুনতে পাই নাই।"

সুশীলা খুব জোরে সেই সব কথা আবার বলিল। পুকুরের ঘাটের উপরে সেই সময়ে নলিনীর মা আসিয়াসিল। সুশীলা তা টের পায় নাই। নলিনীর মা, কথাটা শুনিবার পর আরো শুনিবার জন্য ঘাটের কাছে একটা বকুল গাছের আড়ালে দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা সুশীলার কথার উত্তর করিল "তাহা কি একটু যত্ন টত্ন করিস। মেয়েটী বড় ভাল। ওর লক্ষণ দেখলে ভাল বলেই তো বোধ হয়—তা ভগবান জানেন "বলিয়াই বৃদ্ধা আপন ভাবে নিমগ্ন হইল। বৃদ্ধা বরাবর আপনার বিদেশস্থ নাতিটীর বিষয় ভাবিতেছিল।

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া বলিল "আর থাম্ বুড়ি থাম্। ভাল ভাল করিসনি—আমার সঙ্গে সে ভাতারের

ভাগ বসাতে চায়। ছিনাল বেটী বাজারের খানকী দাসী করে এনেছি ভাতার তাড়িয়ে দিয়েছে ত্রিকুলে কেউ নাই খেতে পেতনা—সে আবার ভাল তার আবার সুখ্যাতি সুশীলা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে খুব জোরে কথা গুলা বলিবার পর মনে মনে ভাবিল "মাগি এবার গহনা বন্ধক রাখতে এলে হয়— ঝাঁটা মারবো।" নলিনীর মা তখন গম্ভীর ভাবে গলায় শাড়া দিয়া মুখখানা ভারি করিয়া ঘাটে দেখা দিল। সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিতে করিতে বর্ষিয়সীর দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিল "হাঁগা! খানকি আবার কে এলো ?

বর্ষিয়সী সুশীলার মন যোগাইবার জন্য বলিল, "তা খানকীকে খানকী বলতে আর দোষ কি ?

সুশীলা বর্ষিয়সীর উপর মনে মনে খুসী।

"তা লোকটা কে ? শুনতে পাই না," বলিয়াই নলিনীর মা কাঁক হইতে ঘড়া নামাইয়া ঘড়াটা ছাই দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাজিতে মাজিতে কথার উত্তর শুনিবার জন্য ব্যস্ত থাকিল। বর্ষিয়সী সুশীলার মুখের দিকে চাহিলে, সুশীলা চোখের ইসারায় ভুকথা ভাল করিয়া শুনাইতে বলিল। বর্ষিয়সী বলিল, "ওই সুশীলাদের বাড়িতে কে একছুঁড়ি এসেছে—সে খানকী তাকি জাননা ?"

নলিনীর মা আগেই রাগিয়াছিল এখন রাগিয়া উত্তর করিল, "মরিলো মরি ! পুরান গু হ'ল মাটী—পুরাণ খানকী হল সতী। কলিতে পয়সায় সব ঢাকা পড়েগো সব ঢাকা পড়ে। বলে—যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই। যার

স্বামী তার কেউ নয়। আর কোথা থেকে এক নূতন হুজুগে বেরয়ে গিয়ে বিয়ে না নিকে ক'রে হলেন সতী"।

সুশীলা কথায় সব বুঝিল। মরমে পুড়িতে পুড়িতে জল হইতে উঠিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

যোগেন্দ্রর যত্নে চিকিৎসার গুণে অবলা আরোগ্যলাভ করিল।

অবলার প্রতি যোগেন্দ্রর একটু স্নেহ জন্মিয়াছে। অবলার খাওয়া দাওয়া ভাল হয় কি না যোগেন্দ্র সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। অবলা খাওয়া দাওয়ার গুণে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় গমন করিল। যাইবার সময় সুশী-লাকে ডাকিয়া বলিল, 'ব্যাচারীকে যত্ন ক'র—আমার মাথার দিব্য।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় যাইলে সুশীলা দাসীকে ছাড়াইয়া দিল। ঘরে আপনি ও অবলা থাকিল।

অবলাকে ডাকিয়া বলিল, 'এখন তো তুই আরাম হয়েছিস্; বেশ গতর হয়েছে; আজ থেকে বাড়ির সব কাজ

তোকে ক'র্‌তে হবে। কাজ তো বেয়াদা নয়। নিজেদের খাওয়া দাওয়ার জন্য রাঁধা; বাসান গুলো মাজা; ঘর গুলো ঝাঁট দেওয়া; গোল পরিষ্কার করা; গোবর দেওয়া; আর তিন দিন অন্তর হাটে যাওয়া।

অবলা তাহাতেই স্বীকার পাইল। সে বাড়ীতে অবলা স্বামীকে দেখিবার জন্য হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর সমুদয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে।

সেই দিন হইতে অবলা সুশীলার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

সুশীলা বলিল, 'গরুর জাব কাট্‌গে,' অবলা কখনও গরুর জাব কাটে নাই। খড় লইয়া কাটিতে চলিল। অনেক কষ্টে কার্য্য শেষ করিল। অবলা হাটের কাজ, গোয়ালের কাজ, সকল কাজই করিতে লাগিল।

অবলা নিম্ন তলে যে ঘরটীতে শয়ন করিত, সুশীলা সে ঘরটীতে ভাঁড়ার ঘর করিবে বলিয়া কাড়িয়া লইল। বলিল, 'গোল ঘরের এক পাশে একখানা চৌকী পাতিয়া দেব, একটী মাদুর ও বালিশ দেব, তাতে শুলেই চল্‌বে। আর, ও গোল তত মন্দ নয়।'

অবলা সেই দিন হইতে গোল ঘরেই শয়ন করিতে লাগিল। মশারী নাই। গোয়ালের মশায় অবলাকে রাত্রে ছাঁকিয়া ধরে, গোবর ও গোমূত্রের গন্ধে অবলা টিকিতে পারে না। অবলা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাড়ির রোয়াকে আসিয়া শয়ন করে।

যোগেন্দ্রের কলিকাতা হইতে আসিতে এবারে বিলম্ব হইতেছে। অবলা সমস্ত দিন স্বামী চিন্তায় মগ্ন থাকে। আবার

কবে স্বামী আসিবে,—আবার কবে স্বামীকে দেখিবে, এই চিন্তায় অবলার প্রাণ মগ্ন।

অবলা স্নানের পর প্রত্যহ স্বামীর ধ্যান করিয়া থাকে। চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ে স্বামীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কখন অশ্রুপাত করে, কখন আনন্দে উৎফুল্লা হয়। স্বামী ধ্যান না করিয়া অবলা জল স্পর্শ করে না।

যে সময়ে পীড়া হইয়াছিল, অবলা স্বামীর ধ্যানে ডুবিয়া যন্ত্রণার হাত এড়াইত; স্বামীর রূপে আপনার অস্তিত্বকে অবলা বিসর্জ্জন করিত।

স্বামীর নাম শুনিলে অবলার চক্ষু দিয়া জল পড়ে,—শরীর কণ্টকিত হয়,—পৃথিবীর জলে স্থলে স্বর্গের আবির্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে।

ঈশা, মুশা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নানক, চৈতন্য আপনাদের হৃদয়ে—আপনাদের অস্তিত্বে ঈশ্বর দর্শন করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরে ডুবিতেন, অবলা যোগেন্দ্রকে দেখিলে সেইরূপ সুখে, সেইরূপ আনন্দে উন্মাদিনী হয়।

অবলার প্রেম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থির, গম্ভীর—লজ্জাবরণে আবৃত—সরমের কোয়াসার ঢাকা।

স্বামী ভাল বাসিবে কিনা অবলা তাহা একবারও ভাবিত না। স্বামীকে দেখিতে—স্বামীকে সুখে রাখিতে—স্বামীর পদসেবা করিতে—স্বামীর জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারিলেই অবলার প্রেম তৃপ্ত। অবলা স্বামীর জন্য কিনা করিতে পারে? বজ্র বুকে ধরিতে—সাপ, বাঘ, ভালুকের মুখে যাইতে—আগুনের নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে—সহস্র মৃত্যুর

বিষমস্ত আপনার বক্ষে, মস্তকে ফুটাইতে—গলিত কুষ্ঠ রোগ বহিতে—এবং সমুদয় লোকের নিন্দা, ঘৃণা, প্রহার, ভ্রূকুটী, অকাতরে সহ্য করিতে পারে।

সুশীলা যে কষ্ট দিতেছে, অবলার প্রেম সে সবকে আদতে কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেছে না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যত যন্ত্রণা—যত জ্বালা—যত ভয় আছে, সমুদয়কে অবলা হাসিতে হাসিতে যোগেন্দ্রের জন্য সহ্য করিতে পারে।

কার্য্যগতিকে পড়িয়া যোগেন্দ্রের কলিকাতায় বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সুশীলার চরিত্রে কলঙ্ক পড়িতেছে। সেই ডাক্তার প্রতিরাত্রে সুশীলার ঘরে আসিতেছে। অবলা কিছুই জানে না।

যোগেন্দ্রের প্রতি সুশীলার যে একটু স্নেহ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। আর যদি যোগেন্দ্র না আসে তো সুশীলার পক্ষে ভাল হয়!

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যোগেন্দ্র হঠাৎ বাটীতে আসিল। আসিয়াই দেখিল, অবলা গোরুর জাব কাটিতেছে। যোগেন্দ্র দেখিয়াই চমকিত হইয়া সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝি কোথা?' সুশীলা বলিল, 'সে এখন হবে—পা হাত ধুয়ে ভাত খাও।'

জাব কাটিতে কাটিতে স্বামীকে দেখিয়া অবলার যে কি আনন্দ, কি সুখ, তার আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

যোগেন্দ্র সুশীলার উপর অত্যন্ত কুপিত হইল। আহারাদির পর উপর তলে গিয়া বিছানায় শয়ন করিয়া সুশীলাকে বলিল, 'ওঁকে ও রকমে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে'?

সুশীলা বলিল, 'ও নিজে ওসব কাজ ক'র্‌ছে। ওই ব'লে ক'য়ে ঝীকে জবাব দিয়েছে। আমি জবাব দিতে চাই নাই। ও বলে ঝির দরকার কি; আমি সব ক'র্‌বো'। যোগেন্দ্র আর কিছু বলিল না। চুপ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল। বাটীর পশ্চাতে বৃহৎ ফুল বাগান। বাগা-নের মধ্যে মধ্যে বেঞ্চ পাতা আছে। বেঞ্চের পার্শ্বে মাঝে মাঝে ফুলগাছের এমন ঝোপ আছে যে, তাহাতে মানুষ বসিয়া থাকিলে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু ঝোপের ভিতর হইতে সব দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক গ্রীষ্ম হইলে যোগেন্দ্র ফুল বাগানে বেঞ্চে শুইয়া বায়ু সেবন করে।

যোগেন্দ্র যেদিন কলিকাতা হইতে আসিল, সেই দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় অবলা বাহিরে একখানি ছিন্ন মলিন শতছিদ্র বস্ত্র পরিয়া গোবরের কাজ করিতেছে; এমন সময়ে একজন শ্মশ্রুধারী—জটাজুট বিভূষিত সন্ন্যাসী সেই বাটীতে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া চমকিতভাবে অবলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক হঠাৎ কণ্টকিত হইল। হৃদয়ের ভিতরে এক মহা ভাবের ঝড় উঠিল। সন্ন্যাসী ভাবিতেছে, অবলার মত যে দেখিতেছি—৮।১০ বৎসরে যে প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভব, তাহাই দেখিতেছি। অবলা তো পুড়িয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল, 'এ নিশ্চয়ই অবলা।' সন্ন্যাসীর শরীর কণ্টকিত হইল।

কাজ করিতে করিতে অবলা অন্য মনা ছিল। হঠাৎ সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। অবলা দেখিয়াই ভাবিল, 'রামদাদা নাকি ? ঠিক্ সেই প্রকার যে ! রামের নাকের উপরে একটী তিল, বাম হাতে ছয়টী আঙুল ছিল। অবলা সে সব দেখিয়াই চিনিল। অবলা কাজ করিতে করিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। তাকাইতে তাকাইতে অবলার দু চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিল, রামচন্দ্র তাহা দেখিয়াই বুঝিল, এ নিশ্চয়ই আমার ভগিনী 'অবলা'। অমনি কাতর ভাবে যেন অজ্ঞাতে বলিল 'অবলা—অবলা নাকি' ? বলিয়াই রাম কাঁদিয়া ফেলিল। অবলা সরিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় হেঁট্ করিয়া বলিল 'দাদা ! দাদা তুমি।' অবলা আর কথা কহিতে পারে না, রামও কথা কহিতে পারে না।

রাম আপনার শোকের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল 'দিদি—তোমার আজ এমন দশা' !

অবলা তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া দাদাকে বসিবার মাদুর পাতিয়া দিল। রাম, অবলার সে মলিন বেশ—সেই নিকৃষ্ট কার্য্যের বিষয় ভাবিয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ভাবিল, "অবলাকে আবার দেখিতে পাইলাম, আহা! ভগবান আমায় যে অবলাকে আবার দেখাইবেন, তাহা এক দিনও ভাবি নাই" তখন রামের একটু আনন্দ, একটু সুখ সম্ভোগ হইতে লাগিল। অবলা হাত পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী হাত পা ধুইয়া বসিয়া আছে, অবলা দূরে দাঁড়াইয়া ২।১টী কথা কহিতেছে; এমন সময়ে যোগেন্দ্রর শাড়া পওয়া গেল। অবলা সরিয়া গিয়া আবার গোবরের কাজ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর সহিত যোগেন্দ্র ২।১টী কথা কহিয়াই বুঝিল, সন্ন্যাসীটী বিদ্বান লোক—বহুদর্শী। যোগেন্দ্র সন্ন্যাসীর খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল।

রাত্রি হইল। সন্ন্যাসী খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়ন করিল। সন্ন্যাসী যোগেন্দ্রকে আগে চিনিত। যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রাম বেস বুঝিল এই অবলার স্বামী। আরও বুঝিল, অবলাকে যোগেন্দ্র চিনিতে পারে নাই। ভাবিল, যাহা হউক পরিচয় দিয়া অবলার সহিত মিলন করিয়া দিতে হইবে। কাল সকালে সর্ব্বাগ্রে এই কাজটী করিব। ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র নিদ্রিত হইল।

যোগেন্দ্র সুশীলার কাছে শয়ন করিল। অবলা সেই গোয়াল ঘরটীতে নিদ্রিতা হইল। এ দিকে সুশীলা উপপতির পরামর্শে স্বামীকে কাটিবার চেষ্টায় আছে।

হঠাৎ ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতে লাগিল। যোগেন্দ্র সুশীলাকে বলিল, তুমি থাক আমি ফুলবাগানে যাই।

যোগেন্দ্র আস্তে আস্তে ফুলবাগানে গিয়া একখানি বেঞ্চে শয়ন করিল। এক ঘণ্টা পরে সুশীলা উঠিয়া ফুলবাগানে গেল। গিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র অকাতরে ঘুমাইতেছে, সুশীলা আনন্দিতা হইয়া মনে মনে ভাবিল. এইবার বেস সুবিধা, এই সময়ে কাজ সাবাড় করি।

ঘরে আসিয়া তরবারি বাহির করিল। রাক্ষসী তরবারি লইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। ঘর গুলা যেন কাঁদিয়া বলিল, 'সুশীলা! অমন কাজ করিও না।' সুশীলা এক পা এক পা করিয়া তরবারি হস্তে স্বামীর মাথা কাটিতে চলিল। আকাশের নক্ষত্র সকল বলিল, 'সুশীলা! অমন কাজ করিও না'।

সুশীলার আপন আত্মা বলিতেছে, 'সুশীলা, স্বামীকে কাটিওনা'।

সুশীলা ভাবিতেছে, কাটিয়া সেই রক্ত আনিয়া অবলার মুখে হাতে কাপড়ে মাখাইয়া দিব; তারপর সকালে সকলে অবলাকেই ধরিবে। এই ভাবিয়া সুশীলা নিম্নতলে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

এদিকে হতভাগিনী অবলা হঠাৎ স্বপ্ন দেখিল, 'স্বামী ফুল বাগানে শুইয়া আছে, কে যেন স্বামীকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। অবলা স্বপ্ন দেখিয়াই উন্মাদিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্রুত-বেগে কাতর প্রাণে যেন দৈব শক্তিতে পরিচালিত হইয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, স্বামী বেঞ্চে ঘুমাইতেছে। অবলা একটা ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়াইয়া স্বামীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। অবলার হৃদয়ের গভীরতম স্থলে

যেন কে বলিল, 'অবলা! তোমার স্বামীকে আজ রক্ষা কর, এখান হ'তে কোথাও যেও না'।

জ্যোৎস্নার ভিতর হইতে—ফুল গাছ হইতে—আকাশ হইতে কে যেন বলিল, 'অবলা! তোমার যোগেন্দ্রের আজ বড় বিপদ, যোগেন্দ্রকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর'।

হঠাৎ অবলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবলার ডান চক্ষু নাচিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিল।

অবলার বোধ হইতেছে, যেন আকাশের চন্দ্র তারা সব নিবিয়া পৃথিবী ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, অবলা সেই অন্ধকারে যোগেন্দ্রকে হারাইবে। অবলার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে সমুদয় শরীর থর থর কাঁপিতেছে। ভয়ে মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছেনা। এমন সময়ে কে একজনা উর্দ্ধে তরবারি তুলিয়া রাক্ষসীর বেশে যোঁগেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তরবারি যেই যোগেন্দ্রের গলার উপরে পতনোন্মুখ অমনি অবলা বিদ্যুৎবেগে ঊর্দ্ধহস্তে তরবারির নিম্নদেশে আপনার বক্ষদেশ পাতিয়া দিবার জন্য পাগলিনীর মত তরবারির নিম্নে যোগেন্দ্রের ঘাড়ের উপরে পতিতা হইল। তরবারি সতীর দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া যোগেন্দ্রের স্কন্ধ দেশে পড়িল। অবলা "বাবা গো সর্ব্বনাশ হ'ল গো"! বলিয়া চীৎকার করিল। যোগেন্দ্রও 'বাপরে' বলিয়া চিৎকার করিয়া জাগ্রত হইল। সুশীলা তখন সেইখানে তরবারি ফেলিয়া দ্রুতবেগে পাগলিনীবৎ পলায়ন করিল।

রামচন্দ্র উহাদের চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। সুশীলা রামচন্দ্রের সম্মুখে পড়িল। সুশীলার সে ভাব লক্ষ-

মুক্তি বস্ত্র দেখিয়াই ধরিয়া ফেলিল।

এদিকে যোগেন্দ্র দেখিল, অবলার দক্ষিণ হস্তের ৩টী আঙুলের অগ্রভাগ একবারে গিয়াছে। অবলার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, আপনার হাত দিয়া ভয়ানক রক্ত ঝরিতেছে, সে দিকে লক্ষ না রাখিয়া আপনার অাঁচল চিরিয়া যোগেন্দ্রর গলায় জড়াইয়া দিতেছে।

এদিকে রামচন্দ্র সুশীলাকে বাঁধিয়া হড় হড় করিয়া প্রবল বেগে বাগানে টানিয়া আনিতেছে। যোগেন্দ্র তাহা দেখিল, একদিন যাহা ফুলের মালা ভাবিয়া গলায় পরিয়া ছিল—আজ তাহাকে ভীষণ ভুজঙ্গিনী মূর্ত্তিতে অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিল কালসাপ বুকে ধরে ছিলাম!

রামচন্দ্র সুশীলাকে একটী গাছে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া আপনার ঝুলি হইতে কিসের গুঁড়া আনিয়া যোগেন্দ্রর স্কন্ধে ও অবলার হাতে দিল। রক্ত বন্ধ হইল। দুজনের রক্ত বন্ধ হইলে রামচন্দ্র সেই উদ্যানে যোগেন্দ্রকে বলিল, "প্রাণ তো গিয়াছিল"?

যো। কাল সাপিনীকে ল'য়ে ঘর করছিলাম। "আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট নহিলে আমার প্রথম স্ত্রী যাবে কেন"? বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামচন্দ্র চমকিত হইল—অবলার দিকে চাহিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল:—

যোগেন্দ্র বাবু! আপনার প্রথম স্ত্রী যায় নাই—ওই তোমার প্রথম স্ত্রী হতভাগিনী অবলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া।—যে আপনার উপর পতনোন্মুখ তরবারির তলে গলা পাতিয়া দিয়া আপনার

প্রাণ বাঁচাইয়াছে, সে আপনার সেই প্রথম স্ত্রী হতভাগিনী চিরদুখিনী অবলা।—ঐ আপনার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হায়! হায়! এখনও কি আপনি চিনিতে পারেন নাই?

যোগেন্দ্র শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিপ্লবে অধীর হইয়া, 'অ্যাঁ অ্যাঁ—অবলা আমার, অবলা আমার, অবলা—অবলা' এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল।

দুঃখিনী অবলাও সে অবস্থায় হঠাৎ প্রেমোচ্ছ্বাসে উন্মাদিনীর মত মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

রামের যত্নে উহাদের সংজ্ঞা হইল। যোগেন্দ্র, অবলা দুজনেই নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ—দুই হৃদয় যেন প্রেমের ভারে স্থির হইয়া গেল। যোগেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। অবলা আর উঠিতে পারে না—অবলা আপনাকে বিস্মৃতা—আপনি যে কোথায়, তা জানে না—কি ব্যাপার বুঝিতেছে না—হৃদয় প্রাণ যেন স্বর্গের অনন্ত প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

যোগেন্দ্র পাগলের মত অবলার দিকে চাহিয়া আছে;—চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। যোগেন্দ্রের বড় ঘৃণা, বড় লজ্জা। যোগেন্দ্র ভাবিতেছে "আমি কি নিষ্ঠুর—অমন স্ত্রীর খোঁজ খবর লই নাই"! উঃ প্রাণ যে ফেটে যায়! এই সকল চিন্তা যোগেন্দ্রের হৃদয়ে সূচ ফুটাইতেছিল। যোগেন্দ্র আপনার পাপ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইল।

রামের যত্নে যোগেন্দ্রর সংজ্ঞা লাভ হইল যোগেন্দ্র বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে! ভাবিতে ভাবিতে

বিড় বিড় করিয়া বলিল 'প্রিয়ে প্রিয়তমে! আমার বাঁচাবার জন্যই বুঝি এতদিন তুমি এত কষ্টে বেঁচে ছিলে?'

অবলা আহ্লাদে বদ্ধকণ্ঠা হইয়া, এক পা এক পা করিয়া যোগেন্দ্রের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যোগেন্দ্রর দুটী পা জড়াইয়া ধরিল।

যোগেন্দ্রের মন প্রাণ জড় জগতের জড়তার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, হঠাৎ কোমল কর ও উষ্ণ নয়নাশ্রু স্পর্শে চমকিত হইয়া সেই সতীর দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র হৃদয়ে যেন সান্ত্বনা—আদর—স্নেহ—আশা—ভরসা—মান—অভিমান—গৃহ—ভগিনী, বন্ধু, জননী—স্ত্রী—এই সকলের জীবনতোষিণী ছায়া আসিয়া যোগেন্দ্রের হৃদয় প্রাণে পতিত হইল। সে ছায়ার তলে বসিয়া যোগেন্দ্র উত্তপ্ত জীবনের শ্রান্তি দূর করিল। রাম স্থানান্তরে যাইল।

যোগেন্দ্রর দক্ষিণ হস্ত আপনি সেই স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। অবলার জীবনের সাধ কতকটা মিটিল। সেই কর-স্পর্শে অবলা উঠিয়া বসিল;—এক দৃষ্টে যোগেন্দ্রর মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাঁপিতে কাঁপিতে যোগেন্দ্রর বক্ষদেশে আপনার মস্তক পাতিত করিল। যোগেন্দ্র আপনার কর্কশ বক্ষে সেই মস্তক ধরিয়া সুখের চরমসীমায় উঠিতে লাগিল।

বায়ুভরে কাঁপিতে কাঁপিতে যেমন একটী শতদল আর একটীর উপরে পতিত হয়, যোগেন্দ্রর মুখখানিও প্রেমভরে কাঁপিতে কাঁপিতে অবলার চন্দ্রবদনে সেইরূপে পতিত হইল। যোগেন্দ্র হৃদয় প্রাণের সমুদয় বেগের সহিত অবলার মুখ-

চুম্বন করিল। সেই মধুর চুম্বনে যেন অবলার অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বের ভিতরে প্রবেশ করিল।—সে মুখ চুম্বনের ভিতর দিয়া যেন স্বর্গের—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় স্নেহ, ভালবাসা, শান্তি প্রবাহিত হইয়া অবলার লোমে লোমে অমৃত সিঞ্চন করিল,—অবলার প্রেমসাগরে মহা তুফান তুলিয়া দিল।

বক্ষে মাথা রাখিয়া অবলা মাঝে মাঝে স্বামীর বক্ষে প্রবল বেগে উষ্ণ অশ্রুমোচন করিতেছে; যেন আকস্মিক বায়ুভরে শতদল হইতে সরোবরবক্ষে শিশিরবিন্দু পতিত হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা, যোগেন্দ্র ও রাম বাটীর ভিতরে গমন করিল। অবলার লজ্জা হইয়াছে। মাথায় কাপড় দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। রাম নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। যোগেন্দ্র অবলাকে সাদরে সস্নেহে সাশ্রুনয়নে বক্ষের পার্শ্বে ধরিয়া পাগলের মত পা ফেলিতে ফেলিতে দ্বিতলস্থ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। অবলা সেই স্থলপদ্ম বিনিন্দিত পা দুখানি কক্ষের ভিতরে নিক্ষেপ করিবামাত্র, যোগেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে 'প্রিয়ে অপরাধ মার্জ্জনা কর' বলিয়া অবলার পা জড়াইয়া ধরিল। অবলা সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে 'নাথ, আমায় নরকে ডুবালে' বলিয়া দুই চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া যোগেন্দ্রের পৃষ্ঠোপরি পড়িয়া গেল।

অবলার পা ধরিয়া অবলাকে কষ্ট দিলাম—মূর্চ্ছিতা করিলাম ভাবিয়া যোগেন্দ্র যন্ত্রণায় আরও অধীর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবলা চক্ষু চাহিল, চাহিয়াই মুদিল, ভাবিল আমি মহা পাপিয়সী, নহিলে স্বামী আমার পদস্পর্শ করিবেন কেন? অবলা আর চক্ষু চাহিয়া স্বামীকে দেখিতে সাহস করে না। বালা

আপনার পাপ ভয়ে কুন্ঠিতা হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিল।
পৌত্তলিকের বিগ্রহ হঠাৎ পদতলে পড়িলে ভক্ত পৌত্তলিকের
মানসিক অবস্থা যেপ্রকার হয়, অবলার অবস্থাও সেইরূপ হইল।

যোগেন্দ্র বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি আর
অমন ক'রে থেক না, আমার সঙ্গে দুটো কথা কও! তোমার
কি অপরাধ থাকিতে পারে? তুমি সতী সাবিত্রী, আমি
বেশ বুঝেছি অনেক তপস্যা না করিলে তোমার মত স্ত্রী
পাওয়া যায় না। বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে আবার জড়িতস্বরে বলিল 'আমি বানর,
আমার গলায় ভগবান এ মুক্তার মালা কেন দিলেন তা
জানি না—আমি পাষাণ, আমার উপরে এ পুষ্পলতিকা কেন'।
প্রিয়ে, প্রিয়ে,! কথা কবে না?

অবলা আর থাকিতে পারিল না—আপনার ভয় সঙ্কোচ
দূরে ফেলিয়া উত্থিত হইল। যোগেন্দ্র অবলাকে বক্ষে রাখিয়া
মুখ চুম্বন করিল। পৃথিবীতে 'স্বর্গ-সুখ অপেক্ষা অধিক
সুখ যাহা, যোগেন্দ্র তাহাই সম্ভোগ করিল। সতী স্ত্রীর মুখ
চুম্বন অপেক্ষা সুখের সামগ্রী স্বর্গে—নাই—মর্ত্তে নাই—পাতালে
নাই—ঈশ্বরের ভাণ্ডারে নাই'। কিন্তু অবলা—সতীর সেই
চুম্বিত বদনে যে লজ্জার মাধুরী ক্রীড়া করিতেছে—সেই
কুসুমসম লোচনে যে সৌন্দর্য্যের কিরণ ফুটিতেছে, তাহাদের
ভিতরে অবলার অস্তিত্বে যে কি ভাব, কি উচ্ছ্বাস উঠিতেছে,
তাহা সাবিত্রী সত্যবানকে পনর্জ্জীবিত করিয়া, সীতা রামকে
লঙ্কা সমরের পর লাভ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। মনে
হয়, অবলার ঐ সুখ পৃথিবীর সমুদয় সুখের কেন্দ্র।

অবলার কোমল অঙ্গখানির পদদেশ ভূমিতলে এবং কোটী-দেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ যোগেন্দ্রর ক্রোড় ও বক্ষদেশ অধিকার করিয়া আছে। দুইজনেই প্রেমের নেশায় উন্মত্ত। চুম্বনে, ক্রন্দনে, আলিঙ্গনে দুইজনের জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত। যোগেন্দ্র আবার স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিল 'অবলা! কি করিব? তুমি কি চাও, তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, এখন তোমার জন্য কি করিব? অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'সুশীলার দশা কি হবে'? যোগেন্দ্র বলিল, 'পাপীষ্ঠার নাম করিও না—পাপিষ্ঠার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।'

এই হতভাগিনী হইতেই ওর সুখের পথে কাঁটা পড়িল বলিয়া অবলা কাঁদ কাঁদ হইল।

যো। কাঁদ কেন? অনেক কেঁদেছ, আর কাঁদ কেন?

অ। সুশীলার জন্য আমার প্রাণ কেমন করে—সুশীলা যে আমার ছোট ভগিনী।

যো। তোমায় অত ক্লেশ দিয়াছে, আমায় শেষে কাটিতে গিয়াছিল, তবুও তুমি ওকে স্নেহ কর?

অ। ও আমায় একদিনও তো কষ্ট দেয় নাই বরং বাড়ি হইতে না তাড়াইয়া দিয়া আমার উপকারই করিয়াছে। আর তোমায় কাটিতে কখনই পারিত না, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমায় কাটে কার সাধ্য? বলিতে বলিতে সতীর রক্তপ্রবাহ প্রবলতর হইল, দুই চক্ষু সজল হইল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। মরুভূমির মধ্যে কোকিল ডাকিলে কিম্বা প্রস্রবণের কল কল ধ্বনি শুনিলে কবির হৃদয় যেরূপ কাব্যামৃতে

ডুবিয়া, ভয় ভাবনা, সংসার বাসনা প্রভৃতির নিকট হইতে দূরে গিয়া, পুষ্পের লাবণ্যের ভিতরে জ্যোৎস্নার মধুরতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, যোগেন্দ্রও আপনার জীবন-মরুভূমিতে সতীর ঐ সমুদয় মধুময়ী কথা শুনিতে শুনিতে পুষ্পের সুরভির স্থায় আপনার অস্তিত্বাকাশে আপনি পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। যোগেন্দ্রের নিকটে তখন এই জগতের প্রত্যেক পরমাণু অমৃতের কথা, প্রত্যেক শব্দ কোকিলের ঝঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে সময়ে যদি ভীষণ হিংস্র জন্তু আসিয়া ভীষণনাদে গর্জ্জন করে, তবে যোগেন্দ্র তাহাকে সঙ্গীতের রাগ রাগিণী বলিয়া বিবেচনা করে।

যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে অবলার মুখে আপনার মুখ রাখিয়া বলিল, 'প্রাণেশ্বরী! কি চাও, কি দেব? আমার কি আছে যাহা দিয়া আমার মনের সাধ মিটাই?' অবলা বলিল, 'সুশীলার অপরাধ যদি মার্জ্জনা কর, যদি ওকে বাগান হইতে আনিয়া আমার কাছে দাও।'

যোগেন্দ্র বলিল, "এখনি আনিয়া দেব" এই বলিয়া অবলাকে সেইখানে রাখিয়া যোগেন্দ্র নীচে গমন করিল। রামকে বলিল, সুশীলা কোথায়? রাম বলিল, বাগানে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। দুই জনে বাগানে গিয়া দেখিল হতভাগিনী প্রস্তরের স্থায় গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুশীলা পাপ যন্ত্রণায় অধীরা। যদি কেহ কাটিয়া ফেলে বা আগুনে পুড়াইয়া বা জলে ডুবাইয়া মারে তো পাপিয়সী বাঁচে।

যোগেন্দ্র কাছে গিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রামকে

বলিল, 'আপনি ওর বাঁধন খুলিয়া দিন, আমার ওকে স্পর্শ করিতে ভয় হয়'।

রাম। ওকে লইয়া কি করিবেন?

যো। আমার প্রয়োজন নাই, অবলার কি প্রয়োজন আছে। রাম হতভাগিনীর বাঁধন খুলিয়া দিল। আহা, কে যেন মুখে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, দুই চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিতেছে। যোগেন্দ্র বলিল, 'বাড়ির ভিতরে এস।' সুশীলা আস্তে আস্তে বাটীর ভিতরে যোগেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুশীলা ভাবিতেছে, এই বারে আমায় কাটিয়া ফেলিবে, আমি বাঁচি, আর এ জীবনে প্রয়োজন নাই।

হতভাগিনী ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় হেঁট্ করিয়া কাঁদিতেছে, অবলা সুশীলার সে অবস্থা দর্শনে আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। যোগেন্দ্র ঘরের ভিতরে গিয়া বিছানায় শয়ন করিল। অবলা সপত্নীর কাছে আসিয়া গলায় হাত দিয়া বলিল, 'কেন দিদি! অমন ক'রে র'য়েছ, যা হবার হয়েছে, স্বামীর পায়ে ধ'রে আমরা ক্ষমা চাইগে; চল তিনি ক্ষমা করিবেন এখন। আর অমন ক'র না। ভগিনী! আমরা দুজনে স্বামী সেবা করি এস; স্বামীর সুখ দ্বিগুণ হইবে। আমি একলা স্বামীকে সুখী করিতে কি পারিব? তুমিও সুখী করিবে, আমিও করিব। স্বামী আমায় যাহা দিবেন, আমি তাহা তোমায় দেব। আমা হ'তে তোমার সুখের পথে কাঁটা পড়িবে না। সুশীলা কিছুই বলিল না, কেবল ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। সুশীলার অস্তিত্ব যেন বিষের আগুণ, মৃত্যু আসিলেই

দুর্ভাগিনী পাপ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পায়।

অবলা আবার বলিল, 'কি ভাবিতেছ আমায় বল'।

সুশীলা সকাতরে বলিল 'আমায় যদি ছাড়িয়া দেও তো বড় ভাল হয়'।

অবলা। এমন স্বামীকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে?

সু। যেখানে মা বাপ আছেন, সেখানে যাইব। আত্মহত্যা করিব।

অ। তাহাতে লাভ কি?

সু। পাপের এ জ্বালা হইতে মুক্ত হইব।

অ। পাপের জ্বালা সেখানে সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

শুনিয়া সুশীলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর হইতে যোগেন্দ্র বলিল, 'ও রাক্ষসীর সঙ্গে আর কেন? ওর যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, তুমি আমার কাছে এস।'

অবলা স্বামীর কথাকে ঈশ্বরাদেশের ন্যায় মান্য ক'রে আর থাকিতে পারিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। স্বামী জিজ্ঞাসিল 'অবলা! ওর জন্য তুমি অমন ক'রছ কেন? ও যে দুশ্চরিত্রা, ও যে বাঘিনী, ও যে আবার কবে সর্ব্বনাশ করিবে, ওকে দূর করিয়া দাও'।

সুশীলার মূর্চ্ছা আপনিই ভাঙ্গিল উঠিয়া দেখিল কাছে কেহ নাই যোগেন্দ্র ঘরের ভিতরে গালাগালি দিতেছে। হতভাগিনী আস্তে আস্তে নিম্নে গমন করিল। গোলঘরে খড় পাতিয়া তাহারই উপর শয়ন করিল। রামচন্দ্র দেখিল, দেখিয়া উপরে

আসিয়া ডাকিল, 'যোগেন্দ্র বাবু'। যোগেন্দ্র বলিল, 'এখানে আসুন।

রা। আপনার ও স্ত্রীর বিষয় কি করিবেন।

যো। আপনার ভগিনী যাহা বলে, তাহা করুন আমি কিছু জানি না।

অবলা রামকে বারাণ্ডায় ডাকিয়া বলিল, 'দাদা আপনাদের পায়ে ধরি, ওর আপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রা। তোমার যাহা ভাল লাগে কর আমি বাহিরে যাই।

অ। আপনি বাহিরে যান। রাম বাহিরে গিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শয়ন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, যোগেন্দ্র বসিয়া অবলাকে দেখিতেছে। অবলা যোগেন্দ্রর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সোহাগের কথা দুই একটী চলিতেছে বটে, কিন্তু সুশীলার জন্ত অবলার প্রাণটা মধ্যে মধ্যে সিহরিয়া উঠিতেছে। যোগেন্দ্র বুঝিতে পারিয়া বলিল,

'অবলা! সুশীলা তো রাক্ষসী, কালসাপিনী ওকে তুমি ভাল বাস কেন? আমি হয় তো বাঁচিতাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মরিতে। এসব সত্ত্বেও তুমি ওকে কি প্রকারে যে ভালবাস তা বুঝিতে পারি না। ও কি কখন তোমার কিছু উপকার করিয়াছে? বরং তোমার ক্ষতিই করিয়াছে—শেষে তোমার এবং তোমার স্বামীর প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল'।

অবলা বলিল, 'আমার ও বিশেষ উপকার করিয়াছে, কিন্তু আপনার কাছে সে সব বলিলে আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশ হয়, যদি আদেশ করেন তো বলি'।

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল 'তোমার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবে, তাহাতে আবার আদেশের প্রয়োজন কি? তুমি আমার জীবন'।

অবলা বলিল, 'আমি তোমা হইতে যখন দূরে ছিলাম, তখন সুশীলা তোমার কত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, তোমাকে বাতাস করিয়াছে, তোমার পা টিপিয়াছে, তোমায় রাঁধিয়া দিয়াছে, তোমার বিশ্রামের জন্য বক্ষ পাতিয়া দিয়াছে। সুশীলা যে ভাবেই তোমায় দেখুক, সে যখন আমার ঐ সব করণীয় কর্ম্ম করিয়াছে, তখন আমি যে সুশীলার কাছে সুদৃঢ় কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ;—আমি সুশীলার সে ঋণ কি প্রকারে শুধিব? এই শুধিবার সুযোগ পাইয়াছি, এ বিপদে যদি তোমার কৃপায় ওকে রক্ষা করিতে পারি; ওর ব্যথিত প্রাণে যদি সুখ সঞ্চয় করিতে পারি, ওর পীড়িত মনকে যদি একটু সুস্থ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি সে দুষ্পরিশোধ্য ঋণ হইতে কিয়ৎপারি-

মাগে মুক্ত হই। তুমি স্বামী—গুরু—ঈশ্বর তুমি না দয়া করিলে আমি কি প্রকারে মুক্ত হইব?—আমার নিজের ক্ষমতা কিছুই নাই—তুমিই যে আমার বল বুদ্ধি, প্রাণনাথ! আমার যদি কিছু উপকার করিবার থাকে তো সুশীলার অপরাধ মার্জ্জনা কর। সুশীলাকে আমাদের কাছে আন—সুশীলাকে আবার পূর্ব্বের মত ভালবাস, সুশীলা যেমন ছিল, তেমনি থাক—আমি যেমন ছিলাম, তেমনি থাকি। সুশীলা আর দুষ্কর্ম্ম করিবে না—যদি করে তো তার শাস্তি আমি ভোগ করিব। আমি যে তোমাকে বাঁচাইয়াছি—ইহা অপেক্ষা আমার সুখ হইবে না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকি, আর সুশীলা যেমন ছিল তেমনি থাক। আমি পূর্ব্বের মত গোয়ালঘরে শুইগে—সুশীলা পূর্ব্বের মত এই ঘরে তোমার কাছে শুগ। গোয়ালঘরে আমি ইহা অপেক্ষা কম সুখে থাকি নাই। তোমাকে যে দিন দেখিয়াছি—সে দিন হইতে আমার সুখের জমাট—সে জমাট সমান ভাবেই আছে—বরং দিন দিন শক্ত হইতেছে—সে আর নরম হইবার নহে। আমি তোমার কাছে এ ভাবে থাকিলে সুশীলার ক্লেশ হইবে—তোমার সুখ দেখিয়া যদি কাহারও ক্লেশ হয়, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না—তোমার সুখে অপরকে যদি সুখী দেখিতে পাই, তবে বুঝিব তোমার নিষ্কলঙ্ক সুখ'।

যোগেন্দ্র শুনিতে শুনিতে ভাবিল, 'এ পাপিষ্ঠের কপালে ঈশ্বর এমন স্ত্রী লিখিয়াছিলেন—অবলার আমি অনুপযুক্ত স্বামী—অবলাকে যে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়—ও মূর্ত্তির ভিতরে যে স্বর্গের কোন্ দেবী আছেন, তাহা বলিতে পারি

না। আমার কাণে ওসব কথা আঘাত করিয়া কলঙ্কিত হইতেছে।

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে অবলার বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার জন্য তো অনেক কষ্ট পেয়েছ আর কেন? এখন আমায় লইয়া সুখী হও'।

অবলা একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিল, 'তোমাকে আমি স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, এ হতভাগিণী তোমার জন্য এক দিনও কষ্ট অনুভব করে নাই—যদি কিছু কষ্ট পাইয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা সুখ যে কি আছে, তা তোমার অবলা জানে না।' নাথ!—অবলা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল যোগেন্দ্র বক্ষে ধরিয়া বলিল, 'প্রিয়ে! অবলা ধন! কেন? কাঁদ কেন?' অবলা পাগলিনীর মত আলু থালু হইয়া যেন কি এক নেশার ঘোরে উন্মাদিনী হইয়া বলিল, 'কষ্ট যে নাথ একদিনও পাই নাই; লোকে বলিত, তোর বড় কষ্ট—কিন্তু আমার সেই কষ্টে যে কি সুখ, তা আমিই জানি। যেন তেমার জন্য জন্ম জন্ম ঐরূপ কষ্ট—সুখে সুখী হই—তোমার জন্য আগুনে পুড়িতে গেলে আগুন যে শীতল হইয়া উঠে—তোমার জন্য সাপের মুখে যাইলে সাপ যে ফণা নত করিয়া থাকে। প্রাণনাথ! তুমি যে এ জীবনের আমার সব কষ্ট নিবারণ করিয়া দিয়াছ—তোমার জন্য যে কষ্ট সুখে পরিণত হয়।

শুনিতে শুনিতে যোগেন্দ্র যে কি হইতে লাগিল, তা যোগেন্দ্রই বুঝিয়াছে—তাহা বুঝান যায় না। স্বামী স্ত্রীর বক্ষে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ পরে বলিল, "সুশীলাকে তবে ডেকে আন্‌বে কি" ? যাও যাও সুশীলাকে ডেকে আন।

অবলা আস্তে আস্তে আলো লইয়া নিম্নে সপত্নীকে ডাকিতে গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অবলা আলো লইয়া নিম্নে গেল। রামকে, দাদা! দাদা! বলিয়া ডাকিল; সাড়া পাইল না। গোয়ালঘরে কে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি মলে তো মুই ও মরি, যাই—যাই—যাই মরি যাই"।

অবলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। আবার শব্দ হইতেছে, 'মুই যে তোর তরে পাগল হ'য়ে ছ্যালাম, ও পরাণ—পরাণ—পরাণ সুইলা! মুই তবে এই দড়িতে ঝুলে মরি।'

অবলা ভয় পাইল। কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে চলিয়া গেল। গিয়া বলিল, 'গোয়ালঘরে কে কেঁদে কেঁদে কথা ক'চ্ছে; পুরুষের গলা, রাম দাদা তো নয়—ও আর কেউ হবে।'

যোগেন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিম্নে গমন করিল। অবলা

পশ্চাতে পশ্চাতে যাইল। যোগেন্দ্র গোয়ালঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিল, এক বিকটমূর্ত্তি গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে, নিকটে হতভাগিনী সুশীলা গলায় কাপড় জড়াইয়া আড়কাঠা হইতে ঝুলিতেছে।

'অবলা সরে যাও, সরে যাও, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ'!

যোগেন্দ্র এই বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র অবলা "বাবা-গো কি হলো গো বলিয়া চীৎকার করিল। রামচন্দ্র বাহির হইতে কি কি? ব্যাপার কি? বলিতে বলিতে বাটীর ভিতরে আসিল। পাড়ায় দুই একজনের নিদ্রা সেই চীৎকারে ভাঙ্গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা আসিল না। যোগেন্দ্র রামকে দেখাইয়া বলিল, এ পিশাচ কোথা হইতে আসিয়া মরিল—ও পাপিয়সী মরিয়া ভালই করিয়াছে—কিন্তু এ বিকট পিশাচ কোথা ছিল'।

যোগেন্দ্র অবলাকে উপরে যাইতে বলিল, অবলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে গেল। কিন্তু ব্যাপার কি জানিবার জন্য পাগলিনী হইল।

যোগেন্দ্র রামকে বলিল, 'তাই তো কি উপায়? এখনি তো আমাদের হাতে পায়ে দড়ি পড়িবে'।

রাম। 'ভয় কি? আমরা তো আর মারি নাই। দুষ্টা মরিয়া বাঁচিয়াছে কিন্তু ঐ পিশাচটা কোথা হইতে আসিল?

যোগেন্দ্র। 'যাহা হউক পুলিসে খবর দেওয়া উচিত'।

রাম। তাই করুন—আপনি এখনি পুলিসে যান।

যো। রাত্রি আর অধিক নাই দেখ্‌ছি।

রাম। আদ দণ্টাটাক আছে।

যোগেন্দ্র পুলিসে খবর দিতে যাইল। অবলা উপরে, রাম নিয়ে থাকিল।

যোগেন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে থানায় দারোগার ঘরের নিকট উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিনই পুরাতন দারোগা বদল হইয়াছে; এখন একজন নূতন দারোগা আসিয়াছে।

দারোগা মহাশয় ঘরের ভিতরে অর্দ্ধ নিদ্রিত, যোগেন্দ্র দ্বারদেশ হইতে ডাকিল:—

দারোগা মশাই! দারোগা মশাই!

কোন উত্তর নাই।

দারোগা মশাই একবার উঠুন।

উত্তর নাই।

দারোগা মহাশয় শুনিতে পাইয়াও সাড়া দিতেছেন না; ভাবিতেছেন, আমি জাগ্রত, কি নিদ্রিত। যদি জাগ্রত হইতো, কেহ যে ডাকিতেছে, এটা বাস্তব ঘটনা; কিন্তু যদি নিদ্রিত থাকিতো, ওটা মানসিক বিকার, এ অবস্থায় শাড়া দিয়া বাহিরে যাইলে somnambulism (স্বপ্ন সঞ্চরণ) হইবার সম্ভাবনা। আবার ভাবিতেছেন, আমি জাগ্রত, কি নিদ্রিত। যদি জাগ্রত হইতো এটা স্বপ্ন। স্বপ্নে মানুষ দৌড়িতে পারে না, অতএব পরীক্ষা করিয়া দেখি। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া ঘরের মেজের উপরে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। শুইবার সময় জুতা পায়েই ছিল, ভাবিতে ভাবিতে খুলিতে মনে ছিল না; এখন জুতা পায়েই ছুটাছুটী করায় ঘরের ভিতরে খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ হইতেছে। যোগেন্দ্র

ক্রমাগতই ডাকিতেছে—সাড়া নাই; কিন্তু ভিতরে দৌড়-দৌড়ের শব্দ শুনিয়া অবাক্ হইতেছে।

যোগেন্দ্রের ডাকাডাকিতে দুই জন কনষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া যোগেন্দ্র বলিল, 'দারোগা মহাশয়কে উঠাও—আমাদের বাড়িতে বড় বিপদ।

ক্যা হুয়া?

যো। বাড়িতে দুজন গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছে।

কনেষ্টবল দুইজন চমকিত হইয়া দ্বার ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দারোগা মশাই, দারোগা মশাই'।

দারোগা মশাই ভাবিতেছেন, 'এটা ক্রমশঃ বাস্তব ঘটনাতেই দাঁড়াচ্ছে দেখ্‌ছি—তবে খিল খুলি'।

আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। যোগেন্দ্র দেখিল, এ আর একজন। বলিল, 'আপনি কি নূতন এসেছেন'?

দা। আপনি একটু দাঁড়ান, আপনি ভদ্রলোক, একটু ভেবে চিন্তে আপনার কথার উত্তর দেব।

যো। মশাই ভাববার আর সময়নাই—বাড়িতে বড় বিপদ—

দা। অ্যাঁ বিপদ—বিপদ—কি রকম বিপদ?

যো। বাড়িতে দু জন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

দা। একবারে নাই?

যো। না মশাই।

দা। এ যে অসম্ভব! অসম্ভব! সক্রেটিশ তার পর প্লেটো তার পর ক্যাণ্ট প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা যে প্রমাণ ক'রেছেন মানুষ অর্থাৎ আত্মা কখন মরে না। একেবারে নাই এ যে অসম্ভব কথা।

যো। মশাই তামাসা করছেন কেন? একি তামাসার সময়।

দা। তামাসা তো নয় বাপু ফিলজফির কথা বল্‌ছি। ফিলজফি কি তামাসা।

যো। মশাই এ সময়ে ফিলজফি রেখে দিয়ে আপনার কর্ত্তব্য কাজ ক'রবেন চলুন।

দারোগা মহাশয় দুই জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে হোঁচট খাইতে খাইতে,—রাস্তা ভুলিয়া এ পথ হইতে সে পথে ও পথ হইতে এ পথে যাইতে যাইতে যোগেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের সেই ডাক্তার। ডাক্তারিতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় সুপারিসের জোরে নূতন দারোগাগীরিতে প্রবেশ করিয়াছেন।

দারোগা ও অন্যান্য পুলিসের লোক যোগেন্দ্রের সঙ্গে গমন করিয়া লাস বাহিরে আনয়ন করিল।

বাহিরে লোকে লোকারণ্য। গ্রামে একটী ভয়ানক গোলযোগ উঠিয়াছে। পুলিসের লোক আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ঐ ভীষণ মূর্ত্তি কে? সুশীলার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়া মরিল কেন? যখন পুলিসের লোক লাস বাহিরে আনয়ন করে, তখন অবলা উপর হইতে দেখিয়াই চিনিয়াছিল। মার মৃত্যু-দিবসে অবলা এই বিকটাকার দাঁতকাটাকে দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

সুশীলা রূপসী, দাঁতকাটা কুৎসিৎ কদাকার। সুশীলার মানসিক অবস্থা যাহাই হউক, বাহ্যরূপ দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। এই রূপের কণক-লাবণ্য সাগরে বিকটমূর্ত্তি দাঁতকাটা কি আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিল? দাঁত-কাটার স্ত্রী দিগম্বরী—সতী সাবিত্রী। তার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। তাহাকে ভুলিয়া—তাহাকে বৈধব্য-দশায় নিক্ষেপ করিয়া হতভাগ্য সুশীলার জন্য প্রাণত্যাগ করিল কেন? পাঠক পাঠিকার এই সমুদয় কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে।

দাঁতকাটা পূর্ব্বে সুশীলাদের বাটীতে চাকর ছিল। সুশীলা যখন বালিকা, তখন ২।১ জন তামাসা করিয়া সুশীলাকে রাগা-ইত:—'দাঁতকাটা তোর বর, দাঁতকাটা তোর বর'। এই কথা শুনিলেই সুশীলা ক্রোধে অধীরা হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিত। সুশীলা দাঁতকাটার কাছে থাকিত, দাঁতকাটার চেহারা লইয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিত।

একদিন সুশীলা দাঁতকাটাকে ভেঙ্গাইতেছে, সুশীলার সম্পর্কীয় এক দিদি মা দেখিতে পাইয়া বলিল, 'হ্যালো বরের সঙ্গে তামাসা ক'চ্ছে' ?

দাঁতকাটা বরাবরই একটু একটু পাগল। এদিকে বিবাহের বয়সও উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিবাহের বড় সাধ। বিবাহের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া এক প্রকার 'বিয়ে পাগলা' হইয়াছে। ঐ কথাটী শুনিয়া ভাবিতেছে, 'আমার সঙ্গে সুইলার বিয়ে হয় যদি, হয় তো মুই ওকে কোন কাজ কম্ম ক'ত্তে দিমু না'। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে।

সুশীলার দিদীমা দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিল, কিরে দাঁতকাটা! ক'নের দিকে চেয়ে আছিস নাকি? দাঁতকাটা একটু মুচকিয়া হাসিল। মনে মনে বড় আনন্দ।

সুশীলার দিদীমার বাড়ী নিকটেই। সে বিধবা। অবস্থা বড় ভাল নয়। সুশীলার মা চাল, নুন, তেল, আলু, বেগুণ ইত্যাদি মাঝে মাঝে দিয়া থাকে, তাহাতেই দিদীমার এক প্রকার চলে।

দাঁতকাটার সহিত সুশীলার বিবাহের কথাটা দিদীমা উপহাসচ্ছলে মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে। দাঁতকাটা প্রথম প্রথম তামাসা বলিয়াই ভাবিত, কিন্তু শেষে, যখন মাথাটী একটু খারাপ হইল, তখন হইতে ভাবিতে লাগিল, 'দিদীমা কি আর রোজ রোজ তামাসা করেন'।

দাঁতকাটা বিবাহের লোভে প্রত্যহ দিদীমার বাড়ি যায়। গিয়া দিদীমার সহিত কত কথা কয়। কথার মধ্যে বর্ক-

বিয়ের কথাটা আসে, তখন বড় আনন্দ। দাঁতকাটা দিদীমার বাজার করে, কাঠ কাটে, তেঁতুল পাড়ে, শাকের সময় শাক, আলুর সময় আলু আনিয়া দেয়। এক দিন দিদীমা বলিল, হাঁরে তুই বিয়ে ক'রবি?

দাঁতকাটা মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, 'কাকে'?

দি। কাকে পসন্দ হয়?

দাঁ। বাবুদের—

দি। সুশীলাকে।

দাঁ। দিদীমা! তুমি তো জান, তবে কেন—

দি। তবে কেন কি?

দাঁ। দেরি কর।

দি। সুশীলা সুন্দরী—তুই কাল; সুশীলা বিয়ে কর্‌বে কেন?

দাঁতকাটা একটু কাঁদ কাঁদ হইল। এই দিন হইতে দাঁতকাটার পাগলামী বাড়িল।

দাঁতকাটার মা আছে। ছেলের বিবাহের জন্ত কতকগুলি টাকা রাখিয়াছে। বিবাহের অনেক চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু অমন পিশাচকে কে মেয়ে দিবে?

দাঁতকাটার পাগলামী ভয়ানক বাড়িয়াছে। একদিন সুশীলাদের বাটিতে যাইল। দেখিল বাহিরের বাটীতে সুশীলা থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাঁতকাটা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ও ক'নে গয়না দেব—আমার কাছে এস'। সুশীলা পলায়ন করিল। পাগলও পশ্চাতে পশ্চাতে যাইল। সুশীলার মা দেখিল, পাগল ছুটিয়া বাড়ির

ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি একটা বাড়ি লইয়া তাড়া করিল। পাগল পলায়ন করিল।

দাঁতকাটাকে কেহ বিবাহ দিতে চায় না। দাঁতকাটার মা ছেলের বিবাহ হইল না—ছেলে পাগল হইল ভাবিয়া রাত্রি দিন কাঁদিয়া বেড়ায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ছোট লোকের ঘরে সময়ে সময়ে সুন্দরী দেখা যায়। সামান্য বাগানে সময়ে সময়ে ভাল গোলাপ ফুটিয়া বাগানকে আলো করে। দিগম্বরী গ্রামের গোয়ালা পাড়ায় খাঁদা কাল চিক্কণদাঁতীদের মধ্যে স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরী কন্যার ন্যায় ফুটিতেছিল। কাল ছেঁড়া কাপড় খানি পরিয়া না থাকিলে কার সাধ্য ছোট ঘরের মেয়ে বলিয়া জানিতে পারে। বড় ঘরের সুন্দরীদিগের মুখে চোখে অহঙ্কারের ছটা থাকে—চলনে গরব ফুটিয়া পড়ে, কিন্তু দিগম্বরী সে সব পাবে কোথা? এজন্য সে সুন্দরীটীর সৌন্দর্য্যে এক স্বর্গের শোভা দেখা যায়। আকাশের চাঁদ সুন্দর কিন্তু ধরা যায় না। বড় লোকের ঘরের সুন্দরীদের সাক্ষাৎ কে কবে পায়—চাঁদ যেমন ধরা যায় না বড় ঘরের সুন্দরী তেমনি দেখা যায় না। দিগম্বরী চাঁদের আলোর মতন—ভূতলে

চাঁদের মত পথ ঘাট মাঠ আলোকিত করিত। বড় ঘরের কত যুবতীর সে রূপ দেখিয়া হিংসা হইত।

দিগম্বরীর মা দিগম্বরীকে ৮ বৎসরের করিয়া মরিয়া যায়—পিতা—তার পূর্ব্বেই মরে। জ্ঞাতি কাকার ঘরে খাইত—নিজের রোজগারে।

গ্রামে এক কালী আছেন। সেই কালীর মন্দির পরিষ্কার করিত দিগম্বরী। সেই কালীর পূজা ব্যতীত আর সবই দিগম্বরী করিত। আট বৎসরের বালিকা অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া দেব মন্দির মার্জ্জনা করিত—পুরোহিতের বাটীর কাজ কর্ম্ম করিত। অনেকে দিগম্বরীকে মাহিনা দিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল কিন্তু দিগম্বরী জগজ্জননীর বাড়ীর দাসীপনা প্রাণান্তেও ছাড়িতে চাহিতনা।

দিগম্বরী কালী সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা বলিত। সে বলিত কালী আমার সঙ্গে কথা বলেন—স্বপ্নে আমায় উপদেশ দেন। একদিন প্রাতে দিগম্বরীর মন্দিরে য ইতে বিলম্ব হইয়া ছিল—দিগম্বরী তাড়াতাড়ি মন্দিরে গিয়া দেখিল কে মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানে জানিল গ্রামের কেহই সে কাজ করে নাই। দিগম্বরী সে কথাটা বড়ই ভাবিতে লাগিল—কে মন্দির মার্জ্জনা করিল? ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলে দিগম্বরী স্বপ্নে দেখিল সেই কালীমূর্ত্তি আসিয়া বলিতেছেন "তোর বিলম্ব দেখিয়া আমি নিজে মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছি।" দিগম্বরী এই সব কথা আরো অনেক কথা স্ত্রীলোকদিগকে বলিত—কিন্তু লোকে বিশ্বাস করিত না। এজন্য অনেকে দিগম্বরীকে "পাগলী" বলিত।

দাঁতকাটার মা দাঁতকাটাকে লইয়া সেই গ্রামেই বাস করিতে ছিল। দাঁতকাটা পিশাচের মত নানা স্থানে ফিরিত। দেখিতে পাইলে অনেক ছেলে মেয়ে দাঁত কাটাকে নানা কথায় পাগল করিত—দাঁতকাটার গায়ে ধুলা—ওঁচলা ফেলিয়া দিত—কেহ বা ইট পাটখেল ছুঁড়িয়া মারিত। কোন বালিকা বলিত

দাঁত কাটার মা নেড়ি।
থায় দশটা ভেড়ি॥

কেহ বলিত :—

দাঁতকাটার মাগ দাঁতকাটী।
গিলে থায় দশটা পাঁটী॥

দিগম্বরী ও সময়ে সময়ে বালক বালিকাদের সঙ্গে মিলিয়া দাঁত কাটার সঙ্গে ঐরূপ ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত। দিগম্বরী জানিত দাঁতকাটা পিশাচ।

একদিন রাত্রি শেষে দিগম্বরী স্বপ্নে দেখিল মা কালী শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "দাঁতকাটাকে অবজ্ঞা করিস কেন? সে যে পূর্ব্বজন্মে তোর স্বামী ছিল"।

স্বপ্ন ভাঙিয়া গেলে, দিগম্বরী বিছানায় শুইয়া অনেক ...বল বার বৎসরের মেয়ে স্বামী জিনিসটা কতক বুঝিতে পারে। বার বৎসরের দিগম্বরী বিছানায় শুইয়া কালীর কাছে ক্ষমা চাহিতেছিল। সেই স্বপ্ন দিগম্বরীকে নূতন করিয়া গঠিত করিল। সেই সময় হইতে দাঁত কাটাকে দিগম্বরী পিশাচ না ভাবিয়া "স্বামী" বলিয়া ভাবিতে লাগিল। ৪।৫ দিন ভাবিতে ভাবিতে দাঁতকাটা দিগম্বরীর প্রাণের নিকটে দাঁড়াইল।

২।৩ মাস পরে সেই বিকৃত মূর্ত্তিতে আপনার স্বামী মূর্ত্তি প্রিয়তম মূর্ত্তি দর্শন করিল পিশাচ দিগম্বরীর প্রিয়তম হইল।

গোয়ালা পাড়ায় দিগম্বরীর একটী মেটে ঘর একটী গাভী ও কিছু টাকা আছে। বালিকার বিবাহের জন্ত কেহ চেষ্টা করিতেছে না।

বালিকা ঘরের ভিতরে একটী মাদুরে শয়ন করিয়া ভাবিতেছে।—কি প্রকারে বিবাহ করিব! যদি ওর মা আমাদের এদিকে আসে তো বিবাহের কথা বলি। আমি যদি বিবাহ করিতে চাই তো ওর মার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না"।

এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে একটী তের বৎসরের বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বালিকাও গোপ কন্যা সম্পর্কে ভগিনী নাম কাত্যায়নী বা কাতী। দিগম্বরীর সহিত কাতীর বড় প্রণয়। দিগম্বরীর জন্য কাতী মরিতে পারে, কাতীর জন্ত দিগম্বরী মরিতে পারে।

কাতী আসিবামাত্র দিগম্বরী উঠিয়া বসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কি ভাই শ্বশুরবাড়ি হ'তে কবে এলে'?

কা। আ মরণ! এই আসছি যে লো। এসে কাপড় ছেড়েই তোকে দেখ্‌তে এলাম।

দি।—ছেড়ে যে এলি?

কা। মুখে আগুন—ছেড়ে কি আর এসেছি সে কাল যে আসবে।

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাতী মুখ অবনত করিল।

দি। ভাই! তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

কা। কি কথা? এত বেলা হ'য়েছে, এখনও যে আজ বাঁধিস নি।

দি। শুয়ে শুয়ে ভাই ভাবছিনু।

কা। আহা! বেয়র কথা বুঝি—তার আর ভাবনা কি? আমি তোর জন্য যে বর ঠিক ক'রেছি।

দি। মুখে আগুণ তোমার।

বলিয়াই দিগম্বরী কাতীর গাল টিপিল।

"ওলো ছেড়েদে—ছেড়েদে—তুই জন্ম জন্ম আইবুড় থাক—আমার নাকের ঘায়ে লাগবে ছেড়েদে।"

কাতী এই বলিলে, দিগম্বরী বলিল "আমি টিপিছি তাই লাগলো—তিনি যদি টিপতেন তো স্বস্তি করতো লো'।

কা। যা ভাই! কিও! একশবার সে কথা কেন? তোর বেয়র কি হ'ল বল্ শুনি।

দি। আমার বে হবেনা। আমি বে ক'রবো না।

কা। ইস্—রেখে দে লো রেখে দে। আজ যদি হয় তো কাল চাস্ না।

দি। একটা তোকে কথা ব'লবো বল্‌নু, তা তো তুই শুনবি না।

কা। কি কথা?

দি। ব্যাঙের মাথা।

কা। উকি ভাই, বল না। দেখিস্ লো—বের ঠিক্ হ'য়েছে বুঝি।

দি। আমার তো ভাই সম্বন্ধ তোরা একটা ক'রলি না।

কা। ক'রেছি—বিয়ে ক'রবি? যার সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রেছি তাকে বে ক'রবি তো বলি।

কার সঙ্গে করেছিস—বলনা আগে শুনি।

কা। সেই পাগলা দাঁতকাটাকে বে করবি? শুনিবামাত্র দিগম্বরীর বাহ্য প্রকৃতিতে গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার হইল।—দুই চক্ষু ছল্ ছল্, করিল লাল হইল। প্রেমাবেশে নিরবে মুখ নত্র করিল।

কা। ওকিলো! কাঁদ্‌ছিস্ নাকি? সত্যি সত্যিই কি পাগ্‌লাকে বিয়ে ক'র্‌তে হবে। তামাসা ক'রে বলেছি ব'লে ভাই রাগ ক'রলি। তাকে কি আর মানুষে বে ক'রে? বাবা! তার সঙ্গে যার বে করে সে এক দিনেই ভয়ে ম'রে যাবে। ঢের ঢের চেহারা দেখেছি অমন বিকট চেহারা ভাই কখনও দেখিনি। ও ভাই বোধ হয় ভূত ও কখনই মানুষ না।

কাত্যায়ণী জানে না যে, সেই বিকট নর পিশাচকেই রূপবতী দিগম্বরী আপনার মন, প্রাণ, ধন, মান সমুদয় সমর্পণ করিয়াছে। কাত্যায়নী জানে না যে প্রেমের অদ্ভুত লীলা কোন পথে কি ভাবে প্রবাহিত হয়। যে প্রেম বাণিজ্যের পথে মৃদু মৃদু থামিতে থামিতে প্রবাহিত হয় এ সে প্রেম নহে। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া ধন দেখিয়া যে প্রেম সে নীচ বিকৃত প্রেম ইহা নহে। এ প্রেম ভবিষ্যৎ বুঝে না —মান অপমান মানে না—চরিত্র অচরিত্র দেখে না মানুষ কি দেবতা শুনিতে চায় না। প্রকৃতির হৃদয় হইতে যে প্রেম আপনি প্রবাহিত হইয়া প্রেমিকের নিকট—স্বর্গের নন্দন কাননকে আনিয়া দেয়, প্রেমিকের চারিদিকে আনন্দের

ধারা ঢালিয়া দেয়, দিগম্বরীর ইহা সেই প্রেম। সাধারণের চক্ষু এ প্রেমকে দেখিতে পায় না—কবির হৃদয় ইহাকে অনুভব করিয়া ভাবভরে অবনত হয়। এরূপ প্রেম সচরাচর ঘটেনা বটে, কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি ও জল বায়ুর প্রভাবে মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হয়। ইহা সাধারণের চক্ষে পড়ে না প্রেমিক কবির চক্ষে পড়ে—সাধারণ ইহাকে কল্পনার স্বপ্ন বলিয়া অবহেলা করে; কবি ইহাকে অনন্ত প্রেমের তরঙ্গ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে গদ গদ হয় এবং লেখনীর মুখে পরিচয় দিয়া মাটীর পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করে।

কাত্তী বলিল 'ওকি ভাই! কাঁদছ কেন' ?

দিগম্বরী আরও কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিল।

দি। ভাই তোর পায়ে পড়ি কাকেও বল্‌বি না ?

কা। ভাই তোর কান্না দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। কেন কাঁদলি আমার মাথার দিব্য বল।

দি। ভাই! ভগবান্ যাকে যেমন গ'ড়েছেন। তা ব'লে কি ঘৃণা ক'রতে আছে।

কা। কাকে কি বলেছি ভাই! দাঁতকাটাকে বলেছি তা তুমি কেন কাঁদ ভাই। সে তো তোমার কেউ নয় ভাই।

দেখিস লো এত! ওমা! আমি মনে করি তোর মার কথা বুঝি মনে প'ড়লো তাই কাঁদছিস।

দিগম্বরী প্রেমাবেশে অধীরা হইয়া কাত্যায়ণীর দুটী হাত আপনার চক্ষের উপরে রাখিয়া আবার কাঁদিল।

কাত্যায়ণী কাঁদ কাঁদ হইয়া বন্ধুর গলা জড়াইয়া বলিল

ভাই! কাঁদ কেন? আমি তোমায় যে ব'নের চেয়েও ভাল বাসি। কি হ'য়েছে বল।

দি। আমার মাথায় হাত দিয়ে তিন বার বল, কাকেও ব'লবিনা।

কাতী মাথা ছুইয়া বলিল "কাকেও ব'লবোনা, কাকেও ব'লবোনা, কাকেও ব'লবোনা"।

দি। আমার মরা মুখ দেখবি তিনবার মাথা ছুঁয়ে বল।

কা। বালাই! ব'লতে আছে ও কথা। ভাই! আমাকে তোর অবিশ্বাস। তুই আমায় কত কি বলেছিস আমি কি কাকেও একবারও সে সব ব'লেছি; স্বামীকে পর্য্যন্ত নয়।

দিগম্বরী ঘরে খিল দিল। বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল:—আমার বে দিবি?

কা। দেব।

দি। বর কোথা?

কা। দাঁত কাটা।

বলিয়াই কাতী হাসিয়া উঠিল।

দি। কেন বর কি মন্দ?

কা। মুখে আগুণ কাকে বে ক'রবি লো।

দি। যার নাম ক'রলি।

বলিয়াই দিগম্বরী একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নত করিল।

কা। কিলো সত্যি সত্যি নাকি? আর কি বর নাই নাকি? আমি তোর ভাল বর দেখে বে দেব, তার ভাবনা কি?

দিগম্বরী গম্ভীর স্বরে বলিল, ভাই! আমি যথার্থই ব'লছি—যার নাম ক'রলি তাকে ভিন্ন আর কাকেও বিয়ে ক'রবোনা।

কাত্তী চমকিত ভাবে বলিল "দূর পাগলী! মানুষ কি তাকে বে ক'রতে পারে"!

দি। কেন? কি দোষ?

কা। সে কি মানুষ! সে যে ভূত! তুই কি পেতনি যে তাকে বে ক'রবি!

দি। পেতনি না হয় হব। সে যদি ভূত হয় আমি কি পেতনি হ'তে পারি না।

কা। তুই কি তামাসা কচ্ছিস্।

এই রূপে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে কাত্তীর মা আসিয়া ডাকিল:—'ও কাত্তী! কোথা লো'।

কাত্তীর আর থাকা হইল না।

ভাই! মা ডাকছেন যাই। ওঠ বেলা হ'য়েছে। রান্নার যোগাড় কর, না হয় আমাদের ওখানে চল, দুজনে ভাত খাব এখন।

কাত্তীর মা আবার ডাকিল!—ও কাত্তী।

কেন? যাই; বলিয়া কাত্তী চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

———:•:———

দাঁতকাটার মার সহিত কবে দেখা হইবে দিগম্বরী তাহাই ভাবিতে থাকে। একদিন গাভীর দুগ্ধ লইয়া দাঁতকাটার গ্রামে বিক্রয় করিতে যাইল। রাস্তা দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে বটতলায়, দাঁতকাটার মার সহিত দেখা হইল। দিগম্বরী ডাকিল। দাঁতকাটার মা হরিদাসী কাছে আসিলে দিগম্বরী অতি নম্রভাবে ধীরে ধীরে বলিল "হাঁগা তুমি যে আর আমাদের ওখানে যাওনা"।

যাব কি মা! ছেলেটীর আবার ব্যারাম বেড়েছে। আমার পোড়া কপাল মা! নইলে আবার ব্যারাম হবে কেন?

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া দিগম্বরী অতি কষ্টে জিজ্ঞাসিল "বে হ'য়েছে?"

হরিদাসী। কে মেয়ে দেবে মা! চেষ্টা তো অনেক ক'রলাম; তা জুটলো কই?

দিগম্বরী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "কেন মেয়ে কি নাই"?

হ। থাকবেনা কেন মা! সোন্দর চেহারা তো আর আমার ছেলের নয়। আমারই না হয় ছেলে; যার মেয়ে সে তো দেখে শুনে দেবে।

দি। আমার সন্ধানে একটী মেয়ে আছে, তার সঙ্গে বে দেবে?

হ। হাঁ মা! তোমার তো বয়স হ'য়েছে, তোমার বে কবে হবে?

দি। সে যাই হ'ক, তোমার ছেলের যদি বে দাও তো বল।

হ। কেমন মেয়ে? হরি কি এমন দিন দেবেন?

দি। তুমি একটু চেষ্টা ক'র্‌লেই তোমার ছেলের বে হয়। এক পয়সা খরচা হবে না।

হ। কেন বাছা তামাসা কর।

দি। তামাসা নয়—সত্যি সত্যি।

দিগম্বরী হৃদয়ের বেগ অনেক যত্নে সম্বরণ করিয়া কথা কহিতেছিল। কহিতে কহিতে—কথা আর্দ্র হইল।

হ। মা! তোমার মত সুন্দরী মেয়ে যদি আমার বউ হয়, তো আমার কপালের জোর। মা! তুমি কেন বে করনা?

যে পাথর দিগম্বরীর প্রেমের পথে থাকিয়া প্রবাহকে বাধা দিতেছিল, হরিদাসীর ঐ কথায় সে পাথর সরিয়া গেল;—দিগম্বরী অবনত মুখে কাঁদিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দিগম্বরী বলিলঃ—'তা একটা দিন দেখে—

হরিদাসী আনন্দে উন্মত্তা হইয়া দিগম্বরীর চিবুক ধরিয়া হাতে করিয়া মুখের চুম্ খাইয়া বলিল, 'মা! তুই আমার বউ হবি, এ আমার স্বপ্নেও বোধ হয় না। সত্যি না তামাসা ক'র্‌ছ।

দিগম্বরী চুপ করিয়া থাকিল।

হরিদাসীর মহা আনন্দ। ভাবী বধুর হাত ধরিয়া বলিল,

আর মা আমরা গাছতলায় বসি। দুধ কোথা নে যাচ্ছ? দিগম্বরী বলিল, 'দুধ্ তুমি নে যাও।'

দিগম্বরী হরিদাসীকে দুধ্ দিল। কিয়ৎক্ষণপরে হরিদাসী বলিল, 'মা! তুমি আমাদের ওখানে চল।'

দিগম্বরী বলিল 'না আজ আর যাব না একবারে বের পর যাব। তুমি কাল আমাদের ওখানে যাবে মা?

হ। 'যাব'।

দি। তবে আমি এখন ঘরে যাই।

হরিদাসী ঘরে যাইল দিগম্বরীও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিগম্বরীর সহিত শুভ বিবাহ হইবার তিনমাস পরে দাঁত কাটার বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহের পর কিছুদিন দাঁতকাটার প্রকৃতি সুস্থির হইল। দিগম্বরীর প্রণয়ে দাঁতকাটার স্ফূর্ত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

দাঁতকাটা কথা কহিতে পারে না—বোবা। দিগম্বরী ইসারা দ্বারা সব বুঝিতে পারে।

দিগম্বরী স্বামী সুখে মগ্ন হইয়া একদিন কথা কহিতেছে:—

'আ। অঁা অঁা এমি।

স্ত্রী। কি ভয়! আমি কারও বাড়িতে দাসী হ'য়ে টাকা রোজগার ক'রে তোমায় খাওয়াব।

স্বা। প্যা প্যা প্যা ইবি।

স্ত্রী। তোমার জন্য আমি কি না ক'র্‌তে পারি।

স্বা। ম্যা ম্যা ম্যা বা বা এ না।

স্ত্রী। ভগবানের যা ইচ্ছা তা হবে।

স্বা। আ আ কে ভা ভা ভা ভা স।

স্ত্রী। তোমায় ভাল বাসি না তো কাকে বাসি—তুমি যে আমার পরাণ। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। স্বামী না—না—না—না— বলিয়া স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে দাঁতকাটার মা মরিবার পরে আবার দাঁতকাটার মনটা খারাপ হইল, আধ্‌ পাগলের মতই থাকিল।

সুশীলাদের বাড়ীতে দাঁতকাটা চাকরি করিয়া থাকে। বিবাহের একবৎসর পরেই সুশীলা বিধবা হয়। সুশীলার পিতা মাতা সুশীলার আবার বিবাহ দিবার প্রয়াস পাইল।

দাঁতকাটা শুনিল সুশীলার আবার বিবাহ হইবে। শুনিয়া দাঁতকাটার পাগ্‌লামি বাড়িল। দাঁতকাটা একদিন ভাবি-তেছে:—এবার মোর সঙ্গে বে হবেই হবে। আঁড়কে আর কে বে ক'র্‌বে। মোরকপালে সুইলে কোথা যাবে বাবা। মোর সাথে ওর বে ল্যাকা আছে নাকি তাই ওর সে সোয়ামী মোল।" দাতকাটা এইরূপে ভাবে আর খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসে।

দাঁতকাটার উন্মত্ততা দিন দিন ভয়ানক বড়িয়া উঠিতেছে।

সে আর ঘরে থাকে না স্ত্রীকে দেখে না। এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়ায়। অবলা বালা এই অবস্থায় উহাকে প্রথম দেখে। পাগলের মড়ার উপর বড় ঝোঁক ছিল। মড়া পাইলেই ঘাড়ে লইয়া পালাইত। উন্মত্ততার দরুণ দাঁতকাটার একটী এই ক্ষমতা ছিল যে, যে ঘরে মড়া মরিয়া থাকিত পাগল আপনি তাহা অনুভব করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিত এবং মড়া লইয়া টানাটানি করিত।

যে দিন যোগেন্দ্র সুশীলাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল দাঁত-কাটা সে দিন হইতে ভীষণ শব্দে গ্রামকে বিকম্পিত করিতে লাগিল। দাঁতকাটা “সুইলা সুইলা” বলিয়া কাঁদে হাসে আর হাততালি দিতে দিতে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করে।

সুশীলা যে রাত্রে গলায় দড়ি দেয় সেই রাত্রে পাগল কোথায় ছিল কেহ জানিত না। এত দিন নিরুদ্দেশ ছিল। হঠাৎ রজনীতে আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুশীলা গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। পাগলের সঙ্গে একটী মোটা দড়ি সর্ব্বদাই থাকিত। সেই দড়িটী লইয়া উন্মত্ত আপনার গলে দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

পতিপ্রাণা দিগম্বরী স্বামীর উন্মাদ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে কিন্তু দুরদৃষ্ট সমুদয় বিফল করিতেছে। স্বামী পিশাচের ন্যায় এগ্রাম ওগ্রাম করিয়া বেড়ায়, স্ত্রী পাগলিনীর মত খুঁজিতে থাকে। বিকটাকার মূর্ত্তিকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছিল বলিয়া কত লোক কত কথা বলিত, কত দুষ্ট লোক দিগম্বরীকে কলঙ্কিত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইত। এ পৃথিবীতে মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট সমুদয় পৃথিবীকে পরাজিত করিতে পারেন, কিন্তু সতীর হৃদয়কে পরাজিত করিতে যাইলে আপনার বাহুবলকে অগ্নি নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়। যে সমস্ত রূপবান পুরুষ, দিগম্বরীর স্বামীকে নরপিশাচ বোধে মনে ভাবিত, রূপবতী দরিদ্র দিগম্বরী তাহাদিগের মনোমোহন রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে, সতী দিগম্বরী ঐ সমস্ত রূপবান পুরুষদিগকে বাস্তবিকই নরপিশাচ বলিয়া বোধ করিত। লোকে ভাবিত, দাঁতকাটার ন্যায় জঘন্য কদাকার আর নাই; কিন্তু দুশ্চরিত্র রূপবান রাজপুত্র যে প্রকৃত পক্ষে দাঁতকাটার অপেক্ষা অধিকতর কদাকার, তাহা দেবপ্রকৃতির লোকই বুঝিতে পারে। দাঁতকাটার গুণাগুণ দেখিয়া দিগম্বরী বিবাহ করে নাই। সে-তার পূর্ব্বজন্মের স্বামী দেবতার এই কথায়

বিশ্বাস করিয়া সতী প্রেম পাগলিনী হইয়া বিকট মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল এবং আপনার জীবন মান অপমান উহারই পদতলে অর্পণ করিয়াছিল! কেহ বিবাহের ঘটকালি করে নাই;—তাহা হইলে কি আর পিশাচের বিবাহ হইত। দিগম্বরীর হৃদয়ে যে প্রেমময় দেবতা বাস করিতেছেন তিনি তো আর দাঁতকাটাকে কদাকার দেখেননা;—কেননা দাঁতকাটা তাঁর নিজের হাতে গঠিত। যে হাতে তিনি রাজপুত্রকে গড়িয়াছেন সেইহাতেই দাঁতকাটাকে গড়িয়াছেন। প্রেমময় পিতার চক্ষে সব পুত্রই সমান সুন্দর। রাজপুত্রের জন্য যে ব্যবস্থা দাঁতকাটার জন্যও সেই ব্যবস্থা। উভয়েরই জন্য সূতিকাগৃহ ও শ্মশান, উভয়েরই জন্য পাপ ও পুণ্য এবং উভয়েরই জন্য দণ্ড ও পুরস্কার। অবশ্য দাঁতকাটা তার পূর্ব্বজন্মের স্বামী এই বিশ্বাস হইতে ভগবানের প্রেম দিগম্বরীর দয়ার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া দিগম্বরীকে দাঁতকাটার মনোমোহন মূর্ত্তি দেখাইল। ভগবান স্বয়ং যে ভাবে দেখিয়া থাকেন উহাকে দিগম্বরীর নিকট সেই ভাবেই উপস্থিত করিলেন। আর কি দিগম্বরী থাকিতে পারে। ভগবান স্বয়ং ঘটকালি করিয়া যে বিবাহ দেন সেই বিবাহের রীতিই এই। ইহাই তো প্রকৃত বিবাহ, ইহাই বিবাহের আদর্শ।

এই বিবাহের চিত্র আঁকিবার জন্যই কবির কল্পনা। এ বিবাহ সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক। ইহাতে শারীরিক সম্পর্ক; আদতে নাই। জগতে অধিকাংশ বিবাহই শারীরিক। বিবাহে শরীরের সহিত যত অল্প সম্বন্ধ থাকিবে বিবাহ তত পবিত্র হইবে। অস্থায়ী শরীরের সহিত যে বিবাহ তাহা মৃত্যুর

আঘাতে ভাঙিয়া যায়; কিন্তু আত্মার সহিত যে বিবাহ তাহা অনন্ত কাল থাকে। সুতরাং ইহাতে বৈধব্য হয় না—কারণ স্বামী প্রবাসীর মত পরলোক বাসী হয়েন। বিবাহের একটী নাম আত্ম বলি। বিবাহ ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান। মানুষ একবারে জগতের জন্ম আত্মবলি দিতে পারেনা বলিয়া বিবাহে তাহার আরম্ভ—শিক্ষা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের উত্তর ধারে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। তার পাহাড়ের উপর এক দেবমন্দির। সেই মন্দিরের দাসী দিগম্বরী মন্দিরের কার্য্যাদি সমাপন করিয়া ম্লান মুখে কোথায় যাইতেছে—আর স্বামীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মুচিতেছে এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "ও দিগমি!"

দিগমী মনের দুঃখে সে ডাক অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

আবার ডাকিল "আ মোলো। শোন্‌না-লো"!

দিগমী স্বর বুঝিয়া পিছনে ফিরিয়া "কেগো! বামুন দিদি"! বামুন দিদি বিকৃতস্বরে বলিল "আহা! শুনেও শুনিস্‌না যে লো"!

দিগম্বরী একটু আস্তে আস্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর দিদি! মনে কি সুখ আছে"।

বামুন দিদি বলিল "দেখা পেয়েছিস?

"না দিদি! কেন আর কও"—বলিয়া দিগম্বরী কয়বিন্দু চক্ষের জল ফেলিল।

বামুনদিদি দিগম্বরীর দুঃখ একটু বুঝিত। তাই একটু কাতর ভাবে বলিল "তা আর কি ক'রবি বল, তোর যেমন পোড়া কপাল। নইলে তোর তেমন সম্বন্ধ জুটয়ে দিলাম—তা তুই শুনলি ক'ই একটা খ্যাপাকে ধ'রে, বে করলি—মর এখন ভুগে মর"।

কথা শুনিয়া দিগম্বরী প্রবলতর বেগে অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিল "দিদি! তুমিও অমন কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবে। যদি মা কালীর ইচ্ছায় ওর ব্যারামটা ভাল হয় তো আমার ভাবনা কিসের দিদি"! বলিয়া হতভাগিনী আপনার অঞ্চল দিয়া নয়নের জল মুছিতে লাগিল—যত মুছে তত পড়ে।

বামুনদিদি আবার বলিল, "তা কোথাও সন্ধানটন্ধান ক'রলি"।

দিগম্বরী ঘাড় হেঁট করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। মুখে কথা সরে না। বামুন দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করে আর মনের দুঃখে দুচক্ষু জলে ভাসিয়া যায়—বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠে।

বামুন দিদি একটু চমকিত ভাবে বলিল "কেন লো! অমন ক'রছিস কেন?

দিগম্বরী অনেক কষ্টে মনের দুঃখ চাপিয়া বলিল দিদি! কাল থেকে আমার মনটা তার জন্য বড় খারাপ হ'য়েছে—

একটা কাক কা কা ক'রে আমার মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। দিদি! কোন সর্ব্বনাশ হয় নিতো? দিগম্বী আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল। দিগম্বী কাঁদিতেছে, বামুন দিদি কত কি বলিয়া দিগম্বীকে প্রবোধ দিতেছ; এমন সময়ে বামুন দিদির স্বামী কোথা হইতে আসিয়া, দিগম্বীকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ওগো! শুনেছ! দাঁতকাটা গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছে।" শুনিবামাত্র দিগম্বরী ব্রাহ্মণের দিকে উন্মাদিনীর মত স্থির নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইল। সতী স্বর্গে গমন করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

:o:

যোগেন্দ্র কলিকাতায় গিয়া একদিন বিকালে—হেদোর পুকুরে বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছে। কাছে এক যুবা আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্রের সঙ্গে ঐ যুবা কয়েক বৎসর স্কুলে পড়িয়াছিল। যোগেন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই চিনিল। "কিহে! হরিদাস বাবু না—বলিবামাত্র হরিদাস বাবু "আরে যোগেন্দ্র বাবু যে অনেক দিন পর দেখা"।

দুইজনে কর মর্দ্দন করিয়া অনেক আলাপ হইল। হরিদাস যোগেন্দ্রের বাসায় আসিল—যোগেন্দ্র হরিদাসের বাসায় যাইল। দুজনে খুব আলাপ জমিয়া গেল। একদিন আলাপ হইতেছে :—

হ। যোগেন্দ্র বাবু! কয় বৎসরের মধ্যে অনেক ঘটনা হইয়াছে। অনেক বদমাইসি করেছি। পাপের যাতনাও অনেক ভুগেছি—এখনও ভুগছি। এত দেখে এত ভুগে একটী পাকা শিক্ষা এই হ'য়েছে—"যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ব'লে যে কথা, ওটার মত মিথ্যা কথা আর নাই"।

যো। কেন বল দেখি?

হ। আবার কেন বল দেখি? তবে বলি শুন।

হরিদাস তখন আপনার স্ত্রী গোলাপের কথা সমস্ত বলিল। তারপর অবলার কথা বলিল। রামচন্দ্রের বাড়িতে পুড়িয়া মরা পর্য্যন্ত বলিয়া, রামের চরিত্রে কালি দিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্র ভণ্ড সন্ন্যাসী, তাহাও বলিল। রামচন্দ্রকে সে বড় ভয় করে তাহাও বলিল। রাম চন্দ্রের সঙ্গে অবলার গুপ্ত প্রণয়ের কথা, মিথ্যা করিয়া, এভাবে বলিল যে যোগেন্দ্র সে কথার বিষ পান করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

একদিন রজনীতে পূর্ণিমার চন্দ্র সুধা বর্ষণে পৃথিবীতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতেছে; দুই একখানা খণ্ড সাদা মেঘ চাঁদের কাছ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে; মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে; এমন সময়ে যোগেন্দ্র ছাদের উপরে শায়িত; অবলা পদতলে উপবিষ্টা। অবলা স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে সেই জ্যোৎস্না সাগরে স্বামীর সৌন্দর্য্যদর্শনে স্বর্গসুখের শেষ সীমায় উপনীতা হইতেছে। স্বামী অর্দ্ধনিদ্রিত। স্বামীর

মুখে চন্দ্র কর পড়িয়াছে। সুন্দর কপালে, চন্দ্রকর পতিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে যেন সে কপাল স্বর্গের পুরোভাগস্বরূপ। সেই কপাল হইতে গাম্ভীর্য্যের দীপ্তি বাহির হইয়া চন্দ্র করে মিশিতেছে। নৈশ-সমীরণ মৃদু মৃদু সেই মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মস্তকের পবিত্র কেশ রাশিকে অল্প দুলাইয়া যাইতেছে। অবলা অনিমেষ নয়নে স্বামীর বদন চন্দ্র দেখিতে দেখিতে, কখন আনন্দে উন্মাদিনী হইয়া ধীরে ধীরে সেই দেবতার মুখে চুম্বন দান করিতেছে; কখন বা সেই দিব্য কান্তির লীলা দেখিয়া ভক্তিভরে অশ্রুমোচন করিতে করিতে পদতলে প্রণাম করিতেছে, আবার কখন বা আপনার অঞ্চল দিয়া দেবতার অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছে। হঠাৎ অবলা নীচে গমন করিল। যোগেন্দ্র জাগ্রত হইল। হরিদাসের সহিত যে আলোচনা হইয়াছিল তার বিষে জর্জ্জরিত হইতেছিল। মনে, হৃদয়ে, মস্তিষ্কে সেই গরল সহস্র সর্পদংশনের যাতনায় জ্বলিতেছিল। যোগেন্দ্রর হৃদয়, অবলাকে কখন সতী কখনও অসতী বলিয়া স্থির করিতে করিতে পাগল হইতেছিল। সেই ভীষণ নরকের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রর মস্তিষ্কে বুকে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিল। উঃ গেলুম! গেলুম! বলিয়া চীৎকার করিয়া যোগেন্দ্র মুর্চ্ছিত হইল। অবলা দ্রুত ছাদে আসিয়া দেখিল, স্বামী মুর্চ্ছিত। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগেন্দ্র চাহিল। দেখিল অবলা। মস্তিষ্কে, বুকে আবার যাতনা জ্বলিল। যোগেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে "মাগো" বলিয়া আবার চীৎকার করিয়া মুর্চ্ছিত হইল।

অবলা দ্রুত বেগে গিয়া রাম দাদাকে ডাকিল। রাম আসিয়া দেখিল যোগেন্দ্র মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে। রামকে দেখিয়া বলিল তোমার ভগিনীকে আমার নিকট হইতে যাইতে বল, ওর সেবা সুশ্রূষা আর ভাল লাগেনা।

অবলা শুনিবা মাত্র নিম্নে গেল—আজ অবলার যথার্থ নরক যন্ত্রণা।

রাম শুনিয়া হতবুদ্ধি হইল—ভাবিতেছে হতভাগিনীর অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ।

রাম স্তম্ভিতভাবে জিজ্ঞাসিল, "কি হ'য়েছে বলুন দেখি!

যো। হবে আর কি! আগুণ উত্তাপ হারায়েছে, জ্যোৎস্না কাল হ'য়েছে—কাল হ'তে সূর্য্য হ'তে আঁধার বেরুবে!—বলিতে বলিতে যোগেন্দ্রের দুচক্ষু লাল হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতি ছিন্ন প্রায় হইতেছে।

রামচন্দ্র আধোবদনে থাকিয়া ভাবিতে লাগিল "এযে সব পাগলের প্রলাপ শুনছি—ভীষণ ঝটিকার শব্দ শুনছি। ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "যোগেন্দ্র বাবু! কথার অর্থ বুঝিলামনা—ভাল করিয়া বলুন। যোগেন্দ্র প্রাণের যাতনায় জ্বলিতে জ্বলিতে বলিল "প্রাণ আমার কেমন ক'রছে! বোধ হ'চ্ছে আমি পাগল হ'ব—হব কি! বোধ হয় হ'য়েছি। উঃ গেলুম গেলুম" বলিয়া যোগেন্দ্র আবার মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছা ভাঙিলে যোগেন্দ্র নিম্নে গেল। সেই দিন হইতে অবলার ঘর পরিত্যাগ করিল। যোগেন্দ্র আর একটা ঘরে খিল দিয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিল। অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে কত ডাকিল—

অনুরোধ করিল, মিনতি করিল, মাথা খুঁড়িল—পায়ে গড়া গড়ি দিল কিন্তু স্বামীর হৃদয় ক্রমে কঠিনতর হইল। যোগেন্দ্র পদাঘাতে অবলাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। অবলা সেই ঘরের এক পাশে বসিয়া কাঁদিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল।

সমস্ত রাত্রি যোগেন্দ্র ঘুমায় নাই। সন্দেহ সর্প নিদ্রাকে দংশন করিয়া মরিয়াছে।

পর দিন প্রাতে যোগেন্দ্র উঠিয়া পাগলের মত বাহিরে গেল। পায়ে জুতা নাই, হাতে ছড়ি নাই, গায়ে জামা নাই। প্রান্তরে ভ্রমন করিতে যাইল। অন্যদিন ভ্রমণ করিতে করিতে কত আনন্দ সম্ভোগ করিত। আজ যেন সব বিষ, যেন সব কি, যেন সব ঐ সন্দেহ। যে দিকে চায় সে দিক্‌টা ঐ সন্দেহ তুলিয়া দেয়; ফুলে ফলে চারি দিকে ঐ সন্দেহ যেন লুকাইয়া রহিয়াছে।

মনে ক্রমাগতই সন্দেহ। সে আর যায় না, দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। যোগেন্দ্র অবলার ঘরে শয়ন করে না; আর অবলার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। যোগেন্দ্র ক্রমে প্রকৃত উন্মাদ হইয়া উঠিল।

যোগেন্দ্র উপরের একটী ঘরে দিনরাত্রি শুইয়া শুইয়া কি ভাবে। যোগেন্দ্র ভাবে আর কাঁদে—কাঁদে আর হাসে—হাসে আর বকে—বকে আর করতালি দেয়। যোগেন্দ্রের সে দেহের আর শ্রী ছাঁদ নাই। যোগেন্দ্র দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ হইতেছে।

অবলার প্রাণে আর প্রাণ নাই। অবলাও আর খায়না ঘুমায় না। সমস্তদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সময় পাত করে। স্বামীর দুর্দ্দশায় অবলার শরীর এরূপ জীর্ণ যে, অবলাকে আর চেনা কঠিন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে, যোগেন্দ্র আপনার ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "পাপিষ্ঠাকে খুন ক'রবো, খুন ক'রবো" বলিয়াই হোহো হোহো করিয়া হাসিয়া পট্ পট্ করিয়া হাততালি দিল। অন্যান্য দিন ঘরের দ্বার বন্ধ থাকিত, সুতরাং হতভাগিনী অবলা চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিত না। আজ ঘরের দ্বার খোলা। অবলা এই সুযোগে কাঁদিতে কাঁদিতে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর কাছে গিয়া উপস্থিত। স্বামী অবলাকে দেখিয়াই কাঁদিল।

অবলা কাঁদিতে কাঁদিতে হাত ধরিয়া বলিল, 'জীবন আমার! কেন? কেন তুমি অত কাঁদ? আমায় সব খুলে বলনা'।

যোগেন্দ্র চক্ষু আরক্ত করিয়া অবলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল।

অবলা পাগলিনীর মত বলিল 'নাথ! আমার জীবন! তোমার চক্ষু অমন কেন? আমার যে ভয় ক'রছে'। বলিয়াই হতভাগিনী স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিতা হইল। যোগেন্দ্র অবলার পৃষ্ঠে এক প্রবল বেগে পদাঘাত করিয়া বলিল :—

"তুইই আমার পীড়ার কারণ, তুইই আমার পীড়ার কারণ। তুই না ম'লে আমার ব্যারাম ভাল হবে না।"।

হতভাগিনী তখন স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল, প্রাণনাথ! আমি এখনি মরিতে প্রস্তুত—এজন্য আর ভাবনা কি নাথ! আমি তো তোমারি। সে যে অনেক দিন হ'চ্ছে'।

অবলার কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রর প্রাণটা কেমন বিগলিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিল। অবলা তখন স্বামীকে আপনার কাছে বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি আর অমন ক'রনা। কেন? কি তোমার হয় আমায় বল। আমি ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করাই"।

বলিয়াই অবলা স্বামীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর মুখ চুম্বন করিল।

যোগেন্দ্র আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইল। মাথায় আবার যন্ত্রণা বোধ হইল—বুক কিসে ভাঙ্গিতে লাগিল। "গেলাম গেলাম, মাথা গেল, বুক গেল" বলিয়া চীৎকার করিল।

অবলার প্রাণের ভিতরটা কেমন করিতেছে। হতভাগিনী স্বামীর মুখের দিকে আবার সাশ্রুনয়নে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসিল 'কি হ'লে তুমি আমার ভাল হবে, আমায় বল না।'

যোগেন্দ্র উঠিয়া তরবার বাহির করিয়া অবলার গলার কাছে আনিল।

অবলার তাহাতে ভয় নাই। অবলা বলিল 'আমি ম'লে যদি তোমার ব্যারাম ভাল হয় তো আমায় এখনি কাট। তার জন্য তুমি ভেবনা—আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার হাতে ম'র্‌বো'।

যোগেন্দ্র হঠাৎ তরবার হস্তে আপনার শয্যার উঠিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, 'তোর চরিত্রে সন্দেহ হ'য়েছে, সন্দেহ হ'য়েছে, ওরে ওরে সাপ। ওরে সন্দেহ! ওরে সাপ! তুই এই বার আয়

—ওরে পিশাচী তোকে আমি কেটে ফেল্‌বো। উঃ গেলুম গেলুম—বুক গেল।

যোগেন্দ্র ক্রোধে উন্মত্ত হইল। অবলা ঐ কথা শুনিতে শুনিতে বজ্রাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। যোগেন্দ্র তরবার হস্তে আসিয়া অবলার বুকে বসিল। অবলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। দেখিল বক্ষে তরবার হস্তে স্বামী, আপনার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া অবলা অশ্রুপূর্ণনয়নে গদগদস্বরে বলিল, 'নাথ! আজ আমার বড় সুখের দিন যে তোমার হস্তে মরিব! যমের হাতে প্রাণ না যাইয়া যদি তোমার হাতে প্রাণ যায় তো ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? নাথ! আমার এ অন্তিমকালে আশীর্ব্বাদ কর'।

যোগেন্দ্র তরবার উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, 'কি আশীর্ব্বাদ চাও, এই তরবারে তোমার আশীর্ব্বাদ হবে, পিশাচী রাক্ষসী।—আশীর্ব্বাদ—র'স পাপিষ্ঠা র'স্‌। এখন ঈশ্বরের নাম কর'।

অবলার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার ঈশ্বর এই যে তুমি আমার বুকে'। বলিবামাত্র অবলার গাম্ভীর্য্য বাড়িল, ভক্তি উথলিয়া উঠিল। ভগবান! আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরজন্মে তুমিই আমার পতি হও'।

যোগেন্দ্র হঠাৎ তরবার ছুড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। অবলা! অবলা! প্রাণ যায়! ওরে অবলা! তোর বুকে একবার শোব, বলিতে বলিতে অবলার বুকে মাথা রাখিয়া যোগেন্দ্র প্রবলবেগে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। অবলা স্বামীকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বলিল, 'নাথ কেন তুমি অমন হ'লে—আমি যে তোমার অবলা—ও সন্দেহ তুমি ক'রনা। ও কথা মনে

এননা। ওঠ! রামদাদা বৈদ্যের ব্যবস্থা ক'রেছেন। বৈদ্য আসুক—চিকিৎসা ক'রে তোমায় আরাম করুগ। নাথ! নাথ!' অবলা আর কথা কহিতে পারে না;—অবলার অস্তিত্ব যেন জড়ীভূত হইয়া আসিল।

যোগেন্দ্র কিছু কথা কহিল না, চুপ করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সে ঘর পরিত্যাগ করিয়া অবলার ঘরে প্রবেশ করিল। অবলার বিছানায় বসিয়া বকিতেছে:—

দূর হ দূর হ, সন্দেহ তুই দূর হ। অবলা যে সতী, অবলা যে সাবিত্রী। হিঃ হিঃ হিঃ। বেরোও শালা বেরোও। ওগো বাবা গো! গেলুম গেলুম। বুক গেল, মাথা গেল, অবলা মো'ল! অবলা মো'ল। উঃ উঃ বাবা! উঃ উঃ!

অবলা ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে স্বামীকে আপনার আলিঙ্গনে বাঁধিল। বাঁধিয়া বলিল, "সন্দেহ গিয়াছে, আর নাই; তুমি আমার বুকে শুয়ে থাক; কিসের সন্দেহ? সন্দেহ আমি দূর ক'রে দেব। কেন? অত কাঁদ কেন? আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। প্রাণ যে যায়! স্থির হও, প্রাণ আমার একটু স্থির হও"।

যোগেন্দ্র বলিল, "না—না—সন্দেহকে কাটি, সন্দেহকে কাটি" বলিয়াই অবলার বাক্সে তরবারের আঘাত করিল। পদাঘাতে অবলার ঘরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিল। পরিশেষে অবলার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বলিল, "আমি তোকে যমের বাটী পাঠাব। তুই নিজের গলায় নিজে তরবার মার। আমি তোকে মেরে পাপের দায়ী হব না। সন্দেহ ব্যাটা তোর ভিতরে তোকে কাট্‌লেই সে কাটা প'ড়বে। ওরে বাবা! গেলুম গেলুম!

অবলার হৃদয়ে কিসের উচ্ছ্বাস উঠিল। স্বামীর নিকট আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হইল। অবলা আর স্বামীর কষ্ট দেখিতে পারে না! অবলা প্রফুল্লমুখে প্রফুল্ল ভাষায় একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'নাথ! তুমি চৌকীর উপর উপবেশন কর, আমি স্নান করিয়া জবা ফুল আনিয়া একবার মনের সাধ মিটাইয়া তোমার পূজা করি'। পূজা ক'রে আমাকে তোমার নিকট বলিদান দিব।

বলিতে বলিতে অবলা উন্মাদিনীর মত হাসিল। চারিদিকে যেন স্বর্গের বাজনা বাজিতেছে। প্রেমোচ্ছ্বাস যেন অবলাকে ইহ-লোক হইতে পরলোকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত।

অবলা বলিল, প্রাণনাথ! আমার জীবনের দেবতা! তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি স্নান করিয়া জবাফুল তুলিয়া আনি। আজ আমার শুভ দিন। এই দিনে একবার জনমের মত তোমার চরণ পূজা করি। তার পর তোমার নিকটে আমার জীবনকে সার্থক করি।

যোগেন্দ্র চৌকীর উপর বসিল। অবলা হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে স্নান করিতে গেল। অবলা হাসিতে হাসিতে কাঁদে কেন? না—মরিলে যদি স্বামীর পীড়া আরাম না হয়; স্বামীর আর কেহ নাই; অবলা মরিলে কে যত্ন করিবে?

অবলা স্নান করিল—ফুল তুলিল—চন্দন ঘসিল। সমু-দায়ের আয়োজন করিয়া লাল পেড়ে শাটী পরিল, মাথায় দীর্ঘ সিন্দুরের ফোঁটা দিল। ধূপ ধূনা জ্বালিল।

স্বামীর হয় তো কষ্ট হইতেছে এই ভাবিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিল।

অবলার সম্মুখে অবলার দেবতা। সেই দেবতার নিকা সতী আপনাকে বলি দিবার জন্য দেবতার পূজায় বসিল যোগেন্দ্র একদৃষ্টে অবলার সমুদয় ব্যাপার দেখিতেছে যোগেন্দ্র স্থির—যেন মহাদেব যোগে মগ্ন।

অবলা আনন্দে উন্মাদিনী—ভক্তিভরে অবনত হইয়া পুষ্প চন্দন দ্বারা স্বামীর পদ পূজা করিল। ইচ্ছা, অনন্তকাল এইরূপে পূজাকরে—ইচ্ছা, সহস্রবার স্বামীর সম্মুখে অপনার মস্তককাটে পা পূজা করিয়া স্বামীর পদধূলী লইয়া মাথার সিঁদুরে রাখিল। পাদুটীকে একবার আপনার মস্তকে রাখিয়া ভক্তিভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। অবশেষে পদতলে প্রণাম করিয়া অবলা ঊর্দ্ধ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামীর মুখ বিষন্ন দেখিয়া অবলা দুঃখে জর্জ্জরিতা হইল। কি আর করিবে আর যে কোন উপায় নাই। অবলার হৃদয়ে সমুদয় সুখে এই দুঃখ রহিল যে, স্বামীকে আনন্দময় দেখিয়া—নির্ব্বাধি দেখিয়া মরিতে পারিল না। অবলা ভাবিতেছে, যদি আমি মরিতে মরিতে স্বামীর পীড়া আরোগ্য হয়, আহা! তা কি হবে! অবলা অশ্রুপূর্ণনয়নে গম্ভীরভাবে করযোড়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামী সে ভাব দেখিয়া একটু কাঁদিল। অবলার মুখের দিকে আর চাহিল না। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিল।

অবলা ভক্তি প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে বলিল, "প্রাণনাথ! ভগবান! এ সময়ে একবার আমার দিকে চাও, নহিলে যে আমার মরিবার সুখ বাড়িবে না। একবার আমার দিকে চাও—আমি পাপিয়সী, ভাল করিয়া তোমার

সার্থক হইয়াছে। সরলা স্বামীন্বেষণ করিতে গিয়া, আপনার ধর্ম্ম ধন রক্ষা করিবার জন্য রূপ অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে। তাহা যখনি পড়িছি তখনি স্বর্গের দেবী ভাবিয়া প্রণাম করিয়াছি। আর কাহা? কুচক্রী লোকে মিথ্যা অপরাধে স্বামীকে নানা বিপদে ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে আর কামিনী তেজস্বিনী বাক্যে স্বামীর হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতেছেন।" (সঞ্জীবনী)

"আরো অনেক প্রশংসা আছে বাহুল্যভয়ে দিলাম না।

অবলাবালা—১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

১৮৮৭ সালের গবর্ণমেন্ট রিপোর্ট "অবলা বালা" সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রশংসিত হইয়াছে :—

...est of these is "Abala-bala" by
...Mitra. The characters in
...n and
...pathy
...ent)

স্বামী
থাকিবে
কু বাবি
স কঠোর
দুঃখে
ফাটিয়

...স্বরূপ সম্বন্ধে। ২
...ার দ্বিগুণ বাড়িয়াছে

সহম

ধর্ম্মোপন্য ১৲

(এই পুস্তক সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের প্রশংসা)

Sahamaran—By Bab ya Charan Mitra, is a work of a very differ nature. In this the young author attempts give the picture of a woman absorbed it the ntemplation of the Deity. The meseries of world, the neglect of the husband the threats f the seducer, the allurements of the wicked n, are of no moment to her. She knows only beings, her father whom She is bound to te and her Kali whose presence She always feels out her. Some of the scenes are very powerfully scribed. The scene in which Anupama who c e to seduce her felt an immense gulf that s rates him from her and was persuaded to exp e his sins by severe penances, exerts a powerf and ennobling influence upon the mind.

(India governme --Home department.)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I have read your Sahamaran, with the deepest feeling and intense attentio and I am glad to find that my prediction when I r d the Abalabala by an unkhown writer, some ears back, has been so literally fulfilled.

You have no veloped into a fullfl and powerful nov capable of stirring fully the tenderest, sweetest, and the n chord of a Bengali art, with a full conce of the dignity of noble art of represe human feelings in us. Your Kadambini giant figure; all-powl in doing good. S the embodiment o ve, but love in a purersense than tha which the word is use the ordinary rnu novelists. You hav true key of vivifyin nd ennobling the B mind revealed to yo Go on steadily with mission ; success is e to attend your effort

উপন্যাস মালা—॥০

"গ্রন্থকার যিনিই হউন্‌নি একজন কৃতী লেখক। সরল সুমধুর বাঙ্গালায় কটী মনোহর গল্প সাজান হই পাঠ করিয়া আনন্দিত হইম" (নব্যভারত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস —১ টাকা

এক বৎসরে এক সহস্র পুস্তক ফুরাইল। দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তক চারিগুণ বড় হইবে বিশেষ যত্ন পরিশ্রমের সহিত হইতেছে।